অপরূপা

দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—সাড়ে পাঁচ টাকা-

প্রচ্ছদপট :—

অঙ্কন—অজিত গুপ্ত

মুদ্রণ—স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোং

আশ্বিন ১৩৩৪

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৩৭।বি, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীপ্রদোষকুমার পাল কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

স্বর্গত সুরেশচন্দ্র শর্মাচার্য

ও

স্বর্গত উমেশচন্দ্র শর্মাচার্য-এর

পুণ্যস্মৃতির স্মরণে

এই লেখকের

ভৃগুজাতক

ছক ও ছবি

জ্যোতিষীর ডায়েরী

কৈশোর!—পদ্মদিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে মণীশ। কেমন এক অনুভূতিতে ভরে ওঠে মন। গান গেয়ে যায় কিশোর-বৈরাগী। বিচিত্র সুরের ঢেউ খেলে যায় আকাশে-বাতাসে। একতারার সুরলহরী যেন হৃদয়তন্ত্রীকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। পুলকে নেচে ওঠে তার হৃদয়-তন্ত্রী। হৃদয়ের মাঝে লুক্কায়িত রয়েছে মধুক্ষরা এক মনোবীণা; এতদিন তার সন্ধান পায় নি মণীশ। আজ তার হৃদয়ের মধুক্ষরা শূন্য কোষগুলি যেন ভরে উঠেছে। বসন্তের হাওয়া,—রূপ পালটাচ্ছে পৃথিবী। বন-উপবনে রূপ-পালটানোর মহোৎসব লেগে গেছে। ফুটে ওঠে ফুল —তার কোষে কোষে মধু। বৈরাগীর একতারায় ঝংকৃত হয়ে ওঠে—

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ পথ হেরইতে মনসিজ গেল।
প্রকট হাস অব গোপত ভেল॥

কি সুন্দর গান! গানের সবটুকু বোঝে না মণীশ; তবুও মনে হয়, তারই কথা যেন বলছে বৈরাগী। কিশোর-বৈরাগীর গানে মণীশের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কি যেন চায় তার মন! আকাশে-বাতাসে কি যেন আবেশ! সবই সুন্দর লাগে তার চোখে। সুনন্দা, সুরুচি, জয়ন্তী ও আরতি,—খেলাঘরের সঙ্গী ছিল যারা, তাদের দিকে চোখ তুলে চাইতেও কেমন সংকোচ বোধ হয়। তারাও যেন কেমন সচকিত হয়ে উঠেছে। তাকেও তারা এড়িয়ে থাকতে চায়। সুরুচি তো আড়-চোখে মাঝে মাঝে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ চোখে চোখ পড়লে রাঙা হয়ে ওঠে তার মুখ। সলাজ হাসি হেসে পালিয়ে যায় সুরুচি। সুনন্দা তো সেদিন হঠাৎ তার হাতটা চেপে ধরলে; তার পর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চলে গেল। চপল হাসি সুনন্দার চোখে। আর মালাকরদের মেয়ে নন্দা। সেও যেন কেমন! গায়ে গা ঠেকাতে চায়। বড় চঞ্চল আর চটুল এই নন্দা। কি বিশ্রী ঠাট্টা করে। লজ্জাশরম নেই মেয়েটার।

হ্যাঁ, সবই পালটে যাচ্ছে। রূপ পালটাচ্ছে পৃথিবী ; রূপ পালটাচ্ছে বন-উপবন। সুনন্দা, সুরুচি, জয়ন্তীদেরও—? সংকোচে পুলকে মণীশ যেন কেমন হয়ে পড়ে। নূতন জগৎ তার সামনে। কিশোর-বৈরাগীর গান ভেসে আসে—

রাধা-মুখ পঙ্কজ হেরইতে আকুল
ভৈ গেল নন্দকিশোর।
নিজকুল-ধরম করম সব বিছুরল
বিছুরল ছান্দন ডোর ॥

ভাল লাগে। সবই তার বড় ভাল লাগে। আকাশে-বাতাসে নূতন আমেজ। বকুলগাছে দুলছে মাধবীলতা। চাঁপাগাছে কোকিল ডাকছে। বিস্ময়-ভরা মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মণীশ। চেয়ে থাকে আরতি, সুনন্দা আর সুরুচির দিকে চপল চরণে চলে যায় সুনন্দা। সুরুচির মুখখানা যেন পদ্মবনে উঁকি-ঝুঁকি মারে। স্বপ্নের আবেশে বিভোর হয়ে আছে মণীশ। পদ্মদিঘির পাড় দিয়ে ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে আসছে নন্দা। কেমন যেন দুষ্টুমিতে ভরা তার চোখ-মুখ। গামছার মত এক ফালি কাপড় তার কোমরে জড়ানো ; তারই আঁচল দিয়ে টেনে টেনে বুকটা ঢাকবার চেষ্টা করছে। এ কি? হঠাৎ ছুটে এসে হুঁচোট খেয়ে যেন তারই গায়ের উপর পড়ে গেল মেয়েটা। তার পর নিজেকে সামলে নিয়ে তার বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতে লাগল,—"লাগল? দাদাভাই! লাগল? আপদ ছাগলগুলোর জালায় আর পারি নে।" তার স্পর্শে চঞ্চল হয়ে ওঠে মণীশ ; কি যেন জাদুকাঠি বুলিয়ে গেল নন্দা। তাকেও ভাল লাগল মণীশের। নন্দা পালিয়ে যাচ্ছে, আর এক-এক বার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে ; মণীশের চোখ দিঘির জলে আর নন্দার দিকে—পদ্মের কুঁড়ি মাথা তুলেছে জলের উপর, আধ-ফোটা পদ্ম একটা হাসি যেন লুকিয়ে রাখতে চায় ; আর ফুটে রয়েছে আর একটা শতদল পদ্ম। ভোমরা গুনগুন্ করে উড়ে বেড়াচ্ছে। ফুলের কোষে কোষে মধু। মধুভরা ফাল্গুনী হাওয়া। মণীশ আনমনা হয়ে পড়ে।

হ্যাঁ, সংসারের কথা ভাবতে শিখেছে মণীশ। পিসীমাই কথাটা বারবার

পাড়েন। পাড়া-প্রতিবেশীর মুখেও এক কথা—সংসারী করে দাও মণীশকে। সত্যই ঘরবাড়ি তার সবই ফাঁকা ঠেকে। বাবা আর মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। তার দু চোখ বেয়ে ধারা নামে। এই তো সেদিন তার পৈতে হয়েছে, গলায় ধবধবে উপবীত ঝুলছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেখে মণীশ, এখনও চুলগুলো তেমন বাড়ে নি। সন্ন্যাসীর বেশে ভিক্ষে নিতে বেরিয়েছিল মণীশ; ভিক্ষে-মা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সুনন্দার মা! তাঁর চোখে ঝরঝর করে জল ঝরছিল; পিসীমা চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন—"বউ তোমার ছেলে যে সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়েছে গো! তাকে আগলাও এসে।" সত্যি সে-ও সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতে পা বাড়ায় নি। পৈতার সময় এটা একটা নিয়ম; ভয় আছে নাকি, এসময় অনেক ছেলে বেরিয়ে পড়ে দণ্ডধারী সন্ন্যাসী হয়ে। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গেলে না কি তাকে ফেরাতে নেই। তাই মায়েদের যত ভয়! সুনন্দার মাকে রাঙাকাকী ডাকে মণীশ। রাঙাকাকী ভিক্ষে দিলেন সন্ন্যাসীর ঝুলিতে। আরও অনেকে কত কি দিল। আড় চোখে তাকিয়ে ছিল মণীশ। দেখতে পেয়েছে—সুনন্দাও কাঁদছে; সুরুচি চোখের জল মুচছে; আর নন্দাও বেজার মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। পাড়ার মেয়েরা গান গাইছে—

বাছা নিমাইরে, যাইও না সন্ন্যাসে—
অভাগী মায়েরে ছাড়ি যাইও না বিদেশে।
ওরে, বারো না বছরের নিমাই, তেরো না পুরিতে
কেশব-ভারতী আসি মন্ত্র দিল কানে।
বাছা, যাইও না সন্ন্যাসে।
সন্ন্যাসী না হইও রে নিমাই
বৈরাগী না হইও।
ঘরে বসে অভাগীরে
মা বলে ডাকিও।
কোথা থাইক্যা আইল রে গুরু
বসতে দিলাম ঠাঁই।

সেই হইতে মোর নিমাইর মুখে
মা-বলা ডাক নাই রে নিমাই
(মা-বলা ডাক নাই)।
(আবার) ঘরে বঁধু বিষ্ণুপ্রিয়া
যেন জলন্ত আগুনি (গো)।
(ও) তার উন্মত্ত যৌবন বাছা
কারে স্ঁপে দেবে (গো)।

ব্রাহ্মণের ছেলে, পূজাপাঠ নিয়ে থাকবে। এ-পাড়া ও-পাড়ায় বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। শিষ্য যজমান তিরিশ-চল্লিশ ঘর, তাই ঢের। অভাব কি তার? মুরুব্বী আছেন কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী, গাঁয়ের জমিদার। পিসীমা বলেন,—এবার বিয়ে দেব আমার জাদুর। এই সুরুচির মত মুখ হবে; না সুরুচির মুখখানাই সব। হাত-পা তেমন সুডৌল নয়। গড়নটা হবে সুনন্দার মত। কিন্তু বাপু, ওদের দু জনেরই কারও গলার তেমন ছিরি নেই। গলাটা আরতির ভাল। তার মত হবে বউয়ের মিষ্টি গলা।

হাঁ, হাঁ—তিলে তিলে তিলোত্তমা হবে বউটি।—গোকুলকাকা হো-হো করে হেসে ওঠেন। হুঁকোটায় জোর জোর দু-তিনটে টান দিয়ে বলে ওঠেন আবার,—বেশ দিদি বেশ! আর বউটি হবে ঠিক ওই নিতাই মালীর মেয়ে নন্দার মত চটপটে। ছাগল তাড়াবে, গোরু দোয়াবে; আর পদ্মদিঘি থেকে কলসী কাঁখে জল নিয়ে আসবে ঘড়া ঘড়া।

পিসীমা বলেন,—ওকি কথা গোকুল! ছিঃ, ছিঃ, বউমা আমার ওই নন্দার মত হতে যাবে কেন? ভদ্রলোকের মেয়ে হবে, বামুন-পণ্ডিতের ঘরের বউ।

গোকুলকাকা বলেন,—আলবৎ হবে দিদি! তোমার ওই সুনন্দা, সুরুচি আর আরতির চটকই আছে। ভদ্দর লোকের মেয়ে! পায়ের উপরে পা তুলে বসে থাকবে; সাজ আর পোশাক নিয়ে থাকবে। সারাদিন আরশিতে মুখ দেখবে। কাজের ঠেলা কে সামলাবে বল?

পিসীমা হেসে জবাব দেন,—নূতন বউ এসেই কি হেঁসেল ঠেলবে ভাই? আমি আছি কি করতে? তার পর নিজের কাজ নিজেই বুঝে নেবে।

গোকুলকাকা হুঁকোয় দম দিয়ে বলেন,—কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে দিদি? যার অদৃষ্টে যা আছে!

বারান্দার একপাশে বসে মণীশ স্কুলের পড়া তৈরি করছিল। সব কথাই তার কানে যায়। রাঙা হয়ে ওঠে তার মুখখানি। সলাজ সংকোচে ভরে ওঠে মন। ছিঃ, পিসীমার যত আজগুবী খেয়াল। এখন কিসের বিয়ে? কাঞ্চনগড়ের স্কুলে ভর্তি হয়েছে মণীশ। এত দিন তো বসেই ছিল কালী পণ্ডিতের স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পাশ করে। গোকুলকাকারই কি যেন খেয়াল হল একদিন, বললেন,—দেখ মণীশ! ইংরিজি না পড়লে কিছুই হবে না। 'নমঃ শিবায়' বলে আর চলবে না বাবা! ইংরিজি জানলে কদর বেড়ে যায়। সেদিন কাঞ্চনগড়ে সাব ডেপুটির বাসায় চণ্ডীপাঠ করলে এম. এ পাশ করা এক পণ্ডিত! কি সুন্দর তাঁর ভঙ্গী, কি সুন্দর তাঁর উচ্চারণ—কান জুড়িয়ে গেল বাবা! এঁরা যখন গাঁয়ে এসে ঢুকছেন তখন পুরুত-বামুনদের ভাত মারবেন; ভেবেচিন্তে কাজ করতে হয়। কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে?

আশ্চর্য মানুষ এই গোকুলকাকা। মুখে তাঁর লেগেই আছে,—কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে। পুরোপুরি বাক্যটা কোনদিন তাঁর মুখ থেকে শোনে নি মণীশ। কখনও বলতেন, কিং কুর্বন্তি বৃহস্পতি? কখনও বা কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে? আবার পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতেন, কে কি করবে রে বাবা? বৃহস্পতিটা আছে কি করতে? মহামুনি পরাশরের বাক্য মিথ্যা হবার নয়। মহামুনি পরাশরের নাম শুনে ভড়কে যেত মণীশ। হাত জোড় করে মহামুনি পরাশরের উদ্দেশে মাঝে মাঝে প্রণাম জানাতেন গোকুলকাকা।

মণীশদের সংসারে কবে এসে জুটেছেন এই গোকুলকাকা, মণীশ তার কিছুই জানে না। মণীশের বাবাকে গোকুলকাকা বড়দা বলে ডাকতেন। নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ; কবিরাজি শিখতে এসেছিলেন তাঁর বাবার কাছে। সেই থেকেই এ সংসারে থেকে গেছেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই তাঁকে দেখে আসছে মণীশ।

ঘোর কালো না হলেও গায়ের রঙটা তাঁর কালো। কপালের ডান দিকটায় মস্ত বড় একটা আঁচিল। গায়ে থাকে একটা ফতুয়া। ফতুয়াটা তাঁর লম্বিত ভুঁড়িটাকে ঢাকতে পারে না। গলায় একটা উড়ুনি; বগলে ছাতা, তার আবার তিন অবস্থা; পেছন দিকে শিকগুলো যেন দাঁত বের করে হাসছে। গোকুলকাকা শুধু মণীশেরই কাকা নন, গাঁয়ের ছেলেবুড়ো সকলেরই তিনি গোকুলকাকা।

এরকম পোশাকেই গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াতেন গোকুলকাকা। গোকুলকাকার ঠাকুর্দা নাকি ছিলেন মস্ত বড় জ্যোতিষী। তাঁকে লোকে ডাকত ত্রিকালঠাকুর। লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনকালের কথা অনর্গল বলে দিতে পারতেন তিনি। কিন্তু হলে কি হয়, চোখের সামনে স্ত্রীপুত্র বউ-বেটা সব মরে গেল ওলাওঠায়, নিজেও মরলেন কাল রোগে। গোকুলকাকা পালিয়ে এলেন বাস্তুভিটা ছেড়ে। মণীশের বাবারই কি সম্পর্কে যেন মাসতুতো ভাই! সকলে বলাবলি করে—ত্রিকালঠাকুরের চাবিকাঠিটা পেয়ে গেছেন গোকুলকাকা। কিন্তু মাথার ঠিক নেই, তা না হলে সবারই ভবিষ্যতের কপাট খুলে দেখাতে পারতেন। তাই তাঁকে সবাই কত সাধাসাধি করে। গোকুলকাকার খাতিরও কম নয়।

বেশ ছিল মণীশ। বাবার কথা সে ভুলে যায় নি। কোন অভাব ছিল না তাদের। বাবা বলতেন—"ছেলেকে ডাক্তারি পড়িয়ে আনব কলকাতা থেকে। কবিরাজী আর চলবে না।" কিন্তু হায়! তাঁর সাধ পূর্ণ হল না। তিন-চার দিন বাবা জ্বরে ভুগলেন। তার পর হঠাৎ কি হয়ে গেল; হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে গোকুলকাকার ডাকে তার ঘুম ভেঙে গেল। মণীশের হাত ধরে টেনে নিয়ে এলেন তার বাবার কাছে; তাঁর বাবা যেন হাঁপাচ্ছেন; তার মাথায় হাত রেখে কি যেন বললেন তাঁর বাবা। আর এক বার যেন গোকুলকাকার দিকে চোখ তুলে চাইলেন। দু চোখ মুছতে মুছতে গোকুলকাকা বললেন—"আমি আছি বড়দা! ভয় নেই। তোমার মণীশকে—", গোকুলকাকার কথা শেষ হতে না হতেই বাবার মাথাটা এক ধারে হেলে পড়ল।

মণীশের মা আর পিসীমা চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। মণীশ বুঝতে পারলে তার বাবা আর নেই। পিসীমাকেও সে ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে; বয়সে

বাবারও বড় পিসীমা। বিধবা হয়ে কোন্ যুগে যে এ সংসারে এসে ঢুকেছিলেন, নিজেই ভুলে গেছেন তিনি। পিসীমাও ভেঙে পড়লেন।

যা হবার সব হয়ে গেল। কিন্তু মণীশের মা হয়ে গেলেন পাগল। নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নেই; কোনদিন বা দুপুর রাত্রে চান করতে বেরিয়ে পড়েন। রাত কিংবা দিন কিছুরই খেয়াল থাকে না তাঁর। পিসীমা আগলে থাকেন মণীশের মাকে। আর গোকুলকাকা সংসার চালিয়ে যান। মণীশ কিছুই বুঝতে পারে না। মায়ের অবস্থা দেখে মাঝে মাঝে অস্বস্তি লাগে তার। মন ভার হয়ে ওঠে। গোকুলকাকা সান্ত্বনা দেন,—কি হবে বাবা ভেবেচিন্তে? কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে? তা না হলে এমন ত্রিকালঠাকুরের নাতি আমি, এখন তিন কাল খেয়ে আমার বড়দার সংসারে বসে ভাত মারছি, ছিঃ ছিঃ!

একঘেয়ে তাদের সংসার। কিছুই ভাল লাগে না মণীশের। পিসীমা যেন তার মনের কথা বোঝেন। তাই তো তার জন্য তাঁর এত চিন্তা। গোকুলকাকা উৎসাহ দেন,—হ্যাঁ মণীশ, মন দিয়ে পড় বাবা! বড়দা বলতেন তোকে ডাক্তার করবেন। তাই হবি তুই, তাই হবি।

মণীশ চুপ করে থাকে। মাঝে মাঝে হেসে হেসে জবাব দেয়, তাই করব গোকুলকাকা! কিন্তু অনেক দিন লাগবে ডাক্তার হতে।

গোকুলকাকা বলেন,—হোক না। তাতে চিন্তা কি মণীশ? পড়াব, আমি তোকে পড়াব; জানিস তো পরাশর বলেছেন—কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে যস্য কেন্দ্রী বৃহস্পতি। তোর কোষ্ঠীতে বৃহস্পতি কেন্দ্রী বাবা! কেউ ঠেকাতে পারবে না। ওই পাজী প্রসন্ন তর্করত্নটাকে তখন বেশ একহাত দেখিয়ে দেব।

প্রসন্ন তর্করত্নের নাম করায় মণীশ হেসে উঠল। গোকুলকাকা বললেন,—তুই হাসছিস মণীশ! ওই বুড়োটাই যত নষ্টের গোড়া। কৃষ্ণপ্রসাদবাবুকে বলে-কয়ে তোদের ভোগোত্তর জমিটা মেরে নিলে। শাস্ত্রে বলে—জ্ঞাতি শত্রুর বড় শত্রুর! কবরেজ মরেছে তো কি হয়েছে? জমিটা তো তাঁর সঙ্গে নিয়ে যায় নি?

বলতে পার,—হ্যাঁ, এখন কেউ যখন বিনি পয়সায় ওষুধপত্তর যোগায় না, বংশে যখন কেউ কবরেজ হল না; তখন জমিটাই আর রাখব কেন? ঠিক কথা,—কিন্তু তাঁর ছেলে রয়েছে। অনাথ ছেলে, বাপমা-মরা ছেলে, খাবে কি বাছা? কি করে সে মানুষ হবে? ছিঃ! ছিঃ! লজ্জাও করে না কথা বলতে। ভাখ মণীশ! কবরেজির নিকুচি করেছি, আমি তোকে ডাক্তার বানিয়ে আনব বাবা! ওই প্রসন্ন তর্করত্নের ভুঁড়িটায় তোকে অস্তর চালাতে হবে।

হাঃ—হাঃ—করে হেসে ওঠেন গোকুলকাকা। মণীশ জানে, প্রসন্ন তর্করত্ন জমিদারকে পরামর্শ দিয়ে তাদের পাঁচ বিঘে জমি ছাড়িয়ে নিয়েছেন। তার জন্য দুঃখ কি? বাবা কবিরাজি করতেন, তার জন্যই জমি দিয়েছিলেন কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরীর বাবা কালীপ্রসাদ চৌধুরী। এখন ছাড়িয়ে নিয়েছেন, তাদের তো কোন দোষ দেখে না মণীশ। আর তর্করত্ন জেঠা—তিনি চিরকালটাই এরকম। কেমন যেন খুঁতখুঁতে স্বভাবের; হাড়কিপ্পন লোক। জমিদারের গুরু না হলেও গুরুবংশ। মণীশের বাবা ছিলেন এ তল্লাটের একমাত্র কবিরাজ। কত লোকে কত জিনিসপত্র—তরি-তরকারী, মাছ, মাংস, দুধ, মিষ্টি দিয়ে যেত কবরেজ-বাড়িতে। অঢেল জিনিস—কিন্তু খাবার লোক ছিল না। বিলিয়ে দিতেন মণীশের বাবা আর পিসীমা। মণীশ শুনেছে, দেখেছেও—তর্করত্নের বাড়িতেই যেত বেশির ভাগ। দু বেলা খোঁজ-খবর নিতেন তর্করত্ন। আর এখন? হ্যাঁ, মণীশের বাবা মারা যাবার পরের দিন এসেছিলেন, দু-এক বার উড়ুনির আঁচলে চোখও মুছেছিলেন, আর বলেছিলেন—"সে তো গেছে। ছেলেটা বেঁচেবর্তে থাকলেই হল। সবই নারায়ণের ইচ্ছা!" তার পরে আর উঁকিও মারেন নি তর্করত্ন। অবশ্য শ্রাদ্ধের দিন এসেছিলেন,—জমিদারের চাকর শিবু আর রতন মাথায় করে দানসামগ্রী পৌঁছে দিয়েছিল তাঁর বাড়িতে। জ্ঞাতি নয় তর্করত্ন; গ্রামসম্পর্কে জেঠামশাই বলেই ডাকে মণীশ।

মণীশের মনে হয়, তর্করত্ন সুখী নন। একটিমাত্র মেয়ে সন্ধ্যা, বিয়ে দিয়েছিলেন ছোট বেলায়, সেই মেয়ে বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে। তার উপর তর্করত্নের গৃহিণী জয়কালী দেবী যেন সব সময়ই খড়্গহস্ত হয়ে আছেন।

কেউ ভেড়ে না তর্করত্নের আনাচে-কানাচে। সতর্ক প্রহরা, সতর্ক চোখ জয়কালীর।

কিন্তু আশ্চর্য! যেদিন মণীশের মা মারা গেলেন, ছুটে এসেছিলেন জয়কালী। মণীশকে নিজের বুকে জাপটে ধরে প্রবোধ দিয়েছিলেন। তাঁর চোখের জলে মণীশেরও গা ভেসে গিয়েছিল। সেদিন থেকে মণীশকে কি চোখে দেখেছিলেন তিনি, তা কেউ বলতে পারে না। সন্ধ্যাও আসত মায়ের সঙ্গে। বয়সে সন্ধ্যা মণীশের চেয়ে দু-তিন বছরের বড়ই হবে। দুধে আলতায় মেশানো গায়ের রঙ। সবাই বলত ডানাকাটা পরী। মণীশ ডাকত—সন্ধ্যাদি। জয়কালী বলতেন,—"ওকে তোর নিজের মায়ের পেটের বোনই মনে করিস মণীশ।" চোখের জল মুছতেন জয়কালী। হয়ত সন্ধ্যার ব্যর্থ জীবনের ভবিষ্যৎ ভেবে। মণীশও ভাবত কত কথা! সন্ধ্যাদি কি এমন করেই জীবন কাটাবে? না, না, তা হতে পারে না। কত কাজ রয়েছে, কত কি করতে পারে সন্ধ্যাদি। কাঞ্চনগড়ে দেখে এসেছে সে মেয়েদের স্কুল; আর মেয়ে টীচার। শুনেছে—মেয়েরাও বড় বড় চাকুরি করে। বড় বড় কাজ করে মেয়েরা! এদেশেরই মেয়ে তারা; তারাও বাঙালী।

উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে মণীশের মন। আবার তাদের গ্রামের কথা, তাদের সমাজের কথা আর প্রসন্ন তর্করত্নের কথা ভেবে আঁতকে ওঠে। ভয়ে সংকুচিত হয়ে যায় মণীশ। সর্বনাশ! তা হলে কি রক্ষা থাকবে? তবু সন্ধ্যাদির জন্য ভাবে মণীশ।

সন্ধ্যা আসে। মাঝে মাঝে কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়; সন্ধ্যাদিকে কবিতা শোনাতে মণীশের খুব ভাল লাগে। কাঞ্চনগড়ে নূতন আলোর সন্ধান পেয়েছে সে। কনকবাবু কি সুন্দর পড়ান। কালীপণ্ডিতের পাঠশালা আর কাঞ্চনগড়ের ইংরেজী স্কুল, আকাশ-পাতাল তফাৎ। নূতন গ্রাজুয়েট কনকবাবু। উচ্ছ্বাস আর আবেগে ভরা তাঁর দেহমন। ছেলেদের মধ্যে তিনি যেন নূতন চেতনা সঞ্চার করে দিয়েছেন; ইংরেজী পড়াতে পড়াতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন। মণীশের কানে এখনও ঝংকার দেয়।

কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে চারিদিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর,
"ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্;
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি
এসেছে রবির কর ॥

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। মণীশের স্বপ্ন যেন ভেঙ্গে যায়। তার জানা ও দেখা সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে যেন মন উড়ে যায়। কনকবাবু বলতেন নিজেকে বুঝতে চেষ্টা কর তোমরা। তোমাদের মধ্যে অসীম শক্তি রয়েছে; দেহের মধ্যে খাঁচার পাখি হয়ে বসে থেকো না; এই তো সময় কারাগার ভেঙে বের হতে হবে। সমাজের কারাগার, ঘরবাড়ির কারাগার, স্বজনের মোহ—তাও কারাগার। বেড়াজালে বদ্ধ হয়ে রয়েছে মানুষ; ধর্ম্ম, সংস্কার, বাছবিচার সবই বেড়াজাল। সব চুরমার করে বেরিয়ে এসে শুধু ভালবাসা, শুধু প্রাণ বিলিয়ে দেওয়া—মানুষকে, জগৎকে ভালবাসা। মানুষের উন্নতির জন্য, জগতের উন্নতির জন্য ঘরছাড়া লক্ষীছাড়া হয়ে বেরিয়ে আসতে হবে। এরই নাম শিক্ষা, এরই নাম দীক্ষা। মানুষকে মানুষ বেড়াজালে বেঁধে রেখেছে। সেই বেড়াজাল যারা সৃষ্টি করেছে তারাও তার মধ্যে আঁকুপাঁকু করছে। আহার, নিদ্রা আর ভোগ। এই তিনটিই সর্বস্ব নয়। জগৎটাকে চেন, দেখতে শেখ। আকাশে উড়ে যাও, সমুদ্রে ঝাঁপ দাও, হিমালয়ের উঁচু চূড়ায় কি আছে দেখে এস। পৃথিবীর কোথায় কি লুকিয়ে রয়েছে, তা বের করে আন। এই তো সাধনা, এই তো বিজ্ঞান, দেখতে পাচ্ছ না বিলাতের লোকেরা কি করছে? দেশদেশান্তরে গুহাগহ্বরে উত্তরমেরু দক্ষিণমেরুতে অভিযান চালাচ্ছে; কার জন্যে?—মানুষের জন্যে। জগতের গুহাগহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছিল মানুষ, আলোর সন্ধানে ছুটে চলেছে, তার বিশ্রাম নেই, ক্লান্তি নেই।

সন্ধ্যা অবাক হয়ে শোনে মণীশের আবৃত্তি। মণীশের ইচ্ছে হয়, কনকবাবুর

মত বক্তৃতা করে বোঝায় সন্ধ্যাকে; কিন্তু পারে না। মণীশ বলে,—বুঝলে সন্ধ্যাদি; এই তুমি আমি সবই বন্ধ আছি কারাগারে; নিজের ইচ্ছামত তুমি সব করতে পারছ কি? তুমিও পারছ না, আমিও না। কত বাধা, পায়ে পায়ে বাধা; কি করবে তুমি?

সন্ধ্যার ভাল লাগে মণীশের কথা। অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকে সন্ধ্যা; কি যেন ভাবে! মণীশের অত খেয়াল থাকে না। সন্ধ্যা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে; হঠাৎ দুজনে চোখোচোখি হলেই সন্ধ্যা যেন কেমন লজ্জা পায়। সন্ধ্যা দেখে, মণীশ কেমন বড় হয়ে উঠেছে; কেমন একটা শ্রী ফুটে উঠছে তার চোখে-মুখে। একটা শ্যামল রেখার আভাস পড়েছে গালে; চিবুকের নীচে দু-এক গাছি দাড়িও যেন আগাছার মত উঁকি-ঝুঁকি মারছে। সন্ধ্যা ভাবে—কিই বা ওর বয়স!

মণীশ বলে,—কি ভাবছ সন্ধ্যাদি!

সন্ধ্যা বলে,—না ভাই! কিছুই ভাবছি নে। আচ্ছা, তুই আমায় লেখাপড়া শেখাতে পারিস? সেই তো বর্ণপরিচয় কবে কোন্‌দিন শেষ করেছিলাম। এখন কি আর কিছু হবে?

উৎসাহিত হয়ে মণীশ বলে,—কেন হবে না সন্ধ্যাদি! নিশ্চয় হবে। তোমাকে আমি সব শিখিয়ে দেব। জানলে সন্ধ্যাদি! লেখাপড়া শিখলে, আর তোমাকে অমন মনমরা হয়ে থাকতে হবে না। কত বই পড়বে; বইয়ের রাজ্যে বইয়ের মধ্যে কত মজার ব্যাপার আছে। সঙ্গীসাথী নাই বা রইল, বইয়ের মধ্যে মনের সঙ্গী তোমার খুঁজে পাবে। কত জানবার কথা আছে সন্ধ্যাদি! সবই জানতে পারবে। খাঁচা ভেঙে মনের পাখি উড়ে যাবে আকাশে।

সন্ধ্যা হেসে জবাব দেয়,—তুই বড় বাজে বকিস মণীশ! খাঁচা ভেঙে উড়বে কি রে?

মণীশ বলে,—এখন বুঝবে না সন্ধ্যাদি! বই পড়লে বুঝতে পারবে। মানুষের মন কি বেঁধে রাখা যায়? মন উড়ে বেড়ায়; দেশ-দেশান্তরে তার গতি। অজানা লোকের বার্তা আনে মন; আকাশের মুক্ত বিহঙ্গের সঙ্গে ডানা মেলে চন্দ্রলোকের দিকে সে উড়ে যায়!

মণীশ কনকবাবুর কথারই পুনরাবৃত্তি করে। সন্ধ্যা হি-হি করে হেসে ওঠে। সন্ধ্যার হাসি দেখে মণীশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সে বলে, তুমি তো হাসবে সন্ধ্যাদি! বয়স হলেই মানুষ বড় হয় না। বড় হয় জ্ঞানে। এই তো আমাদের কালী-পণ্ডিত! কি শিখিয়েছেন? শুধু শুভঙ্করী, আর যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ। সাহিত্য বলতে অজ্ঞান তিনি। কিন্তু সাহিত্যের কি জানেন তিনি? শুধু বানান, শ্রুতলিপি আর ব্যাকরণ—বোঝান দেখি রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা?

সন্ধ্যা বলে, বেশ, বেশ! কবিতা বুঝে আমার কি দরকার? সময় কাটে না তাই কিছু লেখাপড়া শিখব ভাই! পারবি আমাকে শেখাতে?

মণীশ হেসে উত্তর দেয়,—সে কি সন্ধ্যাদি! এ তো খুব সোজা। তুমি তো কিছু কিছু পড়তে শিখেছ। ভাল ভাল বই তোমায় পড়তে দেব। কোন কষ্ট হবে না।

সন্ধ্যা বলে,—সব কথার মানে তো আমি বুঝতে পারব না ভাই?

মণীশ বলে,—কিছুই আটকাবে না। আমিই তোমায় বলে দেব। কত সোজা বই রয়েছে সন্ধ্যাদি। সব কথাই বুঝতে পারবে।

সন্ধ্যা আর মণীশের এই করেই সন্ধ্যাটা কাটে। রবিবার কিংবা ছুটির দিনে দুপুর বেলাও সন্ধ্যা আসে। মাঝে মাঝে জয়কালী দেবীও হানা দেন। মণীশের আবৃত্তি শুনে তিনি হেসে গড়াগড়ি যান। মণীশের পিসীমাকে বলেন, বড়দি, তোমার মণীশের গলাটা ভাল! ঠিক যেন থিয়েটারের পার্ট করে।

সন্ধ্যা পড়াশোনা করে বটে, কিন্তু প্রায়ই আনমনা হয়ে পড়ে। মণীশ তা লক্ষ্য করে। কখনও কখনও বলে ওঠে—না, সন্ধ্যাদি! তোমার দ্বারা কিচ্ছুই হবে না। তুমি বরং ওপাড়ার রাসু বামনীর কাছে ধামাল গান শেখো গে; বাব্বা! হেসে মরে যাই, ধিন্ ধিন্ করে পা ফেলে কি যে নাচে! আজকালকার যুগে এসব অচল! তার পর সুর করে গায়—

রাই নাচে রে কদমতলায় নাগর কানাই।
জল আনিতে চল্ গো তোরা জল আনিতে যাই।
শ্যামের বিচ্ছেদে ঘোর আগুনে পুড়ে হিয়া,
কি হইবে ওগো ললিতা জল আনিতে গিয়া॥

—ছিঃ, ছিঃ! এসব আবার গান? বুঝলে সন্ধ্যাদি! এসব অসভ্যতা, এসব আদিম কালের বর্বরতা, এসব ছাড়তে হবে। সভ্য-ভব্য হতে হবে। জান সন্ধ্যাদি! কনকবাবু বললেন,—আমাদের দেশ দু শ বছর পিছিয়ে আছে। একেবারে গ্রাম্য,—একেবারে বন্য।

সন্ধ্যা মণীশের কথা শুনে হাসে; কিন্তু সে হাসিতে যেন নৈরাশ্যই দেখতে পায় মণীশ। সেদিন হঠাৎ সন্ধ্যা বলে ওঠে,—তুই কেমন ঢ্যাঙ্গা হয়ে উঠছিস মণীশ! চুল আঁচড়াস নি, তবু এলোমেলো চুলেই তোকে কেমন সুন্দর লাগে! সন্ধ্যার কথা শুনে মণীশ বলে,—বয়স তো বাড়ছে সন্ধ্যাদি! আর দু-তিন বছর পরে তো বাইরে চলে যেতে হবে। আমি কলকাতায় পড়তে যাব সন্ধ্যাদি! চিরকাল তো তোমাদের এই গাঁয়ে, বনে থাকতে পারব না। মানুষ হতে হবে।

সন্ধ্যা বলে,—তুই কলকাতায় যাবি? বলিস কি রে?

মণীশ বলে,—হ্যাঁ।

সন্ধ্যার মুখ যেন ম্লান হয়ে যায়। মণীশ তা লক্ষ্য করে বলে,—ভাবছ কেন সন্ধ্যাদি, অনেক দেরি আছে। তোমাকে আমি সব শিখিয়ে দিয়ে যাব। দু বছরে অনেক লেখাপড়া শিখবে তুমি। আমি বলি কি পাড়ার মেয়েদের নিয়ে তুমি একটা স্কুল কর সন্ধ্যাদি! বেশ হবে।

সন্ধ্যা বলে,—কিন্তু তা হলে কি আর রক্ষে থাকবে? কোন দরকার নেই মণীশ! ব্রতকথার বই পড়তে পারলেই ঢের হবে।

মণীশ বলে,—রাবিশ! যত সব আজগুবী গল্প সন্ধ্যাদি! ওসব পড়ে কি হবে? বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা পড়েছ? না, তুমি তা পড়বে কি করে? আনন্দমঠ? না, শীগগির সব শিখে নাও সন্ধ্যাদি! বেশ এই তো আনন্দমঠ রয়েছে, আমি তোমায় পড়ে শোনাব—। কি সুন্দর গান?—বন্দেমাতরম্! সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।"—কাকে বলছে জান সন্ধ্যাদি! আমাদের দেশ—এই গোটা ভারতবর্ষটাকে বোঝাচ্ছে।

মণীশ আনন্দমঠ পড়ে যায়; সন্ধ্যা একমনে শোনে। মাঝে মাঝে মণীশ

টীকা-টিপ্পনি করে বুঝিয়ে দেয়,—এ যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বর্ণনা সন্ধ্যাদি! এমনই অবস্থা হয়েছিল দেশের।

সন্ধ্যা বলে,—এসব সত্যি মণীশ? হ্যাঁ, আর এই মহেন্দ্র আর কল্যাণীর শেষে কি হল?

—সবই শুনতে পাবে সন্ধ্যাদি! দু দিন পরে তুমি নিজেই সব পড়তে পারবে।

সন্ধ্যা শ্রোতা আর মণীশ পাঠক ও বক্তা। এমনি করেই দিন যায়। নূতন জগতের আস্বাদ পায় সন্ধ্যা। নিজের মধ্যেই একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করে। সপ্তদশী সন্ধ্যা হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে উঠল; তার মধ্যেও যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ অনুভব করে।

৬

কাঞ্চনগড়!—ছবির মত লাগে মণীশের চোখে। এই কাঞ্চনগড়ই তার জীবনে এনেছে নূতন স্রোত। গাঁয়ের পরিবেশে এতদিন বদ্ধ ছিল তার দৃষ্টি। বাড়ির কাছেই কাঞ্চনগড়,—মাত্র দু ক্রোশ পথ। অজগরের মত এঁকে-বেঁকে চলে গেছে বড় রাস্তা,—লোকাল বোর্ডের সড়ক। মাঠের মাঝখান দিয়ে বাজারের মধ্য দিয়ে চলে গেছে পশ্চিম দিকে। তার পর নদীর ধার দিয়ে পশ্চিমের ওই পাহাড়ের ভেতরে যেন লুকিয়ে পড়েছে। তারই ওধারে কাঞ্চনগড়। বছর দুই আগেও কাঞ্চনগড় তার কাছে রহস্যময় ছিল।

আজ সেই কাঞ্চনগড় সত্যই তার চোখ খুলে দিয়েছে। তার দেশ যে এত সুন্দর, এত মধুর, তা সে জানত না; বুঝতে চেষ্টাও করত না। চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন কনকবাবু, সত্যি সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং মাতরম্। শ্যামল মাঠ, আঁকা-বাঁকা নদীনালা, আর ছায়াঘেরা গ্রামগুলির দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে মণীশ তাকিয়ে থাকে। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে ছোট ছোট ঝুর্ঝুরী,—মানুষের আবাস। সাদা, লাল আর গিরিমাটির রঙের চালাগুলি কেমন সুন্দর লাগে। লালচে রঙের পাহাড়-কাটা পথগুলি সাপের মত এঁকে-বেঁকে উঠে গেছে টিলায় টিলায়। মাঝে রয়েছে বিরাট নদী,—পাহাড়ী অজগর। নাম তার বরাকর। নদীর এপারে

ওপারে বিচিত্র শোভা। দু দিক থেকে সারি সারি পাহাড় এসে নেমেছে। যেন সারি সারি হাতি নেমেছে নদীগর্ভে।

বেশ লাগে মণীশের; সঙ্গী জুটেছে অনেক। দু ক্রোশ পথ হেঁটে আসতে ক্লান্তি বোধ হয় না। সন্দীপ, নীতীশ, প্রবীর, সুধীর, আব্দুল আর নাসোয়ার আলি সারা পথ দাপাদাপি আর গল্পগুজবে মত্ত থাকে। এদের মধ্যে সুধীরের সঙ্গেই মণীশের বেশি ভাব। সুধীর এক ক্লাস নীচুতে পড়ে; খুব সুন্দর সুঠাম চেহারা, বয়সেও সকলের চেয়ে সুধীর ছোট। লাজুক ছেলে সুধীর। তার কাকা বড় সরকারী চাকুরে।

মাঝে মাঝে মণীশ সুধীরকে নিয়ে অন্য ছেলেদের এড়িয়ে আগে চলে আসে। পাহাড়ের ধারে ছিল একটা বড় চাঁপা গাছ, সেই চাঁপাগাছের তলায় বসে দু জনে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে; কোনদিন বা পড়ে আনন্দমঠ। কোনদিন সুরথ আর রহমন দারোগার ছেলে নাসির এসে তাদের দলে ভিড়ত। সুধীর আর মণীশের সম্পর্কে বন্ধুরা অনেক সময় ঠাট্টা-বিদ্রূপও করত। নাসির বলত,—তোমরা দু জনেই বড্ড লাজুক, স্কুলে তো বাবা বেশ চুপচাপ থাক, কারও সঙ্গে মিশতে চাও না। এখন দেখছি ডুবে ডুবে জল খেতে শিখেছ।

নাসির ছিল অত্যন্ত দুর্দান্ত। সুরথকে একটু দাম্ভিক বলেই মনে হত। মণীশের পাঠ্য বই সব ছিল না। একদিন অঙ্কের মাষ্টার অক্ষয়বাবু অঙ্কের বই দেখাতে পারে নি বলে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। ছুটির পর নাসির বললে, —নে মণীশ, আমার গণিতটা তুই নিয়ে যা। আমার দুখানা আছে। অক্ষয়বাবু বলতেন,—যারা বই কিনতে পারে না, তাদের আবার লেখাপড়া করতে আসা কেন? সবাই যদি লেখাপড়া করবে, তা হলে লাঙল ধরবে কে? অক্ষয়বাবু বড় কড়া লোক ছিলেন; রীতিমত বাড়ির অঙ্ক করে না গেলে শাস্তি দিতেন তিনি। নাসিরই শাস্তি পেত বেশী। সপাসপ বেত লাগাতেন অক্ষয়বাবু।

কনকবাবু শাস্তি দিতেন না; কচিৎ কদাচিৎ কেউ তাঁকে ফাঁকি দিত। যা করাবার তিনি ক্লাসেই করাতেন। মাঝে মাঝে আসতেন সর্বেশ্বরবাবু; সবাই তাঁকে ডাকত সর্বেশ্বর মাষ্টার। স্কুলের সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না।

কিন্তু প্রতি শনিবারে ছাত্রদের নিয়ে ডিবেটিং-এর সভা বসাতেন কনকবাবু। সেই সভায় সর্বেশ্বরবাবু আসতেন।

সর্বেশ্বরের সত্যিকার পরিচয় জানত না মণীশ। সবাই বলত,—আধপাগলা সর্বেশ্বর মাষ্টার। কোথা থেকে এসে কাঞ্চনগড়ের পাহাড়ের কোলে এসে বাসা বেঁধেছিলেন, কেউ তা জানত না। এপাশে কাঞ্চনগড় আর ওপাশে ফুলছড়ি। দু গাঁয়ের লোকই তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়েছিল। প্রথম প্রথম নাকি তাঁকে সকলে এড়িয়েই চলত। কিন্তু পাহাড়ীরা তাঁকে আপন করে নিয়েছিল। পাহাড়ীরাই সর্বেশ্বরকে মাষ্টারমশাই আখ্যা দিয়েছিল।

সুরথ সর্বেশ্বরেরই ছেলে। পাহাড়ের কোলেই সর্বেশ্বরের আস্তানা। দূর থেকে সুরথের বোন সুজাতাকেও মণীশ দু-এক দিন দেখেছে। আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথে দু-তিনটা পাহাড় পার হলে সর্বেশ্বরের ঘর। সেই পথ দিয়ে মাঝে মাঝে পাহাড়ীদের সঙ্গে ছুটে যেত সুজাতা। সুরথ মাঝে মাঝে মণীশকে তাদের আস্তানায় নিয়ে যেতে চাইত, কিন্তু মণীশ কোনোদিন রাজি হয় নি। তার কারণও ছিল। সর্বেশ্বরকে ভাল চোখে দেখেন নি ফুলছড়ি গাঁয়ের জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী। কাঞ্চনগড়ের সুলেমান রাজাও একদিন বিদ্রূপের হাসি হেসেছিলেন; কিন্তু তিনিই সর্বেশ্বরকে শেষে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কৃষ্ণপ্রসাদ বলতেন,—"সর্বনাশ করছে সুলেমান রাজা। একদিন তার ফল ভোগ করবে।" সুলেমান রাজা বলতেন, —সর্বেশ্বর লোকটা পাগল। ভদ্রসমাজে মেশে না। লেখাপড়া জানে। ইংরাজী কাগজও রাখে রীতিমত। কিন্তু ওই জানোয়ার পাহাড়ীদের নিয়েই থাকে।

পাহাড়ীরাই ছিল সর্বেশ্বরের আপনজন। তিনি তাদের জীবনে নূতন স্রোত বইয়ে দিয়েছেন। সকাল সন্ধ্যায় পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা পাততাড়ি বগলে সর্বেশ্বরের উঠানে জড়ো হয়। পাহাড়ী বস্তীর চেহারা পালটে দিয়েছেন সর্বেশ্বর মাষ্টার। কনকবাবুও সর্বেশ্বরকে শ্রদ্ধা করেন। তবু মণীশ সুরথের অনুরোধ একদিনও রাখে নি।

•

হঠাৎ একটা বিপর্যয় ঘটবার উপক্রম হল। মণীশের মনে হল—আনন্দমঠের

সন্তানেরা যেন জেগে উঠেছে। দলে দলে আসছে সন্তানের দল। আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল—বন্দেমাতরম্! আর তার সঙ্গে শোনা যেতে লাগল—আল্লাহ্ আকবর!

অজানা পুলকে ভরে ওঠে মণীশের মন। কনকবাবু বলেন,—দেশ জেগে উঠেছে। কিন্তু বড অকালে জেগে উঠেছে। এটা ভাল নয়। এ টাল সামলাতে পারবে না। সত্যানন্দেব আবির্ভাব এখনও হয় নি। সত্যানন্দ এখনও নির্জন গিবিগুহায় তপস্যা কবছে। তোমরা সাবধান।

সাবধান হয়েও নিস্তাব নাই। আকাশ-বাতাস কাঁপছে, কেঁপে উঠেছে দেশটা। গুর্খা সৈন্যেব আমদানি হয়েছে কাঞ্চনগডে! দলে দলে ক্ষ্যাপা ছেলেরা রাস্তা দিয়ে চলেছে—চেনা-অচেনা কত মুখ। হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে চলেছে—আল্লাহ্-আকবর! বন্দেমাতবম্। কিশোব মণীশ স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে মিছিল দেখছে। সেও ছুটে যেতে চায়, কিন্তু পাবে না।

প্রসন্ন তর্কবত্ন সেদিন শাসিয়েছেন—হিন্দুব ছেলে হয়ে আল্লাহ্-আকবর বলছে যাবা, তাদেব একঘরে কবতে হবে। ছিঃ ছিঃ জাতধর্ম আর থাকে না। কৃষ্ণপ্রসাদ বলেছেন—ওদের বাবার চাকুরি যাবে। মণীশ ভাবে, তার বাবা তো নেই। তার আবার কিসের ভয়। পিসীমা বলেন,—কোন জন্মে আর চাকবি পাবে না বাবা! সর্বনাশ হবে। গোকুলকাকা বলেন,—কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে? ইংরেজ তাড়াবে? কখনও পাববে না। ঘোব কলি বাবা। হিন্দুবা বললে—আল্লা, আল্লা। প্রসন্ন বুড়ো বলেছে—থাকত হিন্দু রাজা, তা হলে জিবটায় গরম তেল ঢেলে দিয়ে শুদ্ধ করে নিত। হাঃ—হাঃ—হাঃ—গোকুলকাকা হেসে উঠলেন।

খবরেব কাগজে অনেক কিছু খবর থাকে। কিন্তু খবরের কাগজ কোথায় পাবে মণীশ? কাঞ্চনগডের দু-চার জন মাত্র কাগজ রাখেন। কনকবাবু মাঝে মাঝে অনেক সংবাদ পড়ে ছেলেদের শোনান। আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে,—স্বদেশী আন্দোলন। এবার আর বোমা পিস্তল নিয়ে নয়, নিরস্ত্র অভিযান।

মণীশ ভাবতেই পারে না, নিরস্ত্র অভিযান কি হতে পারে? কনকবাবু বলেন, বুঝলে না বিলাতী জিনিস বয়কট করবে। বণিকের জাত এই ইংরেজ;

বাণিজ্য করতেই আসা এদেশে। বাণিজ্য বন্ধ হলেই জব্দ হবে।

মণীশ তবুও বোঝে না; বিলাতী জিনিস বয়কট করে কি লাভ? কাপড়-চোপড় কাগজ কলম সবই বিলাতী। এদেশের লোকের চলবে কি করে? কিন্তু দেখতে পায়, সকলেই কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, গাঁয়ের সকলে কেমন ভয় পেয়ে গেছে। কখন কি হয়, তার ঠিক নেই। অথচ হাটে বাজারে বের হতেও লোকের ভয়। পিসীমা তো সব সময়ই ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখেন। কখনও বা বলেন, কি জানি বাবা! কখন এসে স্বদেশী ডাকাতরা ঘরে ঢুকে পড়ে। তা হলে কি রক্ষে আছে! পুলিশ এসে সব তছনছ করে দেবে? সবার চাকরি যাবে।

বাজারে দোকানীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। বৈকুণ্ঠ সাহা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। তাঁর মস্ত বড় কাপড়ের দোকান। বিলাতী কাপড় না কি স্বদেশী ডাকাতরা পুড়িয়ে দিচ্ছে; ভয়ে কোন খদ্দের দোকানে ঢোকে না। শুধু গুজব। কত যে গুজব ছড়ায় লোকে। সকলের মুখে এক কথা, বিদেশী জিনিস ছাড়তে হবে। অচল হবে শাসনযন্ত্র। ইংরেজের চাকরি ছাড়তে হবে। নন্‌-কো-অপারেশন অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলন।

স্কুলের ছেলেদের মধ্যে অনেকেই যোগ দিয়েছে আন্দোলনে। মণীশ ভাবে, এই কি আন্দোলন? এর নাম কি অসহযোগ? রাস্তায় রাস্তায় সংকীর্তনের মিছিলের মত দলে দলে তারা বেরিয়েছে। চীৎকার করে বলছে, বন্দেমাতরম্, আল্লাহ্‌-আকবর। স্কুলের কাছেই থানা। বড় দারোগা রহমন সাহেবের বুটের আওয়াজ শুনলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। বন্দুক হাতে সান্ত্রীরা ঘুরছে। তার উপর গুর্খারা এসে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে। আতঙ্ক হয় তাদের দেখলে। মণীশ জানে যুদ্ধ করে ওরা। মানুষও মারে। দয়ামায়া নেই গুর্খাদের। বড় নির্মম, বড় নিষ্ঠুর এই গুর্খারা। সাবধান করে দেন মণীশের পিসীমা।

সন্ধ্যা নিষেধ করে,—স্কুলে গিয়ে কাজ কি মণীশ! এ কদিন নাই বা গেলে। তবু যেতে হয়। পিসীমা বলেন, এখন স্কুলে না গেলে তিন জন্মেও চাকরি পাবি না। স্কুলটার জন্ত বড় মায়া হয়। স্কুলটা নাকি স্বদেশীরা বন্ধ করে দেবে। এটা নাকি গোলামখানা। স্কুল আর কলেজে শুধু গোলাম তৈরী হয়! মণীশ একথার

কোন অর্থই খুঁজে পায় না। যাঁদের ছবি সে পড়ার বইতে দেখে, যাঁরা এত ভাল ভাল বই লিখেছেন, তাঁরা কি লেখাপড়া শেখেন নি! এই কনকবাবু, গনিরাজা এরা সকলেই তো স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করেছেন। না, না, মিথ্যা কথা! বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ লিখেছেন, তাঁর পাগড়িওয়ালা প্রশান্ত মুখ-চোখের সামনে ভাসে। রবীন্দ্রনাথের দাড়িওয়ালা দীপ্ত মুখশ্রী দেখলেও তো তা মনে হয় না। নবীন সেন, হেমচন্দ্র,—আরও আরও অনেকে তার মনোজগতে উঁকি-ঝুঁকি মারেন। এঁরা কি গোলাম?

মণীশ অস্থির হয়ে ওঠে। স্কুলে না গেলেও রক্ষা নেই; সবাই বলে বাবার চাকুরি যাবে। কিন্তু মণীশের তো বাবা নেই; তার কেউ কোনকালে চাকুরি করে বলে সে জানে না। তবুও ভয়, এখন স্কুলে না যাওয়াটাই নাকি নন্-কো-অপারেশনের সামিল। কৃষ্ণপ্রসাদ শাসিয়েছেন, তিনি ইংরেজের প্রজা। তাঁর জমিদারিতে কেউ এ আন্দোলনে যোগ দিলে তাকে ভিটে ছাড়তে হবে। তাঁর মান বাঁচানো দরকার। রহমন দারোগা শাসাচ্ছেন, বাড়িসুদ্ধ সবাইকে বেঁধে নেবেন, ফাটকে পুরবেন।

তবুও মণীশের অফুরন্ত কৌতূহল। দেশ স্বাধীন হবে, ইংরেজ-রাজত্ব আর থাকবে না। বেশ হবে; আবার ভাবে, তারা চলে গেলে রেলগাড়ি স্টীমার, টেলিগ্রাম সবই নিয়ে যাবে তারা। তখন কি হবে?

তাদেরই গাঁয়ের শম্ভুনাথ স্বদেশীদলের পাণ্ডা হয়ে এসেছে। শম্ভুনাথকে সকলে ভয় করত। দুর্দান্ত ছিল এই শম্ভুনাথ। খেলাধুলা আর মারামারি নিয়ে থাকত। স্কুল থেকে নাকি তাকে বের করে দিয়েছিল। সেই শম্ভুনাথ মণীশদের শম্ভুদা এতদিন চাকুরির খোঁজে শহরে কোথায় তার মামার কাছে চলে গিয়েছিল। শম্ভুনাথ ফিরে এসেছে, চাকুরি নিয়ে নয়, শম্ভুনাথ নাকি এ অঞ্চলের নেতা হয়ে এসেছে,—স্বদেশী নেতা।

শম্ভুনাথ বলছে,—দেশ স্বাধীন হতে চলেছে। আর ইংরেজী পড়ে কি হবে? স্কুলে যত সব বাজে জিনিস পড়ায়। ইংরেজ ভাল ভাল ছেলেদের মাথা খাচ্ছে। যত সব সাহেবদের বই বিক্রির ফন্দি। সাহেবদের লেখা গ্রামার, জ্যামিতি,

মায় ভূগোল ইতিহাস পর্যন্ত সব ইংরেজীতে লেখা। ঐ যত সব অ্যালজাব্রা-ট্যালজাব্রার দরকার কি বাপু? আমাদের বেদ কোরানের নামগন্ধ নেই, পড়ছ কি না বাইবেল। এত পড়ার দরকারই বা কি? চিঠিপত্র লেখা, বাজার খরচের হিসাব লেখা—এই তো ঢের। দেশের খবর রাখে না। পৃথিবীর ভূগোল, পৃথিবীর ইতিহাস পড়ে। ছ্যাঃ, ছ্যাঃ, গান্ধীমহারাজ ঠিকই বলেছেন,—যত সব গোলামখানা!

শম্ভুনাথের আস্ফালন দেখতে পায় মণীশ। শম্ভুনাথ এখন সকলের যেন কত আপনজন হয়ে উঠেছে। শম্ভুনাথের কাছে ঘেঁষতে পারলে সকলেই যেন গর্ববোধ করে। এমনি একটা ভাব দেখা যায়, ছাত্র আর যুবকদের মধ্যে। তারা শম্ভুনাথকে 'শম্ভুদা' ডেকে আপন করে নিয়েছে। সেই দুর্দান্ত শম্ভুনাথের চেহারাও যেন পালটে গেছে।

শম্ভুনাথ বলে,—দেশ নিশ্চয়ই স্বাধীন হবে। তারিখও নাকি ঠিক হয়ে গেছে একটা। মহাত্মা গান্ধী আর মৌলানা মোহাম্মদ আলি আসছেন। তাঁরাই মন্ত্র দিয়েছেন,—আল্লাহ্-আকবর, বন্দেমাতরম্।

মণীশ মুগ্ধচিত্তে শম্ভুনাথের কথা শোনে। শম্ভুনাথ বলে,—খেলাফত্-আন্দোলন আর ভারতের স্বাধীনতার জন্য হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে লড়বে। শম্ভুনাথ তাদেরই গাঁয়ের ছেলে। বিশেষ করে ছোটবেলা থেকেই শম্ভুকে দাদা বলে ডাকে সে। শম্ভুনাথ বলে,—স্কুল ছেড়ে দে মণীশ! তোর ভাবনা কি? আমি আছি।

শম্ভুনাথের কথায় মণীশ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। কিন্তু গনিরাজার কথা শুনে নিরুৎসাহ হয়। কনকবাবু এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলতে চান না। গনিরাজাও তাদের শিক্ষক। গনিরাজাকেও ছেলেরা ভালবাসে। গনিরাজা হো হো করে হাসেন আর বলেন,—যত সব পাগলামি! ওরা সব মিথ্যে কথা বলছে। ইংরেজ-তাড়ানো কি সোজা কথা? জানিস তো,—ইংরেজ-রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না। এ রাজত্ব কি সহজে যায় বাবা? কিসের দুঃখে ইংরেজ তাড়াবে? কি অপরাধ করেছে তারা? বরং ইংরেজ এসেই তোমাদের বাঁচিয়ে দিলে। আবার কি

কাজীর বিচার ডেকে আনবে? ইতিহাস পড় নি? ইতিহাস? ভাই ভাইকে কাটছে, অন্ধ করে দিচ্ছে, বাপকে বন্দী করে রাখছে। জ্যান্ত মানুষকে কবর দিচ্ছে,—যত সব জানোয়ারের কাহিনী। এদেশের লোককে জানতে বাকি নেই বাবা! যে যাই বলুক, সুক্ষ্ম বিচার করে ইংরেজ। আপনপর ভেদ নেই; একটা ইংরেজকে মার, তোমারও বিচার হবে। আগে সাক্ষ্য নেবে, প্রমাণ নেবে। আদালতে দস্তুরমত বিচার করবে। তার পর শাস্তি না হয় মুক্তি। দোষ প্রমাণ না হলে ইংরেজ শাস্তি দেয় না। মোগল, পাঠান, হিন্দু কাউকে জানতে বাকি নেই। ইংরেজ তাড়াবে? এত বড় রাজত্বটা কে চালাবে? এই শম্ভুনাথের দল?

গনিরাজার কথায় ছেলেরা শান্ত হয়। ছেলেদের উত্তেজনা অনেকটা কমে যায়। দোহারা গড়ন, লম্বা চেহারা। শ্যামল তাঁর গায়ের রঙ; সুন্দর পাকানো গোঁফ। উচ্ছ্বাসভরে কথা বলেন গনিরাজা। তিনি বলেন,—জান বাবা! কত উপকার করেছে ইংরেজ। রেলগাড়ি, স্টীমার, টেলিগ্রাফ আর নানা যন্ত্রপাতির কথা ছেড়েই দিলাম। দেশে শান্তি এনেছে ইংরেজ। চোর-ডাকাত শায়েস্তা করেছে। পারবে তোমরা? অশোক পারলে না, আলাউদ্দীন পারলে না, আকবর পারলে না; এমন যে জবরদস্ত বাদশা ঔরংজীব, সেও পারলে না। পারলে শুধু ইংরেজ। এক সুতোয় সমস্ত ভারতবর্ষটাকে বেঁধে দিয়েছে তারা।

গনিরাজার ঠাকুর্দা ছিলেন খানবাহাদুর। গনিরাজার পক্ষে স্কুল-মাষ্টারি করাটা শখের চাকুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁরই দাদা সুলেমান রাজা স্কুলের সেক্রেটারী। দুই ভাইই যেন কেমন আধপাগলা-গোছের। মজার মানুষ ছিলেন গনিরাজা। কখনও বা বলতেন,—এসব নন্-কো-অপারেশনে হবে না বাবা! লৌ দিতে হবে,—লৌ। বুঝলে,—রক্ত দিতে হবে। শির দিতে হবে। তা হলে স্বাধীন হতে পারে।

শম্ভুনাথ ছেলেদের মুখে গনিরাজার কথা শুনে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলত,—আরে রেখে দে তোদের গনিরাজা। দেখবি, তিন মাস সবুর কর।

শম্ভুনাথ এখন ছেলেদের নেতা। তাঁর কথায় পাঁচ-সাত শ লোক ওঠে বসে। শহরের বড় বড় নেতারাও নাকি তার সঙ্গে পরামর্শ করে চলেন। তাঁদেরই

শম্ভুদার ভাগ্য দেখে মণীশের ঈর্ষা হয়। সেই শম্ভুদা,—লেখাপড়া তার বিশেষ কিছুই হয় নি। কাঞ্চনগড় স্কুলেরই ছাত্র সে। সবাই বলে ক্লাস এইট্ পর্যন্ত এগিয়ে আসতেই তার পনেরো বছর লেগেছিল। বাইশ বছর বয়সে ক্লাস এইটে ঠোক্কর খেয়ে শম্ভুনাথ কাঞ্চনগড় থেকে বিদায় নিয়েছিল। বকাটে ছেলে বলেই খ্যাতি ছিল তার। মামা বরদা উকিলই শেষে নিয়ে গিয়েছিলেন তাকে। মণীশ দেখেছে কি দুঃখকষ্টই না পেয়েছেন তারিণী দেবী,—শম্ভুনাথের মা।

সেই শম্ভুনাথ হঠাৎ শহর থেকে ফিরে এল। শম্ভুনাথ নূতন খবর নিয়ে এসেছে। তার উপর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরী করার ভার পড়েছে। নূতন কথা—ভলান্টিয়ার—অর্থাৎ স্বদেশী সৈনিক।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সন্তানবাহিনীর চিত্র ফুটে ওঠে মণীশের সামনে। কনকবাবুর আবৃত্তি মনে পড়ে যায়—"বন্দেমাতরম্"। শম্ভুনাথের উপর মণীশের মন বিশেষ প্রসন্ন ছিল না; শম্ভুনাথ জোর-জবরদস্তি করে তাদেরই আমবাগানের আম পেড়ে নিত। পাড়ার লোক তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মেয়েদের দেখলে বিশ্রী রসিকতা করত শম্ভুনাথ। তার নামে আরও কত কি শুনেছে মণীশ। সেই শম্ভুনাথের এরকম পরিবর্তন দেখে মণীশ হতভম্ব হয়ে পড়ে।

কি উৎসাহ শম্ভুনাথের। চঞ্চল হয়ে উঠেছে দেশটা। উন্মাদনার ঢেউ খেলে যাচ্ছে। মণীশের চোখে ভারতবর্ষের মানচিত্র ভেসে ওঠে। আরব সাগরের তীর থেকে আসামের পূর্বসীমান্ত, আর হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত দেশ কেঁপে উঠেছে। শিহরণ জাগে মনে-প্রাণে। কেবলই ভাবে শম্ভুনাথের কথা। শম্ভুদা বলেছে, আর দেরী নেই। ইংরেজকে এবার তল্পিতল্পা গুটোতে হবে।

পাড়ায় পাড়ায় স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে উঠেছে। গনির গাঁ আর তারিণীপুরের মুসলমানেরা আরও বড় দল গড়ে তুলেছে। যে কাশিম আলির নাম শুনলে বাড়ির বউ-ঝিরা ছুটে পালাত। সেই কাশিম আলি সেই দলের পাণ্ডা হয়েছে। স্কুলেও ভাঙন ধরেছে; জমিদারের নাতি শৈবাল আর কার্তিক রায়ের ছেলে প্রবীর আগেই স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। এমন কি ফার্স্ট ক্লাসের বৃত্তি-পাওয়া ছেলে সন্দীপও

যোগ দিয়েছে শম্ভুনাথের দলে। নামোয়ার আলি আর স্কুলেই আসে না। সুলেমান রাজা শাসিয়েছেন সন্দীপকে,—অনেক করে বুঝিয়েছেন; তবু সন্দীপ শোনে নি। রহমন দারোগা বলেছেন,—বৃত্তি কাটা যাবে; আর জেলও হতে পারে।

হেডমাস্টার হরিপ্রসন্নবাবু নির্বিকার। তিনি কোনওদিকে কোনও মতামত প্রকাশ করেন না। গনিরাজার উপরেই সকল ভার। দুই ক্রোশ পথ হেঁটে আসতে হয় মণীশকে। সঙ্গীসাথী প্রায় সকলেই স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। আব্দুল আর হরেন অবশ্য বাড়ি থেকে বইবগলে তার সঙ্গে আসে। কিন্তু স্কুলের কাছে এসেই তারা আর এগিয়ে যায় না। শম্ভুনাথের আড্ডা হয়েছে কাঞ্চনগড়ের বাজারে। নিশি দত্তর দোকানের সামনে লাল সালুর কাপড়ে লেখা রয়েছে বড় বড় সাদা অক্ষরে—স্বরাজভবন। এখানেই স্কুল পালিয়ে ছেলেরা আসে।

সুধীর বলে,—কি করব ভাই! এ তো বড় মুশকিল! রাস্তায় এরা রোজই আটকায়। স্কুলে যেতে দেবে না।

মণীশ বলে,—কেন দেবে না? জোর-জবরদস্তি করবার কথা নয়, শম্ভুদা বলেছে এটা অহিংস আন্দোলন। মরবে তবু মারবে না।

সুধীর হেসে উত্তর দেয়,—যত সব বাজে কথা। এই দেখ না নামোয়ার আর হরেন টানাটানি করে আমার জামাটা ছিঁড়ে দিয়েছে। সুরথ বলেছে, বই ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলে দেবে।

সুধীরের কথা শুনে মণীশ উত্তেজিত হয়ে পড়ে; ভয়ও লাগে মনে। কি জানি, যদি এরা বই-টই কেড়ে নেয়। তার নিজের বই দু-একখানির বেশি নেই, সবই স্কুলের বই কিংবা বন্ধুবান্ধবের দেওয়া বই। কিছুক্ষণ চিন্তা করে মণীশ বলে,—কি আর করব বল! স্কুলে না গেলেও রক্ষে নেই। বেশ, আমি শম্ভুদাকে বলে দেখব।

দুই বন্ধুতে নীরবে বদরপুরের লৌহসেতুর নীচের রাস্তা দিয়ে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যায়। উপরের দিকে পাহাড়ের কোলে সর্বেশ্বরের আশ্রমের ঘরগুলি

দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আশ্রমই বটে। সকলেই বলে সর্বেশ্বরের আশ্রম। পাহাড়ের উপরে একটা সমতল চত্বর; তারই এদিকে ওদিকে পাহাড়ের পর পাহাড়, ঢেউয়ের পর ঢেউ। শেষ ঢেউটা যেন আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে। তার মাথায় অভ্রের মুকুট। তারই একপাশ দিয়ে রেলের লাইন চলে গেছে। মাঝে মাঝে দেখা যায়,—অজগরের মত ফোঁস ফোঁস করে রেলগাড়ি এই লাইন ধরে চলে যায়, আবার পাহাড়ের বুকে দূর দিগন্তে কোথায় লুকিয়ে পড়ে।

নদীর উপর লোহাব সেতু। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ; আশে-পাশে বনজঙ্গল। নদীর ধার দিয়ে চলে গেছে বড় রাস্তা। সুধীর আর মণীশ একটা টিলার উপর বসে সে বিচিত্র শোভা দেখছে। প্রাক্ সন্ধ্যা; রূপ পালটাচ্ছে পৃথিবী। সোনালী ছোপ পড়েছে পাতায় পাতায়। বাসন্তী রোদ কুহক-তুলি বুলিয়ে দিয়েছে বন-বনানীর প্রান্তরে। পশ্চিম আকাশে রঙেব খেলা, নীলসাগরের ওপাশটায় তরল সোনার সঙ্গে আবীর মিশিয়ে ঢেলে দিয়েছে কোন্ এক জাদুকর। সূর্য নামছে পশ্চিমপাটে।

মণীশের গোকুলকাকা কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন। এদিকে সংসারের খরচও চলে না; তাঁর জ্যোতিষীবিদ্যার আয়েই কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলত। চাষের জমি আগেই জমিদার, ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। সুতরাং পিসীমা খুব ফাঁপরেই পড়েছেন। স্কুলের মাইনে আছে, তাও দিতে হয়। তিনটি লোকের ভরণপোষণ সেও সোজা কথা নয়। জয়কালী মাঝে মাঝে এটা সেটা দিয়ে যান। সন্ধ্যাও আসে।

সন্ধ্যা যে মণীশের কাছে এসে লেখাপড়া শেখে এ খবর প্রসন্ন তর্করত্ন জানতেন না। গৃহিণী জয়কালীকে তিনি সমীহ করে চলতেন। পাড়ার লোকেও জয়কালীকে এড়িয়ে চলত; কেউ কেউ তাঁর নাম দিয়েছিল উগ্রচণ্ডা। সেদিন হঠাৎ সন্ধ্যার হাতে একখানা বই দেখে প্রসন্ন তর্করত্ন জিজ্ঞেস করলেন,—ওটা কি রে? সন্ধ্যা বইখানি লুকোতে চেষ্টা করেও পারলে না। বাধ্য হয়েই তাকে উত্তর দিতে হয়—একখানা বই বাবা।

—বই ? কিসের বই ?—ব্রতকথা ?

—না। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি।

—গীতাঞ্জলি ? এ বই পেলে কোথা ?

—কোথা আর পাব ? মণীশের কাছ থেকে নিয়ে এসেছি।

—মণীশের কাছ থেকে কেন ? এ বই নিয়ে তোর কি হবে ? যত সব বাজে বই। আর তুই পড়তে শিখলি কবে থেকে ?

সন্ধ্যা উত্তর দেয়, আমি কিছু কিছু পড়তে শিখেছি বাবা। মণীশের কাছেই শিখছি।

তর্করত্ন প্রায় ভেংচি কেটেই মেয়েকে বললেন, মণীশের কাছে শিখছি। বেশ করেছ। যত সব নষ্টামির বই পড়তে শেখাচ্ছে। ম্লেচ্ছ হয়ে যাচ্ছে ছেলেটা। ছিঃ ছিঃ। কে বলেছে তোকে ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে মিশতে ? দে দেখি বইটা।

না দেব না। বলে সন্ধ্যা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। তর্করত্ন রাগে গজগজ করতে থাকেন। জয়কালী তার সামনে এসে দাঁড়ান। জয়কালী বলেন, মেয়েটাকে অযথা বকছ কেন ?

তর্করত্ন বলেন, তুমি জান মেয়েটা মণীশের কাছে যায় ?

জয়কালী বলেন, হ্যাঁ যায়। তাতে হয়েছে কি ? রাতদিন আমার মত নাক-কান গুঁজে তোমার ঘরে বসে থাকবে না কি ? মেয়েটার সাধ আহ্লাদ তো সব ঘুচেছে। একটু লেখাপড়া শিখে যদি শান্তি পায়।

তর্করত্ন বলেন, লেখাপড়া শিখে শান্তি পাবে ? ব্রাহ্মণের বিধবা পড়বে ওই সব নষ্টামির কবিতা আর গান।

জয়কালী বললেন, নষ্টামির কি পেয়েছ এতে ? আমি শুনেছি, মণীশ কেমন বুঝিয়ে দেয়। কত সুন্দর সুন্দর কথা আছে।

তর্করত্ন বলেন, বুড়ো বয়সে তোমারও ভীমরতি ধরেছে দেখছি।

জয়কালী বলেন, আমার না তোমার ? যাও বলছি। মেয়ের সম্বন্ধে কোন কথা বলতে এস না, সে আমি বুঝব।

তর্করত্ন উত্তেজিত হয়ে বলেন, মেয়ে তোমার লেখাপড়া শিখে খ্রীষ্টান বনে যাবে। তখন বুঝবে।

জয়কালীকে বেশী ঘাঁটাতে তর্করত্ন আর সাহস করেন না। তিনি বিড়বিড় করে কি বলে বেরিয়ে গেলেন, বোঝা গেল না। জয়কালীও গুম হয়ে বসে রইলেন।

সন্ধ্যা ইতিমধ্যে মণীশের ঘরে এসে দেখে মণীশ বসে রয়েছে। তার মুখখানা কেমন যেন বিমর্ষ দেখাচ্ছে। মণীশকে এমন বিমর্ষ সন্ধ্যা কখনও দেখে নি। সন্ধ্যা বললে, কি হয়েছে রে? অমন করে বসে আছিস কেন?

মণীশ বললে, না সন্ধ্যাদি কিছুই হয় নি। গোকুল কাকার জ্বর হয়েছে। সাতদিন হয়, জ্বর থামছে না।

সন্ধ্যা বলে, তা তো জানি। জ্বর কি কারও হয় না? ভাবছিস কেন?

মণীশ বলে, কি করি সন্ধ্যাদি! হারান কবরেজের ওষুধে কোন ফলই হয় নি। কাঞ্চনগড় থেকে ডাক্তার আনব, তার পয়সাই বা কোথা?

সন্ধ্যা চুপ করে থাকে। পিসীমা এসে বলেন, গোকুল এবেলা ভালই আছে মণীশ, তুই এত ভাবছিস কেন? হারান বলেছে, ম্যালেরিয়া জ্বর। এবার পাচন খেতে হবে। এমন সময় বেশ একটা হৈ চৈ শোনা যায়, সন্ধ্যা বাইরে একটু উঁকি মেরে এসে বলে স্বদেশী ভলান্টিয়ারদের মিছিল বেরিয়েছে; হঠাৎ কানে আঙুল দেন মণীশের পিসীমা। স্বদেশী গান ভেসে আসছে,—

রাম রহিম না জুদা কর ভাই,
দিলমে খাঁটি রাখো জী ॥
খোদার বান্দা মোহাম্মদ আলি,
সাক্ষাৎ ধর্ম গান্ধীজী ॥

পিসীমার কাণ্ড দেখে সন্ধ্যা তো হেসেই অস্থির। সন্ধ্যা বলে, একি পিসীমা কানে আঙুল দিয়েছেন কেন?

পিসীমা বলেন,—তোরা ছেলেমানুষ, কি জানবি বল? এসব পাপ কি কানে শুনতে আছে। কোথায় কে লুকিয়ে আছে কে জানে? শেষে ধরে নিক্ আর কি?

মণীশ বলে,—তোমায় ধরে নেবে কেন পিসীমা ?

পিসীমা বলেন,—রাজার বিরুদ্ধে গান করছে ; তাই আমায় শুনতে হবে ? তার উপর আমার হিন্দুর ঠাকুর দেবতার সঙ্গে মুসলমানের আল্লাকে এক বানিয়ে দিচ্ছে। ছিঃ ছিঃ !

সন্ধ্যা বলে,—ঠিক বলেছ পিসীমা! ছোট লোকেরাই এঁতে প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে। সব একাকার করে দিলে আর কি ? তোমার মণীশও তাই চায়।

মুখ টিপে সন্ধ্যা হাসে। পিসীমা বলেন,—হ্যাঁ মা! আর যাই বলিস্, ইংরেজী পড়ে জাত-ধরম ভুলে যাচ্ছে ছেলেগুলো।

মণীশও হাসে। কিন্তু তার কানে ঝঙ্কার দেয় কনকবাবুর কথা। সেদিন সর্বেশ্বরবাবুর বক্তৃতাও শুনেছে—"দেশটাকে আগে গড়ে তুলতে হবে। ছোট বড় ভেদাভেদ ভুলে যেতে হবে। যারা ছোট, তাদেরও টেনে কোলে তুলে নিতে হবে। তা হলেই দেশ আপনাআপনি স্বাধীন হয়ে উঠবে। তাই স্বামীজী বলেছেন, বল ভাই ভারতবাসী আমার ভাই। অজ্ঞ, মুচি, মেথর যে যেখানে আছে, সব ভারতবাসী আমার ভাই।" মণীশ ভাবে, এত ভাল আমার পিসীমা, অথচ এদের কি যে সংস্কার! এরা ছাড়া সব ছোট, আর সবাই নীচু। নীচু যারা, তারা নীচু হয়ে থাকবে। এ যেন বিধাতার বিধান। কি আশ্চর্য ? কি শুচিবাই! মানুষ যে মানুষ—এ কথা এরা ভাবতেই পারে না। আর সন্ধ্যা ? সেও শেষ-কালে একটি পিসীমা হয়ে উঠবে। নিজের অধিকার এরা স্বেচ্ছায় ছাড়ছে, শুধু পরলোক আর পরকালের লোভে।

গুর্খাদের দেখে মণীশের মনে কত কথা জাগে। সে ভাবে এরা তো ভারতবাসী, এরাও হিন্দু! হিন্দুরা এমন নির্মম হতে পারে, সে ভাবতেই পারে না। কি নিষ্ঠুর জাত এরা।—পাহাড়ী ? কিন্তু পাহাড়ীদের কি দয়ামায়া থাকতে নেই! লোকের বুকে গুলি করে মারে গুর্খারা। এদের কি ছেলেমেয়ে নেই ? মা, ভাই, বোন কেউ নেই এদের ?

বেশ তো, ইংরেজরা কি ক্ষতি করছে এ দেশের ? কেনই বা ইংরেজ তাড়াবে ?

আর কয়টা লোক বন্দেমাতরম্ কিংবা আল্লাহ্-আকবর বলে চীৎকার করলেই কি দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে? আর মিছামিছি এখানে এই গুর্খাদেরই বা আনা কেন? কেউ তো লুটপাট কিংবা মারামারি লাঠালাঠি করছে না।

ভেবে কোনই কূলকিনারা মণীশ পায় না। রহমন দারোগা সকলকে হুঁশিয়ার করে দেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই রহমন দারোগা। খুনে ডাকাতরা পর্যন্ত তাঁর নাম শুনলে ভয়ে কাঁপে।

আর মাস্টারসাহেব গনিরাজা? তিনি সব হেসেই উড়িয়ে দেন। শুধু বলেন,—স্কুল-কলেজ ভেঙ্গে কোন ফয়দা হবে না বাবা! বিলাতী কাপড় পুড়িয়ে দেবে! কিন্তু তোমাদের আছে কি? কি পরবে শুনি? লজ্জা নিবারণ করবে কি দিয়ে? খবরদার এদের কথা বিশ্বাস কোরনা।

শম্ভুনাথ ছেলেদের সাবধান করে দেয়,—খবরদার! গনিরাজার সামনে বেফাঁস কোন কথা বলে ফেলবি না। লোকটা রহমন দারোগার চাইতেও সাংঘাতিক।

সুরথ একটু বেপরোয়া। সে বলে উঠে,—সাংঘাতিক? সে আবার কি রকম শম্ভুদা? আমরা তো জানি বেশ সাদাসিধে লোক গনিরাজা।

শম্ভুনাথ নীচু গলায় বলে,—স্পাই। গনিরাজা স্পাই।

সুরথ বলে,—স্পাই? কিসের স্পাই শম্ভুদা?

শম্ভুনাথ বিজ্ঞের মত উত্তর দেয়,—স্পাই বুঝলি না?—পুলিশের গুপ্তচর। লুকিয়ে লুকিয়ে সব কথা জানিয়ে দেয়। ইংরেজের সঙ্গে ব্যাটার যোগসাজস আছে। মাস্টারিটা শুধু লোক-দেখানো। দেখবি, দেশ স্বাধীন হলে এদের কি শাস্তিটাই না হয়।

সুরথ বলে,—কি শাস্তি হবে শম্ভুদা?

শম্ভুনাথ গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়,—হাত-পা বেঁধে বাজারের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে ব্যাটাদের চাবকাতে হবে।

সুরথ উৎকণ্ঠার স্বরে বলে,—না, না, গনিরাজা বড় ভাল লোক শম্ভুদা!

শম্ভুনাথ বলে,—তুই বড় সেন্টিমেন্টাল সুরথ! দেশের কাজে এ রকম সেন্টিমেন্টের প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। গনিরাজা তোদের বেশ ভুলিয়ে রেখেছে। তা

না হলে কি আর স্পাইগিরি করতে পারে? দেশের সর্বনাশ করছে এরা। রহমন দারোগার দাপটও চুরমার হবে। এদের অন্ধকার ঘরে পুরে রাখা হবে। আর মাঝে মাঝে ফুটন্ত তেল ছিটিয়ে দেওয়া হবে গায়ে।

গনিরাজা আব রহমন দারোগার শাস্তিব বিধান শুনে মণীশ শিউরে উঠে। সে আর চুপ করে থাকতে পারলে না। সে শম্ভুনাথকে জিজ্ঞেস করে,—সত্যিই কি এ রকম শাস্তি দেবে শম্ভুদা?

শম্ভুনাথ বলে,—নিশ্চয়ই। আমরাই এদের শাস্তি দেবো। এ সব দেশদ্রোহীদের বিচার করবে দেশেব লোক।

মণীশ বলে,—আর ওই গুর্খাদের কি হবে? ওদের হাতে যে বন্দুক রয়েছে।

মণীশেব কথা শুনে হো হো করে শম্ভুনাথ হেসে উঠল। তার পর কৌতুকভরে শম্ভুনাথ বললে,—কেন? বন্দুকের গুলিকে খুব ভয় বুঝি?

মণীশ কোন উত্তব দিতে পারে না। শম্ভুনাথ বলে,—ওরা কাপুরুষ মণীশ! বন্দুক হাতে থাকলে যে কেউ লড়াই করতে পাবে। আমরা কাপুরুষ নই; বন্দুক দেখে ভয় কবলে চলবে কেন? এই বন্দুক দেখিয়ে আমাদের থামাতে পারবে না।

সুরথ বলে উঠে,—তা হলে বন্দুক নিয়ে কি গুর্খারা পালিয়ে যাবে?

শম্ভুনাথ বলে,—না রে, দেশ স্বাধীন হলে গুর্খাদেব হাতের বন্দুক আপনি খসে পড়বে। ইংরেজ পালালে এবা আপনাআপনি শায়েস্তা হয়ে যাবে। এরা তখন আমাদের হয়েই লড়বে।

মণীশ বলে,—যারা ইংরেজের চাকরি করছে, তারা সবাই কি শাস্তি পাবে শম্ভুদা!

শম্ভুনাথ উত্তর দেয়,—না রে সবাই শাস্তি পাবে কেন? লোক বুঝে শাস্তি দেওয়া হবে।

সুরথ বললে,—এই দারোগা, হাকিম, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ এদের নিশ্চয়ই শাস্তি হবে।

শম্ভুনাথ বলে,—সে সব পরে দেখা যাবে। এখন এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। যার যেমন অপরাধ, তার তেমনি শাস্তি হবে।

শম্ভুনাথের সকল কথা মণীশ মেনে নিতে পারে না। সে মনে মনে ভাবে,—গনিরাজাকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু রহমান দারোগার কি হবে? তাঁকে তো রক্ষা করা যাবে না। রহমন দারোগা যে নাসিরের বাবা! আহা-হা, বেচারী নাসির! বাড়ি থেকে আজকাল নাসির বড় একটা বের হয় না। সুরথের সঙ্গে তার ভারি ভাব। কিন্তু সুরথের সঙ্গে এত মাখামাখি রহমন দারোগা পছন্দ করেন না। সুরথ নাকি স্বদেশীদলে যোগ দিয়েছে। আর সর্বেশ্বরবাবু সম্বন্ধে কানাঘুষা অনেক দিন থেকেই চলেছে। তিনি নাকি আরও সাংঘাতিক।

শম্ভুনাথ আগেই বলেছিল,—শহর থেকে নেতারা আসছেন। এখানে নাকি বক্তৃতা দিয়ে দেশের লোককে সকল কথা বুঝিয়ে দেবেন তারা। শম্ভুনাথ এখানকার ভলান্টিয়ার দলকে তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য তৈরী করছে। কাশিম আলি আর শম্ভুনাথ পাড়ায় পাড়ায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

সত্যই একদিন হঠাৎ সকলে সতর্ক হয়ে উঠল। আতঙ্কের ছায়া দেখা যায় সকলের চোখে-মুখে। শোনা গেল, আজই শহর থেকে নেতারা আসবেন। তাঁদের সঙ্গে থাকবে মস্ত বড় স্বেচ্ছাসেবক দল। এখানকার স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রস্তুত হয়েছে। সকলেই বলাবলি করছে,—কি জানি আজ কি হবে! বাজারে আগুন জ্বলবে। বিলাতী কাপড়ের যজ্ঞ হবে বাজারের মাঝখানে। স্তুপাকার কাপড় জড়ো করেছে শম্ভুনাথ আর কাশিম আলির দল।

রহমান দারোগা সেদিন স্কুলে এসেছেন। তিনি ছেলেদের বুঝিয়ে বলবেন। সকলেই কেমন সন্ত্রস্ত। স্কুলের সেক্রেটারী সুলেমান রাজাও এসেছেন। রহমন দারোগা মেঝের উপর সবুট পদাঘাত করে বক্তৃতা সুরু করলেন,—বাবা সকলরে! আইজ বড় দুর্দিন। আমাদের মান ইজ্জৎ তোমাদের উপর নির্ভর করছে। কাঞ্চনগড়ের মান তোমরাই রাখবে। শুধু কাঞ্চনগড়ের কেন?—আশপাশের সকল গাঁয়েরই ইজ্জৎ তোমাদের হাতে। শালার ব্যাটা শালা ইংরেজ যেন না হাসে। আমরা রাজভক্ত প্রজা। ইংরেজ যেন আমাদের বদনাম না দিতে পারে। ইংরেজ তো কোন দোষ করে নাই বাবারা! তবু কেন সুখে থাকতে ভূতে মারা। দেখছ তো, কি সুখেই না রেখেছে ইংরেজ। এ সারা দুনিয়াটা ইংরেজের দখলে।

হেন দেশ ভূভারতে নাই, যেখানে ইংরেজলোক ডেরা খাটায় নাই।

সুলেমান রাজা সমর্থনসূচক হাততালি দিয়ে বলেন,—আলবৎ! দেশের মান ইজ্জৎ বল, আর ভবিষ্যৎ বল সবই তোমরা।

রহমন দারোগা আবার মেঝের উপরে পদাঘাত করে বলতে লাগলেন,—কেন এসেছে এই হারামজাদা ব্যাটারা,—এই ইংরেজরা সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে কেন এসেছে এই দেশে? বলতে পার? কি গরজ ছিল তাদের? শুধু তোমাদের জন্যই। নিশ্চয়ই ভূগোলে পড়েছ,—ইংরেজ রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না। ঐ যে গড়গড় করে রেলগাড়ি চলছে, ভোঁস ভোঁস করে ইস্টীমার চলে যাচ্ছে;—এগুলিন কার দয়ায় হয়েছে? তা নিশ্চয়ই জান। তোমার আমার সুবিধার জন্য রেলগাড়ি, ইস্টীমার, মোটর, সাইকেল কত কি দিয়েছে ইংরেজ। চোখের পলক পড়তে না পড়তে টরে-টক্কা টরে-টক্কা করে টেলিগ্রামে খবর পৌঁছে যায় ঢাকা কলকাতায়। ঐ যে কলের গান শুনছ। বল দেখি,—কি মজার কল বানিয়েছে ইংরেজ। মানুষের গলা ধরে রেখেছে কলের ভেতর। আজব ব্যাপার। কার মগজ থেকে এসব বেরিয়েছে রে বাবা? বেঁচে থাকলে আরও কত কি দেখতে পাবে। কলকাতায় বসে বিলাতের লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারবে। যত সব তাজ্জব কাণ্ড! কেমন বাবু সেজে লেখাপড়া করছ বাবারা! তার পর কি হবে? বড় বড় চাকরি পাবে। জজ ম্যাজিস্টর হবে; কত আরামে থাকবে তোমরা। যত সব বান্দীর পুতেরা—হারামীর বাচ্ছারা তোমাদের মাথা খাচ্ছে। কি নিয়ে তোমরা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করবে বল? আগে অস্ত্র বের কর, এই রহমান দারোগা সকলের আগে বুক পেতে দেবে। বাপ-বাপ বলে পালাবে ইংরেজ। আগে জবাব দে?

সুলেমান রাজা সমর্থন করে বলে ওঠেন, ঠিক কথা, ঠিক কথা। কি নিয়ে লড়াই করবি বল? হাতা, খুন্তি, কাটারি নিয়ে?

রহমন দারোগা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে হাসলেন। তার পর তিনি বলতে লাগলেন, বন্দুক, কামান, পিস্তল সবই তো ইংরেজের মগজ। সবই ইংরেজের হাতে। রহমন দারোগা কোমরবন্ধের খাপ থেকে পিস্তল বের করে শূন্যে তাক করতে

লাগলেন, তার পর স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ করে আবার স্বরু করলেন, স্কুল ছেড়ে এক পা বাইরে বাড়ায়ো না বাচ্ছারা! খবরদার। ঢাল নাই, তরোয়াল নাই নিধিরাম সর্দার। হঠাৎ টেবিলের উপরে রাখা গ্লোবটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, ঐ যে, ঐ যে, ইংরেজের মগজ দেখেছ? কত বড় দুনিয়াটাকে কেমন ছোট্ট একটা বলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তিনি গ্লোবটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে লাগলেন, কাপড় পুড়াচ্ছে, বিলাতী নুন ফেলে দিচ্ছে। সাবাস! সাবাস! বলি, তোদের বেটাবেটী কি পরে লজ্জা নিবারণ করবে রে ব্যাটারা? তোদের ঐ খদ্দর পরবে? ওটা কি একটা কাপড?—আরে কাপড় নয়, কাপড় নয়, চট, চট, পাটের বস্তা। ছিঃ ছিঃ। বাপের ব্যাটা হোস্ তো লড়াই কর। কামান, বন্দুক নিয়ে এগিয়ে আয়। তা হলে বুঝব বুকেব পাটা আছে। নিজের বুকে দু-এক বার থাপ্পড় বসালেন রহমন দারোগা।

স্বলেমান রাজা হাততালি দিতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাততালির ধুম পড়ে গেল। রহমন দারোগা উত্তেজিত হয়ে মেঝের উপব বারবার পদাঘাত করে বলতে লাগলেন,—আরে মশাইরা! এখন হাততালি দেবার সময় নয়। জীবন-মরণের প্রশ্ন এটা। না, না,—এ হতে পারে না। স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় রাস্তায় হল্লা করবি। গোল্লায় যাবি সব। কই একটা লোকও তো চাকুরি ছাড়ে নি! উকিল আর মোক্তাররা সকলকে নাচাচ্ছে। ওদেরও চাকুরি করতে হয় না। ছেলেদের পেছনে লেগেছে তারা। আমি বলি,—বাবারা! আমার কথা শোন। ঠিক হয়ে এক জায়গায় বসে থাক। কুছ পরোয়া নাই। বলি—স্বাধীন নয় কে রে? আমরা কি বিদেশী? ইংবেজ কি করছে? ইংরেজের কল তো আমরা চালাচ্ছি। কটা ইংরেজ আছে এদেশে? এই রহমন দারোগা মানুষের বান্দা নয়,—ইংরেজের বান্দা নয়। রহমন খোদার বান্দা।

ঘন ঘন হাততালির মধ্যে আর একজন বক্তৃতা দিতে উঠলেন। এমন সময় বাইরে প্রচণ্ড হট্টগোল শোনা গেল,—আল্লাহ্-আকবর, বন্দেমাতরম্। দারুণ হৈ-চৈ। শত শত লোকের উত্তেজিত কলরবে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। কে যেন এসে খবর দিল, শহর থেকে নেতারা এসেছেন। তাঁরা স্বেচ্ছাসেবক-

বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছেন। শহর থেকে নামজাদা নেতা মোহিনী উকিল এসেছেন। আগে তাঁরা স্কুলের ছেলেদের বের করে নেবেন। গোলামখানা ভাঙতে হবে।

মণীশের পাশে বসে সুধীর কাঁপছে। হরেন চুপ করে বসে আছে। নামোয়ার আলি, সুরথ, নাসির কিংবা সন্দীপ কেউ আসে নি। রহমন্ন দারোগা খবর শুনেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। শিক্ষকদের সকলেই যেন কেমন চুপচাপ। সুলেমান রাজা স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফটক বন্ধ করে দিতে বললেন।

সুধীরের হাত ধরে মণীশ কত কি ভাবছে, এখন কি হবে? দেখা গেল— লোকে ছুটাছুটি করছে। তুমুল হট্টগোল। বাজারের দিক থেকে ভীষণ হৈ-চৈ আওয়াজ ভেসে আসছে। গুর্খারা তাড়া করেছে; লাঠি চালিয়েছে পুলিশ।

গনিরাজার উপরই স্কুলের ভার। হেডমাষ্টার অসুস্থ; কয়দিন হয়, তিনি স্কুলে আসছেন না। যতই হৈ-চৈ বাড়ছে, গনিরাজা ততই অস্থির হয়ে উঠছেন। ভীষণ চীৎকার করে ভলান্টিয়ার দল স্কুলের সামনে এল। তাদের নেতাদের দেখা গেল না; তারা চীৎকার করে বলতে লাগল, ভাই সব, বেরিয়ে এস! গোলামখানা ভেঙে ফেল। বন্দেমাতরম্, আল্লাহ্-আকবর!

গুর্খারা এগিয়ে এল; পুলিশ তাড়া করল। আবার তুমুল হট্টগোল সৃষ্টি হল। হঠাৎ স্কুলের ভেতর ছেলেদের মধ্যে কে যেন চীৎকার করে উঠল— বন্দেমাতরম্, আল্লাহ-আকবর। অমনি প্রায় সকল ছেলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি করল—বন্দেমাতরম্, আল্লাহ্-আকবর।

হঠাৎ কোথা থেকে সন্দীপ ছুটে এসে গনিরাজার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল,—সর্বনাশ হয়েছে। বাজারে আগুন লেগেছে। ভলান্টিয়াররা কাপড়ের স্তূপে আগুন দিয়েছিল, সে আগুন কি করে যে সাহাদের দোকানে ছড়িয়ে পড়ল, বলতে পারি না। পুলিশ লাঠি চালিয়েছে। অনেকেরই মাথা ফেটে গেছে।

সন্দীপের মাথা দিয়ে তখন রক্ত ঝরছে; তার জামা রক্তে ভিজে গেছে। সন্দীপ থর থর করে কাঁপতে লাগল। সে বললে—স্কুলের অনেক ছেলে মার খাচ্ছে। আমি আর থাকতে পারলাম না। এঁদের বাঁচান মাষ্টারসাহেব!

সন্দীপকে ধরে গনিরাজা কনকবাবুর দিকে তাকালেন। কে একজন জল নিয়ে এল; পেছনের দরজা দিয়ে স্কুলের দরোয়ানকে হাসপাতালে পাঠালেন গনিরাজা। সন্দীপকে একখানি বেঞ্চিতে শুইয়ে দেওয়া হল। সন্দীপ চোখ বুজে পড়ে রইল। মণীশ তখন ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। সুধীর হঠাৎ বললে,— আমরাও বেরিয়ে পড়ি। মণীশ বললে,—না।

তার পর শোনা গেল,—গুড়ুম গুড়ুম গুম্। বন্দুকের আওয়াজ। গনিরাজা ঘামছেন। বন্দুকের আওয়াজ শুনে আর সন্দীপের অবস্থা দেখে তিনি যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সন্দীপ কেবলই বলছে,—আমি ঠিক আছি মাষ্টার-সাহেব। ওদের বাঁচান।

আবার তুমুল আর্তনাদ আর হট্টগোলের মাঝে শোনা গেল—গুড়ুম গুড়ুম গুম্। গনিরাজা কনকবাবুকে বললেন, আপনি এদের দেখুন, আমি চললাম।

স্কুলের ফটক খুলে গনিরাজা বাজারের দিকে ছুটে চললেন। অনেক ছেলেই তাঁর পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল। মণীশ আর সুধীরও ছুটল তাঁর পেছনে।

তারা এগিয়ে গিয়ে যা দেখলে, তাতে মণীশের চক্ষু স্থির হয়ে গেল। বাজারের এ কি অবস্থা হয়েছে! আগুন জ্বলছে তখনও। ভয়াল নেকড়ের মত দেখাচ্ছে গুর্খাদের। হন্তে কুকুরের মত ছুটোছুটি করছে লালপাগড়ি পুলিশ।

এ কি? সুরথ আর নাসিরের রক্তাক্ত দেহ লুটোচ্ছে এক পাশে।—মণীশের গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে। সে সুধীরকে বলে, পালিয়ে যা। পালিয়ে যা।

গনিরাজা এগিয়ে চললেন। তিনি এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠলেন,—বন্দেমাতরম্। বল ভাই সব—আল্লাহ্-আকবর! বন্দেমাতরম্। মণীশও চীৎকার করে উঠল,—বন্দেমাতরম্। চারদিক থেকে আবার লোক এগিয়ে আসতে লাগল। উৎসাহিত হয়ে উঠল মণীশ; তার মনে হল, সে সত্যিই যেন লড়াই করতে নেমেছে,—স্বদেশী সৈনিক।

আবার তুমুল হৈ-চৈ। গুর্খারা তাড়া করল; লাঠি চালাল পুলিশ। গনিরাজা পড়ে গেলেন। নামোয়ার আলি, হরেন আর প্রবীর এগিয়ে এল; স্কুলের ছেলেরা গনিরাজাকে ঘিরে দাঁড়াল। পুলিশ এবার এলোপাতাড়ি লাঠি চালাতে সুরু

করলে। একের পর এক লুটিয়ে পড়ল মাটিতে আর বাকী সকলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল।

সেই স্বদেশী যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মণীশ তার শম্ভুদাকে খুঁজতে লাগল। এ যে রীতিমত যুদ্ধ! কিন্তু তার সেনাপতি কোথায়? কোথায় শম্ভুনাথ,—কাঞ্চনগড়ের স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সৈনিকেরাই বা কোথায়? আর শহরের সেই নেতা মোহিনী উকিলই বা কোথায়!

কানে ভেসে আসে,—বন্দেমাতরম্ আল্লাহ্-আকবর! শোনা গেল,—শহরের দল চলে গেছে মাঠের দিকে। সেখানে নাকি মিটিং হবে। মোহিনীবাবু এখন বিশ্রাম করছেন। শম্ভুনাথ না কি তাঁকে নিয়ে এখন খুব ব্যস্ত।

সুরথ আর নাসির কখন যে একসঙ্গে মিলিত হয়েছিল, কেউ তা জানে না। মিছিলের সামনে তারা দু জনে ছিল। নিজের হাতে কাপড়ের স্তূপে নাসির আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। সুরথ আর সন্দীপ ছিল তার পাশে। সাহাবাবুদের দোকানে কি করে যে আগুন ধরেছে কেউ তা সঠিক জানে না। দোকানে আগুন লেগেছে দেখেই পুলিশ ক্ষেপে উঠেছিল।

আগুন দেখে ছত্রভঙ্গ হয়ে জনতা কোথায় যে পালিয়েছে তার ঠিক নেই। যারা ছিল, তার মার খেয়েছে। মারমুখী হয়ে পুলিশ লাঠি চালিয়েছে, তবু ছেলেরা পালায় নি। নাসির আর সুরথ নিজেরাই বক্তৃতা দিয়েছে; তারা হাতজোড় করে দোকানীদের বিলাতী কাপড় বয়কট করতে অনুরোধ করতে এগিয়ে যাচ্ছিল, পুলিশ আর গুর্খারা তাদের আটকাতে পারে নি। আবার ভিড় বেড়েছে; গুলি চালিয়েছে পুলিশ! পুলিশের গুলিতে জখম হয়ে লুটিয়ে পড়েছে—সুরথ আর নাসির। সন্দীপ এ সব দেখেই স্কুলে খবর দিতে পালিয়ে গিয়েছিল। সুরথ আর নাসির প্রাণ দিয়েছে। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মণীশ শিউরে উঠল। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সুরথের গাল বেয়ে। নাসিরের বুকে চাপচাপ রক্ত। মণীশ কাঁপতে থাকে।

বাসন্তী দুপুর; ঝর ঝর করে ঝরছে শিমুলফুল। আগুনের হলকা শিথিল করে দিয়েছে ফুলের বোঁটা। মণীশের চোখে পড়ল,—সুজাতা। সুজাতা এগিয়ে

আসছে। এতদিন দূর থেকেই সে সুজাতাকে দেখেছে। বিহ্বল হয়ে আকাশ-পাতাল ভাবে মণীশ। সুজাতা ছুটে আসছে। ছিপছিপে পাতলা গড়ন; তার এলোমেলো কটা চুল বাতাসে উড়ছে; চোখে যেন তার আগুন জ্বলছে। তারই পাশ দিয়ে সুজাতা ঝড়ের মত ছুটে চলেছে। সুজাতা এগিয়ে যাচ্ছে—সুরথের দিকে।

পুলিশ বাধা দেয় না। গুর্খারা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অব্যক্ত ব্যাকুল ধ্বনি সুজাতার কণ্ঠে। হায় হায় করে যেন ঝরে পড়ছে শিমূলফুল নাসির আর সুরথের রক্তাক্ত নিষ্প্রাণ দেহের উপর। কিশোরী সুজাতার সে ছবি,—নাসির আর সুরথের এই করুণ আত্মবলি মণীশকে উতলা করে দেয়।

মণীশ এগিয়ে যেতে চায়, কিন্তু পারে না। তার পা যেন নিশ্চল হয়ে গেছে। রহমন দারোগাকে এতক্ষণ দেখতে পায় নি মণীশ। হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে এদিকে ছুটে এলেন তিনি। তিনিও সুরথ আর নাসিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। সুজাতাকে দেখতে পেয়ে রহমান দারোগা চীৎকার করে উঠলেন, হেই বেটী, খবরদার। চীৎকার করে বললেন বটে, কিন্তু সে চীৎকার করুণ আর্তনাদের মতই শোনাল। সুজাতা এগিয়ে গিয়ে থর থর করে কাঁপছে। রহমান দারোগা মণীশের দিকে ফিরে বললেন,—হেই বেটা! ধর, ধর, আমার বেটীকে ধর।

মণীশ এগিয়ে যাবার আগেই সুজাতা চীৎকার করে পড়ে গেল। রহমন দারোগার ইঙ্গিতে মণীশও মাটির উপর বসে পড়ল। তার পর ধীরে ধীরে সুজাতার মাথাটা মণীশের কোলের উপর তুলে দিয়ে, রহমন দারোগা একজন কনস্টেবলকে হেঁকে বললেন, হরদয়াল সিং, জলদি জল লে আও।

মণীশ বিহ্বলের মত সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে যে কি করবে ভেবেই পায় না, ধীরে ধীরে সুজাতার কপালে হাত বুলোতে লাগল। সংকোচ তার কখন যে কেটে গিয়েছে, সে বুঝতে পারে নি। আরও দু-চার জন তখন এদিকে ছুটে এল। পুলিশ এবার ক্ষান্ত হয়েছে; গুর্খারা ঘিরে রয়েছে জায়গাটা। সুজাতার চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দেওয়া হল।

আবার কিন্তু হৈ-চৈ শোনা যেতে লাগল। পিঁপড়ের মত সারি বেঁধে

পাহাড়ীরা আসছে। কাতারে কাতারে পাহাড়ী ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ী সকলে এগিয়ে আসছে। কি জানি তারা কি করে? সকলেরই ভয় হতে লাগল।

সুরথ আর নাসিরের খবর ততক্ষণে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বাইরের কাউকে আর এখানে পুলিশ ঢুকতে দিচ্ছে না। পাহাড়ীদের হৈ-চৈ শোনা যাচ্ছে। পুলিশ অনেক লোককে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে। গন্নিরাজাও আটক হয়েছেন। পাহাড়ীদের হল্লা শুনে রহমন দারোগা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে তাদের কি যে বললেন বোঝা গেল না। তার পর তিনি ফিরে এসে নাসির আর সুরথের নিষ্প্রাণ দেহের দিকে তাকিয়ে বুকে কয়েকবার জোর চাপড় মেরে বললেন,—"ইয়া আল্লা!" তার পর বিড়বিড় করে কি যে বললেন বোঝা গেল না।

দেখা গেল শহর থেকে পুলিশ সাহেব মিঃ সিমসনও এসেছেন। তিনিও এলেন এই মর্মান্তিক দৃশ্যপটের মাঝে। পুলিশ সাহেবকেও বিশেষ বিচলিত বলে মনে হল। তিনি সান্ত্বনার কথা শোনাতে এলেন রহমন সাহেবকে। রহমন দারোগা তাঁর হাতে চাপরাশ খুলে দিয়ে সেলাম ঠুকে বললেন,—এই নাও সাহেব, তোমার চাপরাশ। ছেলে আমার চোখ খুলে দিয়ে গেল। মনে রেখো,—রহমন দারোগা খোদার বান্দা,—মানুষের বান্দা নয়।

হতভম্ব পুলিশ সাহেবকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই নাসির আর সুরথের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন রহমন দারোগা। দুই বগলে দুইজনের দেহ নিয়ে উন্মাদ উচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন—আল্লাহ্-আকবর! বন্দেমাতরম্।

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে শত শত কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হল—আল্লাহ্-আকবর, বন্দেমাতরম্।—মিঃ সিমসনও চোখের জল মুছেছিলেন এ দৃশ্য দেখে।

ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হল সেদিন থেকে। মণীশের জীবনেও তা নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করল। কিশোর-জীবনের স্বপ্নছবি! সন্ধ্যা তার সংকোচ অনেকটা ভেঙে দিলেও সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে মিশতে তার বাধত। সুজাতা সোনার কাঠির স্পর্শে যেন মণীশের স্বপ্নলোকে এক মায়াজাল সৃষ্টি করল।

সম্পূর্ণ অজানা মেয়ে সুজাতা ; চেনা-জানা সকল কিশোরীকেই মুছে দিল মণীশের মন থেকে।

সুজাতা আর মণীশের মাঝে যে ব্যবধান ছিল, তা ঘুচে গেল। সুজাতার মধ্যে কোন সংকোচ নেই ; সরল, সুন্দর তার কথাবার্তা তার আচার-আচরণ। মণীশের চোখে তা,সম্পূর্ণ নূতন। সর্বেশ্বর মাষ্টারের পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। সর্বেশ্বর মাষ্টারকে মণীশ শ্রদ্ধাই করে ; কিন্তু এ শ্রদ্ধার সঙ্গে ভয়ও মিশ্রিত ছিল।

সর্বেশ্বর মাষ্টারের পরিবারের কোঠা প্রায় শূন্যই ছিল। সুরথ, সুজাতা আর আধাবুড়ী এক আয়া বাতাসীমনিকে নিয়েই তাঁর সংসার। সুরথ নেই ; সুরথের অভাব ঘোচাল মণীশ। উদ্‌গত যৌবনের স্বপ্ন—মণীশ নিজের মনের সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারে না।

মণীশ যতই এদের সঙ্গে মেশে ততই বিস্মিত হয়। পাহাড়ী ছেলেমেয়েরাই সুজাতার খেলার সঙ্গী। তাদের.সঙ্গেই সে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। এখন মণীশকে নিযেও টানাটানি করে। সুজাতার কটা চুল, পিঙ্গল চোখ, এমন কি গায়ের রঙটাও যেন কেমন ঠেকে। লোকে বলে, সাহেবের মেয়ে বাঙালীর ঘরে এসে বাঙ্গালী বনে গেছে।

সুজাতা আব্‌দার করে—চল মণীশদা। আজ ওই পোড়ারাজার টিলাটা দেখে আসি।

পোড়ারাজার টিলার কথা শুনে মণীশ আঁত্‌কে উঠে। ঘোর জঙ্গলের মাঝে পোড়ারাজার টিলা। কোন্ কালে নাকি কোন্ এক রাজার বাড়ি ছিল এই টিলায়। এখনও জঙ্গলে-ঘেরা বাড়ির কিছু কিছু দেখা যায়। বাঘ-ভালুকের আড্ডা ! এখানে কি মানুষ যেতে পারে ?

সুজাতা বলে,—যাবে তো ?

মণীশ বলে,—ওখানে তো বাঘভালুক থাকে।

সুজাতা হো-হো করে হেসে বলে, বাঘভালুক ? বেশ তো বাবার বন্দুকটা নিয়ে যাব। তুমি ছুঁড়তে পারবে না ?

বন্দুক দূর থেকে মণীশ এতদিন দেখেই এসেছে। কোনদিন বন্দুক হাতে নেবার সৌভাগ্যও তার হয় নি। কৌতূহল আছে বটে, কিন্তু বন্দুক নিয়ে নাড়াচাড়া করবে একথা ভাবতেও মণীশের মনে শঙ্কা জাগে, কি জানি যদি গুলি বেরিয়ে পড়ে। সুজাতার কথায় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মণীশ উত্তর দেয়,—না। আমি বন্দুক ছুঁড়তে জানি না।

সুজাতা হাসিমুখে উত্তর দেয়,—বেশ আমি শিখিয়ে দেবো।

মণীশ বিস্মিত হয়ে বলে,—তুমি? তুমি বন্দুক ছুঁড়তে জান?

সুজাতা বলে,—হ্যাঁ জানি। বাবা শিখিয়ে দিয়েছে। সবই শিখে রাখতে হয় মণীশদা! কখন কাজে লাগে, কে জানে?

মণীশ মনে মনে ভাবে,—কাজে লাগবে? না, না, গুলি ছুঁড়ে সে মানুষ মারতে পারবে না কোনদিন।

সুজাতা তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে ওঠে,—চুপ করে রইলে যে! আমি তোমায় শিখিয়ে দেব। আর বাঘ-ভালুকেই বা এত ভয় কেন?

মণীশ উত্তর দেয়,—বাঘ-ভালুককে কে না ভয় করে? আর মিছামিছি ওদের ঘাঁটাতেই বা যাব কেন?

সুজাতার মুখে উচ্ছল হাসি। সে বলে,—তাদের ঘাঁটতে যাচ্ছে কে? আমরা যাব পোড়ারাজার বাড়ি দেখতে। যদি বাঘ-ভালুক তাড়া করে, তা হলে আমরাই তাদের তাড়িয়ে দেব।

মণীশ বলে,—পোড়ারাজার বাড়ি দেখে কি হবে? ওখানে ঘোর জঙ্গল; আর দেখবারই বা কি আছে?

সুজাতা বলে,—কি বলছ, দেখবার কি কিছুই নেই? কত গল্প শুনি; পোড়ারাজা আগুনে পুড়ে মরেছে; এখনও নাকি মাঝে মাঝে ধোঁয়া ওড়ে ওখানটায়। এর রহস্যটা জানতে হবে।

মণীশ বলে,—হ্যাঁ, অনেক কিছু শুনেছি বটে। কিন্তু দেখে কি করবে বল?

সুজাতা বলে,—হিমালয়ের উপরে বারবার উঠতে চেষ্টা করছে কেন? কতজন মরে গেল। তবু সেই নিঃসীম শূন্য দেখার লোভ কেন মানুষের বলতে পার?

এটা তো হিমালয় নয়, দুর্গম জায়গাও নয়; বাড়ির কাছে এমন জায়গা রয়েছে, আর দেখতে যাব না!

মণীশ বললে,—বেশ যাব। কিন্তু আর কে যাবে?

সুজাতা কৌতুকের হাসি হেসে বলে,—কেন? তুমি আর আমি। ভয় পাচ্ছ?

মণীশ সংকোচের সঙ্গে উত্তর দেয়,—তাই হবে। কিন্তু পাহাড়ী সর্দারদের সঙ্গে নিয়ে গেলে হত। ওরা পথ-ঘাট জানে।

সুজাতা বলে,—ঠিক কথা। আমাদের সঙ্গে যাবে পরাণ মাঝির ছেলে বঙ্কু মাঝি। একটু পরেই আমরা যাচ্ছি। তুমি দাঁড়াও, বঙ্কুকে আমি ডেকে নিয়ে আসি।

সুজাতা ছুটে চলে যায়। হরিণীর মত লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আপন মনে গুন্ গুন্ সুরে গান গেয়ে বেড়ায় সুজাতা। মণীশ নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। সুজাতা তার কাছে অভিনব,—সন্ধ্যা, সুনন্দা, সুরুচি কিংবা নন্দার সঙ্গে যেন তার জাতের তফাৎ আছে।

দূরে দেখা যায় পোড়ারাজার টিলা। গাছের আড়ালে পাথরের ঢিবির মত কতকটা দেখা যায়। ছোটবেলা থেকে পোড়ারাজার কথা অনেক শুনেছে। আগুনে পুড়ে মরেছিল বলেই সেই রাজার নাম হয়েছে পোড়ারাজা। তার আঁসল নামটা কেউ জানে না। আর সে আগুন উঠেছিল পাতাল থেকে। পাতালের আগুনে রাজা, রাজপাট, রাজপুরী সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, শুধু রয়েছে তার ধ্বংসাবশেষ; আগুন যা দগ্ধ করতে পারে নি,—ধ্বসে যাওয়া পাথরের বাড়ির স্তূপ তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

হ্যাঁ, পুড়ে মরেছিল সে রাজা। বড় রাজাই ছিল সে। কিন্তু রাজার মতিভ্রম হয়েছিল শেষকালে। তাই অমন সোনারপুরী ধ্বংস হয়ে গেল; শ্মশান হয়ে গেল রাজ্যপাট, সবংশে পুড়ে ম'ল রাজা।

•

কতদিন পিসীমার কাছে গল্প শুনেছে, তবুও পোড়ারাজার গল্প শুনতে মণীশের

ভাল লাগে। ভাল লাগে রাজকন্যা কলাবতীর কথা। রাজার একমাত্র কন্যা কলাবতী। আর কোন ছেলে নেই; আর কোন মেয়ে নেই। দেবী ভুবনেশ্বরীর যজ্ঞ করে রাজা কলাবতীকে পেয়েছিলেন। কলাবতীর জন্মদিনে মহোৎসব হয়েছিল; বন্দীরা মুক্তি পেয়েছিল; পাহাড়ী সর্দাররা ছয় দিন পাহাড়ে পাহাড়ে দিন-রাত উৎসব লাগিয়েছিল। দিনে দিনে কলাবতী বাড়তে লাগল। অপুত্রক রাজা কলাবতীকে পুত্রের মতই শিক্ষা-দীক্ষা দিতে লাগলেন। কলাবতী অস্ত্রচালনা, মল্লবিদ্যা, অশ্বারোহণ সবই শিখতে লাগল। একা একা পাহাড়ের কোল বেয়ে ঘুরে বেড়াত কলাবতী।

কিন্তু এই পুরুষোচিত শিক্ষায় কলাবতীর তৃপ্তি হয় নি। কি যেন একটা অভাব-বোধ জেগেছিল কলাবতীর মনে। রাজপুরীর দেব-দেউলে বাস করত ইন্দ্রাণী,—দেবদাসী। ইন্দ্রাণীর মন্দিরে যাতায়াত করত কলাবতী; ইন্দ্রাণীই দিয়েছিল তাকে নূতন আলোক,—নূতন এক প্রেরণায় কলাবতী কলায় কলায় পূর্ণ হতে লাগল। গোপনে দেব-মন্দিরে নৃত্যপটিয়সী হয়ে উঠল কলাবতী। নিষ্প্রাণ পাষাণমূর্তি বংশীধারী কৃষ্ণ যেন কেঁপে কেঁপে উঠতেন কলাবতীর নৃত্যের তালে তালে; পাষাণ-ময় বাঁশিটায়ও যেন সুর ফুটে উঠত। আপনাকে হারিয়ে ফেলত কলাবতী। ইন্দ্রাণী আর কলাবতী ছাড়া আর রাজপুরীর কেউ এ খবর রাখত না। এমনই গোপনে চলত সে নিশীথ অভিসার।

কলাবতীর নৃত্যচ্ছন্দ কিন্তু আরেক জনের মনেও দোলা দিয়েছিল। সে পাষাণমূর্তি বংশীধারী কৃষ্ণ নয়, সে ছিল রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ,—কলাবতীরই সমবয়সী। গোত্রহীন পরিচয়হীন এক যুবক রাজপুরীরই আশে-পাশে বাঁশি বাজিয়ে বেড়াত; দেব-দেউলে পড়ে থাকত সে। সুঠাম গড়নেও যাযাবর জীবনের ক্লিষ্টতা ফুটে উঠেছে; উদ্ভিন্ন যৌবনের লাবণি তবুও ঢাকতে পারে নি। সকলেই দেখেছে তাকে; সকলেই বলে,—পাগল! উদাসী হয়ে বেরিয়েছে। পল্লীবাসীরা ডেকে নিয়ে খেতে দেয়; জীর্ণবাসের বদলে কোথাও বা পায়—পরিচ্ছন্ন বাস; কিন্তু তার দিকে খেয়াল নেই। নাম বলে—শান্তশীল।

ইন্দ্রাণী প্রৌঢ়া; ইন্দ্রাণীর ইতিহাসও রহস্যাবৃত। কোথা থেকে যে এ দেব-

মন্দিরে এসেছে ইন্দ্রাণী, এ কথা বড় কেউ জানে না। হয়তো রাজাই জানেন। মৃগয়া করতে বেরিয়েছিলেন রাজা; তখন রাজা যুবক; তাঁরই সঙ্গে এসেছিল ইন্দ্রাণী। রাজাও নাকি তাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।

কিন্তু ইন্দ্রাণী জানে; সে ছিল এক গৃহবধূ। নিজের সন্তানকে ত্যাগ করে এসেছে সে। ইন্দ্রাণীর স্বামী ছিল বংশীবাদক আর নৃত্য শিক্ষক। তাঁরই কাছে নাচ শিখেছিল ইন্দ্রাণী; সেও অতি গোপনে। বংশীবাদক গভীর নিশীথে ক্লান্তি অপনোদন করতে বাঁশি বাজাত আর তাঁরই সামনে নাচত উদ্গত-যৌবনা ইন্দ্রাণী। কিন্তু মতিভ্রম হল। বংশীবাদক স্বামীর শিষ্যের সঙ্গে পালিয়ে গেল ইন্দ্রাণী।

সেই শিষ্যও ইন্দ্রাণীকে পরিত্যাগ করেছিল; গভীর জঙ্গলে সিদ্ধিনাথের মন্দিরে ইন্দ্রাণীকে পেয়েছিলেন রাজা। ইন্দ্রাণী সেই থেকে রাজার আশ্রয়ে অ.ছে। ইন্দ্রাণী এখানে দেবদাসী। শান্তশীলকে দেখা অবধি ইন্দ্রাণী কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। শান্তশীলের মুখে ইন্দ্রাণী দেখতে পেয়েছিল ছেড়ে-আসা প্রায়—ভুলে-যাওয়া স্বামী বংশীবাদকের আভা। বুকের ভেতরটা ইন্দ্রাণীর কেমন যেন বেদনায় ভরে উঠেছিল; ছেড়ে-আসা সেই একবছরের খোকা যেন তার বুকে জড়িয়ে রয়েছে। নিজের বুকে হাত বুলিয়ে দেখত ইন্দ্রাণী; না শুকিয়ে গেছে; শিথিল হয়ে গেছে নারীর গর্ব সে কুচযুগল। বুকটা ঘেমে ওঠে; ইন্দ্রাণী বুকের ঘাম হাতে মোছে। নাঃ সেই আত্মভোলা বংশীবাদক কোথায় আর সেই শিশুই বা কোথায়?

একদৃষ্টে শান্তশীলের দিকে তাকিয়ে থাকে ইন্দ্রাণী। শান্তশীল দেবালয়ের বারান্দার এককোণে রাত কাটায়। মাঝে মাঝে নিভৃত রাতে ইন্দ্রাণী এসে বসে তার শিয়রে। অস্ফুটস্বরে ডাকে, খোকা! শান্তশীল হয়ত স্বপ্নঘোরে সাড়া দেয়। বিচিত্র এ খেলা!

তার পর এল কলাবতীর পালা। কলাবতী শান্তশীলকে দেখে নি। শান্তশীল দেখে কলাবতী ইন্দ্রাণীর সঙ্গে মন্দিরে ঢোকে; কান পেতে থাকে সে। তার পর বাঁশিতে সুর দেয়, বংশীধারী পাষাণ বংশীবদনের পাথরের বাঁশিতে সুর জেগেছে ভাবে কলাবতী। তারা দু জনে কেউ শান্তশীলের এ গোপন বাঁশির কথা জানে না.

ক্লান্তি আসে, রাত গভীর হয়; এলিয়ে পড়ে শান্তশীল। কলাবতীর নূপুরের ধ্বনি থামার সঙ্গে সঙ্গে শান্তশীলের বাঁশীও থেমে যায়। আড়ালে প্রতীক্ষা করে শান্তশীল। শুধু দেখা, একবার শুধু দেখা। জোছনার ধারা পড়বে কলাবতীর চোখে-মুখে। মৃদু হিল্লোলে এলায়িত কেশবাস দুলে উঠবে। হেম-গৌরাঙ্গী শ্রীরাধামূর্তি দেখে সার্থক করবে তার হৃদয়-মন।

সময় আর কাটে না। কি হল মন্দিরের ভেতর। ইন্দ্রাণী আর কলাবতী বেরিয়ে আসে না। ক্লান্তির অবসাদে ঝিমিয়ে পড়ে শান্তশীল। এদিকে নৃত্য-বিভোলা কলাবতী চলে গেছে কোন্ এক স্বপ্নরাজ্যে;—মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের পাষাণ-মূর্তির মুখে সে হাসি দেখতে পেয়েছে: তারই আবেশে তার হৃদয়-মন ভরপুর। আত্মসমর্পণের নৃত্য,—নিজের ফুটন্ত দেহকুসুমের ডালি নৃত্যের ছন্দে ছন্দে পুলকে উথলে উঠছে; উন্নত কুচযুগলের অগ্রভাগে সোনালী উদিত সূর্যের রক্তিম আভা, কটি থেকে জঙ্ঘাদেশ পর্যন্ত শিহরণ-লহরী যেন মৃদুমন্দ উচ্ছ্বাসে তোলপাড় করছে। পাষাণমূর্তিও যেন আকুল হয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে আহ্বান জানাচ্ছে। এগিয়ে যায় কলাবতী, আবার পিছিয়ে আসে। তার পর আসে বিহ্বলতা, আসে ক্লান্তি, দেবতা বুঝি পাষাণ, পাষাণে সাড়া মেলে না। কলাবতী সম্বিৎ হারায়, চেতনা হারায়। ইন্দ্রাণী জাগে তার শিয়রে।

এমনি চলে রাতের পর রাত, শান্তশীল আড়ালে থেকে বাঁশি বাজায়। ইন্দ্রাণীর মনেও সংশয় জাগে। পাষাণ-দেবতার বাঁশিতে সুর! একদিন কলাবতীকে বিদায় দিয়ে ফেরবার পথে ইন্দ্রাণীর লক্ষ্য পড়ে শিউলি-তলায়, কে যেন পড়ে রয়েছে এখানে? এগিয়ে যায় ইন্দ্রাণী; এ যে শান্তশীল। মুখের বাঁশি এক হাতে বুকে চেপে ধরেছে, দু চোখে বইছে ধারা; চাঁদের জোছনায় তার শ্যামল মুখশ্রীর অপরূপ আভার মাঝেও ক্লান্তির ছায়া দেখা যাচ্ছে। ইন্দ্রাণী স্থির থাকতে পারলে না; কোলে তুলে নিল শান্তশীলের মাথা। ধীরে ধীরে তার চুলে আঙুল চালাতে লাগল। শান্তশীল যেন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছে, মাঝে মাঝে তার অধরোষ্ঠে দেখা দেয় হাসির রেখা; কখনও বা অস্ফুট গুঞ্জন—তুমি? তুমি? রাজকুমারী?

ইন্দ্রাণীর হৃদয় গুমরে ওঠে। তার মনে হয়,—শান্তশীল তারই ফেলে-আসা

হারানো শিশু। হ্যাঁ, এই তো তার কানের পাশে লাল জড়ুল। ইন্দ্রাণীর চোখের ধারা ঝরে পড়ে শান্তশীলের মুখে-চোখে। শান্তশীলের স্বপ্ন ভেঙে যায়; চোখ খুলে দেখে ইন্দ্রাণীর মুখ। সংকোচে আড়ষ্ট হয়ে যায় শান্তশীল। তবু করুণ অস্ফুট স্বরে ডাকে—মা। ইন্দ্রাণী বুকে চেপে ধরে শান্তশীলের মুখ। শান্তশীল চুপ করে থাকে। এমনি অনেকক্ষণ কেটে যায়। তার পর ওঠে ইন্দ্রাণী। শান্তশীলকে সে মৃদুকণ্ঠে সান্ত্বনা দেয়, সতর্ক করে দেয়।

শান্তশীল ইন্দ্রাণীর মাঝে যেন তার অবুঝ শৈশবের স্বপ্নঘেরা মাকে খুঁজে পায়। তবুও দু জনের মাঝে থাকে অপরিচয়ের ব্যবধান; ইন্দ্রাণী সে ব্যবধান ঘোচায় না। তার মনে প্রশ্ন জাগে,—কি করে ছন্নছাড়া হল এ শান্তশীল! কোথায় তার সেই বংশীবাদক আত্মভোলা পিতা? প্রশ্নের পর প্রশ্ন তার মনে ঢেউ খেলে আঘাত দেয়; বুকের পাঁজরগুলো যেন চুরমার হয়ে যায়, তবু চুপ করে থাকে ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণী ভাবে আসন্ন বিপদের কথা,—শান্তশীলের সুখ-স্বপ্নের বাতুলতা তার মনে শঙ্কা জাগায়। দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা। আর রাজকুমারী কলাবতী?—

ভাবতে পারে না ইন্দ্রাণী। চিন্তার কালিমা ফুটে ওঠে তার চোখে-মুখে। শঙ্কা জাগে ইন্দ্রাণীর মনে। দিনে দিনে শুকিয়ে যায় ইন্দ্রাণী। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না ইন্দ্রাণী। মন্দিরে একাই যায় কলাবতী। নৃত্য তার চলে গোপনে রাতের পর রাত। আড়ালে বাঁশিতে সুর দেয় শান্তশীল। রুগ্নশয্যায় ইন্দ্রাণী ছটফট করে, হঠাৎ যেন তার বুকের স্পন্দন থেমে যায়।

কলাবতী মন্দিরে নৃত্যরতা; ষোলকলায় পূর্ণ ষোড়শীর পূর্ণ দেহে দয়িতের নিকট আত্মনিবেদন,—নূপুরের শিঞ্জন নেই; দেহের প্রতিটি লোমকূপে সুরলয়-তালের বিভোল ছন্দ। কলাবতী দেখে তার সামনে শুদ্ধ মুরলীধরের মূর্তি; সে মূর্তির পাশে রাধা নেই। সাড়া দেয় না পাষাণ-দেবতা। তবুও তার বিরাম নেই; অপরূপ সে আকুল নৃত্য। অলক্ষ্যে প্রবেশ করেছে শান্তশীল; মুখে তার বাঁশি অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে ছন্দায়িত দেহের দিকে; হঠাৎ কলাবতী থমকে দাঁড়ায়। বাঁশির সুর তার কানে গেছে। সত্যই কি মুরলীধর মূর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে তার সমুখে।

শান্তশীলের বাঁশি হাত থেকে খসে পড়ে; এগিয়ে যায় কলাবতী। সার্থক হয়েছে তার আত্মসমর্পণ।—কতক্ষণ যে কেটে গেল—এরা দু জনে বুঝতে পারে না—স্বপ্নঘোরে বিহ্বল হয়ে থাকে দু জনে। তার পর সচকিত হয়ে উঠে শান্তশীল, চেতনা পেয়ে জেগে ওঠে কলাবতী। এমনি কাটে রাতের পর রাত।

কলাবতীর এ গোপন অভিসারের কথা একদিন রাজার কানে উঠল। গুপ্তচর সংবাদ এনেছে—শান্তশীল আর কলাবতীর স্বপ্নলোক বুঝি এবার ভাঙবে। ক্রুদ্ধ হলেন রাজা; দেবতার মন্দির অপবিত্র হয়েছে, অশুচি হয়েছে দেব-দেউল। ইন্দ্রাণীরই ষড়যন্ত্র। পথের কুকুরীকে আশ্রয় দেওয়ার এই পরিণাম!—গোপনে রাজার আদেশ পৌঁছাল ঘাতকের কানে—ধ্বংস করতে হবে দেবমন্দির—দেব-দেউলে আগুন দিতে হবে। ভস্ম হবে ইন্দ্রাণী, ভস্ম হবে কলাবতী আর শান্তশীল। দেবতার কোপে ক্ষমা নেই। কন্যা বলেও ক্ষমা করবেন না রাজা।

কলাবতী জানতে পায় না; জানতে পায় না ইন্দ্রাণী। নিশীথ রাত্রে দেবমন্দিরে চলে নৃত্য। কলাবতী নৃত্য করে, বাঁশি বাজায় শান্তশীল। ইন্দ্রাণী শঙ্কাভরে প্রহর গোণে। অকস্মাৎ জ্বলে উঠে আগুন, আগুনের জিব লক লক করে ওঠে আকাশ-পানে। বিভোলা কলাবতী মূর্ছিতা হয়ে পড়ে আত্মসমর্পণের উন্মাদনায়। তার শিরায়-উপশিরায় উত্তপ্ত তরঙ্গলহরী মিশে যায় সর্বভুকের আলিঙ্গনে। শান্তশীলের বুকে কলাবতী,—কেউ দেখে না; দেখে শুধু পাষাণ-মূর্তি মুরলীধর।

সেই গভীর নিশীথে হঠাৎ কেঁপে ওঠে রাজপুরী; সশঙ্ক নরনারীর করুণ আর্তনাদে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে ওঠে। ভূমিকম্প,—ভূমিকম্প,—পৃথিবী কাঁপছে। মন্দিরের ভেতর থেকে জলোচ্ছ্বাসের মত বেরিয়ে আসে সোনালী স্রোত। তার পর সবই অন্ধকার; ধোঁয়ায় ধোঁয়াময়। পাতাল ফুঁড়ে উঠেছে আগুন। রাজপুরী চুরমার হয়ে যায়। তিনদিন ধিকি ধিকি কেঁপেছে বসুমতী—তিনদিন তিন-ক্রোশের মধ্যে জনমানব এগিয়ে যায় নি। তার পর শান্ত হয়েছে বসুমতী; এখনও সে ধোঁয়া দেখা যায় মাঝে মাঝে; এখনও মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে বসুমতী। কলাবতীর নূপুর-ধ্বনি আর শান্তশীলের বাঁশির আওয়াজ এখনও কেউ কেউ শুনতে পায় সে ঘোর বনে। ইন্দ্রাণীর আর্তনাদও না কি শুনতে পায় কেউ কেউ।

কাহিনীটা মনে পড়তেই চমকে ওঠে মণীশ। মনে মনে ভাবে, এমনটা কি সত্যি ঘটেছিল? যত সব আজগুবি গল্প। কৌতূহল জাগে মনে। দেখেই আসবে সে জায়গাটা। যদি নূপুরের ধ্বনি কিংবা বাঁশির আওয়াজ যদি শোনা যায়! —বুকটা গুর্ গুর্ করে ওঠে। সুজাতার মুখখানা উঁকিঝুঁকি মারে মনের পটে। কি চঞ্চল এই মেয়েটা! কি দুঃসাহস তার? আর সর্বেশ্বর? সর্বেশ্বরকে যতই দেখে ততই মনে হয় সত্যই রহস্যময় এই সর্বেশ্বর। সুরথের শোকে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতেও তাঁকে দেখে নি; শুধু একটুখানি গম্ভীর হয়ে উঠেছেন তিনি। মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে পড়েন; শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ঘন্টার পর ঘণ্টা।

বিশ্রাম করছে মণীশ। রাত হয়েছে; সামনে খোলা রয়েছে একখানি বই, পিসীমা এমন সময় ঘরে ঢুকলেন। মণীশ বললে—কিছু বলবে পিসীমা?

পিসীমা অনুযোগের সুরে বলেন,—পড়াশোনায় অবহেলা করিস না বাবা! শুধু কাঞ্চনগড় আর কাঞ্চনগড়। রাত এক পহর না হলে তো বাড়ি ফিরিস না। শুনছি নাকি সেই খ্রীষ্টান মাষ্টারটার ওখানে দিন কাটাস।

মণীশ উত্তর দেয়,—পড়াশোনা ঠিকই করছি পিসীমা। আর এখন দিনকতক স্কুলেও ঠিক পড়াশোনা হচ্ছে না। যা হুজুগ লেগেছে, বুঝেছ তো?

পিসীমা বলেন,—ওরা আবার ইংরেজ তাড়াবেন? দেখিস তুই, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে? কই কোথাও তো তোদের স্বদেশী কাপড় দেখতে পাই না। খদ্দর খদ্দর করছিস সেই খদ্দরই বা কোথা?

মণীশ বলে,—শীগগির আসবে পিসীমা। খদ্দর তো আর কলে তৈরী হয় না। নিজের হাতে সুতো কেটে নিজেই কাপড় বানাতে হবে।

পিসীমা বলেন,—তা হলেই হয়েছে। দু গাছি পৈতের সুতো কাটতে তিন দিন লেগে যায়। তার উপর কাপড়ের জন্য সুতো কাটবে? তা কি হয় রে পাগলা?

মণীশ হেসে হেসে উত্তর দেয়,—কেন হবে না পিসীমা? ধর এক শ বছর

আগে কি তোমরা কলের কাপড় পরতে? ইংরেজ আসবার আগে কি এদেশের লোক কাপড় পরত না?

পিসীমা উত্তর দেন,—কেন পরবে না বাছা! সুতো কাটত তাঁতিরা, যোগীরা আর জোলারা। তারাই কাপড় বুনত। এখনও তারা কলের সুতো-এনে কাপড় বোনে। সে কাপড় পরা যায় না।

মণীশ বললে,—দেখবে পিসীমা! আবার সে কাপড় তৈরী হবে; দেশের লোক নিজের কাপড় নিজেই বুনবে।

পিসীমা বিস্ময়ের স্বরে বলেন,—এত চরকাই বা পাবে কোথায়, আর বুনবেই বা কে?

মণীশ বলে,—চরকা আসবে শীগগির পিসীমা। দেশের নেতারা তৎপর হয়ে উঠেছেন। গাঁয়ে গাঁয়ে চরকা পাঠাবেন তাঁরা। গাঁয়ে কত লোক আছে। মিছামিছি বসে বসে গল্প-গুজবে সময় কাটায়, তাদের দিয়েই সুতো কাটানো হবে।

পিসীমা বলেন,—কেন তারা সুতো কাটতে যাবে মণীশ?

মণীশ বলে,—পয়সা পাবে। তার বদলে পয়সা পাবে পিসীমা। ঘরে বসে পয়সা পেলে কে না কাজ করবে? হাতে কাটা সুতোয় কি ধবধবে কাপড় হয় পিসীমা! তুমি যদি দেখতে। সর্বেশ্বর মাষ্টারের ওখানে পাহাড়ীরা সুতো কাটছে, কাপড় বুনছে, কি সুন্দর সে কাপড়।

পিসীমা বলেন,—হ্যাঁ, হাতে কাটা সুতোর কাপড় ধব্ধবে হবেই। পৈতের সুতো তো দেখেছি।

মণীশ বলে,—তা হলেই বুঝে দেখো পিসীমা।

পিসীমা বলেন,—সবই বুঝি বাবা। বুঝলাম তোরা না হয় হাতে কাটা সুতোর কাপড় পরলি। কিন্তু টাকা রোজগারের পথ তো চাই বাবা! লেখাপড়া না শিখলে চাকরি পারে না। তোমরা যা করছ, সরকারী খাতায় এতদিনে নাম উঠে যেত, শুনছি কৃষ্ণপ্রসাদবাবু নাকি বারণ করে দিয়েছেন, তাই রক্ষে।

মণীশ হেসে উত্তর দিল,—নাম যদি ওঠবার হয় তো কৃষ্ণপ্রসাদবাবু বারণ

করলেই তো বন্ধ হবে না পিসীমা। আমরা এমন কিছুই করছি না, যার জন্য সরকারের খাতায় আমার নাম উঠবে।

পিসীমা বলেন,—সেদিন প্রসন্নদাও বলছিলেন, খ্রীষ্টান মাষ্টারটার সঙ্গে মেশামেশিও ভাল নয়। ওঁরা এক জাত আর আমরা এক জাত। ওঁদের ধর্ম-কর্ম সবই আলাদা। ওঁদেব মেয়ে পুরুষে কোন তফাৎ নেই। লজ্জাশরমও নেই মেয়েদের; ধিঙ্গির মত ঘুরে বেড়ায়।

মণীশ বলে,—তোমার কোন ভয় নেই পিসীমা। সেখানে খ্রীষ্টান কোন মেয়েছেলে নেই।

পিসীমা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন,—নেই? তা হলে যে শুনি।

মণীশ বাধা দিয়ে বলে,—কি শুনেছ পিসীমা?

পিসীমা বলেন,—ইংরেজের টোপ। ওঁরা খ্রীষ্টান মেয়েদের দিয়ে আমাদের খ্রীষ্টান বানিয়ে নিতে চায়। তা হলেই তাদের স্বার্থ রক্ষা হয়।

মণীশ হো-হো করে হেসে বলে,—যে তোমাকে এ কথা বলেছে, সে ঠিকই বলেছে পিসীমা! সবাই যদি খ্রীষ্টান হয়ে যায়, ইংরেজের জাত-ভাই হয়ে যাবে তারা। নিশ্চিন্ত হবে ইংরেজ। তা হলে তো আর চাকবি পেতে কষ্ট হবে না পিসীমা! সর্বেশ্বরবাবু যদি খ্রীষ্টান হন, তা হলে তাব সঙ্গে মেলামেশায় তো উপকাবই হবে?

পিসীমা আঁতকে উঠে বলেন,—কি বলছিস মণীশ! জাত-ধর্ম খুইয়ে চাকরি নিবি। অমন চাকরির আমার দরকার নেই।

মণীশ বললে,—তোমার ভয় নেই পিসীমা। সত্যি আমি খ্রীষ্টান হতে যাচ্ছি না। চাকরি হয় হবে, তার জন্য ভাবি না। লেখাপড়া আমি করছি আর করবও।

এমন সময় গোকুলকাকা ঘরে প্রবেশ করলেন। গোকুলকাকা মণীশকে বললেন,—এবার তো সেরে উঠেছি বাবা! তোর আর কোন ভয় নেই। মন দিয়ে লেখাপড়াটা কর। বুঝলি কি না—কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে? বড্ড ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরেছিল কি না, কিন্তু পারলে না। কেন্দ্রে বৃহস্পতি রয়েছে কি না, তাই সব ঠিক হয়ে গেল।

পিসীমা বললেন,—ছেলেটাকে একটা মাদুলি-টাদুলি দাও না গোকুল! কত লোককে তো কত কিছু দিয়ে উপকার করছ।

গোকুলকাকা বললেন,—কাকে দেব বড়দি? আমার মণীশকে? কেন, কি হয়েছে তার? মিছামিছি বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপানো কেন? তবে হ্যাঁ, দেব, যখনই সময় হবে, তখনই দেব।

পিসীমা বলেন,—সামনে পরীক্ষা। ভালয়-ভালয় যাতে উতরে যায়, তাই আমার ভাবনা।

গোকুলকাকা বললেন,—আমার বুঝি ভাবনা নেই বড়দি! শুধু মণীশের জন্যই এখানে পড়ে আছি। তা না হলে, শহরে গেলে কত রাজা-মহারাজা আমায় নিয়ে টানাটানি করত। এক-একটা সিদ্ধি-কবচ ঝাড়তুম,—আর কোন চিন্তাই থাকত না।

মণীশ বলে,—আচ্ছা গোকুলকাকা! এ সব কি সত্যি বিশ্বাস হয়?

গোকুলকাকা বলেন,—কি রে? কি সত্যি আর কি মিথ্যে?

মণীশ প্রশ্ন করে,—ঐ কবচ-মাদুলি আর গ্রহ-শান্তি?

গোকুলকাকা উত্তর দেন,—সত্যি মিথ্যা বুঝি না বাবা! উপকার দিলেই হল! তোমার ঐ ডাক্তারি কবরেজিতে কি সব সময় উপকার হয়? সবই পরীক্ষা বাবা! মনে রাখতে হবে ডাক্তারিই করাও আর গ্রহ-শান্তিই করাও—কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে? কেউ কিছু করতে পারবে না, যদি না তাঁর কৃপা হয়।

গোকুলকাকা দু হাত জোড় করে অজানার উদ্দেশে প্রণাম জানান। পিসীমা বলেন,—সবই ভগবানের দয়া বাবা! তুমি আমি কিছুই নই। তা না হলে অমন সোনার সংসার নষ্ট হয়ে যায়, আমার চোখের সামনে অমন ভাই—পিসীমা আর বলতে পারলেন না; বার বার চোখের জল মুছতে লাগলেন।

গোকুলকাকা বললেন,—সত্যি বড়দি! আমরা কেউ কিছুই নই। তা না হলে আমি এই ত্রিকালঠাকুরের নাতি। আমার কি না এই অবস্থা।

মণীশ বলে,—যা হবার হবে পিসীমা! দুঃখ করে আর লাভ কি?

পিসীমা বলেন,—হ্যাঁ বাবা! তুই মানুষ হয়ে উঠলে তোর সুনাম শুনলে

সকল দুঃখ কাটবে। যে কদিন বাঁচি, তোদের হাসিমুখ যেন দেখতে পাই। পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই সংসারের একটা বিহিত করে আমি নিশ্চিন্ত হই।

গোকুলকাকা হেসে হেসে বললেন,—হ্যাঁ ঠিক বলেছ বড়দি! এটাই হবে আসল মাদুলি,—আমাদের মণীশের গলায় একটা বউ ঝুলিয়ে দেওয়া।

পিসীমাও হো-হো করে হাসতে লাগলেন। মণীশ অপ্রস্তিভের মত উত্তর দেয়,—তোমাদের যত বাজে কথা।

গোকুলকাকা বললেন,—সবই বাজে রে! আসল যে কোনটা তা-ই ঠিক করতে পারলাম না। এই লেখাপড়াটাও বাজে। সংসারে থাকব,—সুখে কাটাব; তার জন্যই ভগবান হাত-পা দিয়েছেন, মানুষ করে পাঠিয়েছেন। হ্যাঁ! তা বলতে পার, মানুষের মত মানুষ হয়ে থাকতে চাই। গাড়ি, ঘোড়া, বাড়ি আর বড় চাকরি নিশ্চয় চাই। কিন্তু বাবা! সে ভাবে না চললে কি এসব হবে? বৃত্তি পাওয়া চাই মণীশ! তোকে বৃত্তি পেতে হবে।

পিসীমা বলেন,—নিশ্চয়ই পাবে। মণীশ আমার লেখাপড়ায় ভাল। কালীপণ্ডিত এখনও বলেন, তোমার মণীশের মাথা আছে। ছেলেটা নিশ্চয়ই নাম করবে।

গোকুলকাকা বলেন,—তাই তো সকলেই মণীশকে ভালবাসে বড়দি। ওই খ্রীষ্টান মাষ্টারটা পর্যন্ত। আহা-হা! বেচারীর ছেলেটা মিছামিছি পুলিশের গুলিতে মারা গেল! অপঘাতে মৃত্যু হল বড়দি!

পিসীমা বললেন,—শুনেছি সব। কি যে সব কাণ্ড করে বসলে এরা! আচ্ছা, ওই শম্ভুনাথ, সে কি না হল দলের পাণ্ডা। ছিঃ ছিঃ, তারিণীদিদি কি কষ্টে দিন কাটান। এত বড় বংশের মেয়ে, এত বড় বংশের বউ! ভাইয়েরা মাস মাস দু-দশ টাকা না পাঠালে উপোস করে কাটাতে হবে। ছেলেটাকে যে কি করে মানুষ করে তুলেছে তারিণীদিদি তা কি আমরা জানি নে। শম্ভুর বাবা বিছানায় পড়ে রইলেন তিন বছর। তিন বছরে তাঁর সবই গেল। যা বাকি ছিল সরিক জমিদার তাও কেড়ে নিলেন।

গোকুলকাকা বললেন,—সরিক আর কে বড়দি! ওই কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরীর

কথা বলছ তো? হ্যাঁ, ওই টাকাতেই সেই নৌকো-পূজো করলে। মনে আছে মণীশ! তোর কৃষ্ণপ্রসাদের নৌকো-পূজোর কথা।

পিসীমা হেসে হেসে বললেন,—কি করে আর মনে থাকবে বল, তখন মণীশ আমার সবে চারে পা দিয়েছে।

মণীশের স্মৃতিপটে ভাসে—নৌকাপূজার কাঠামোর সামনে মা মনসা,—নাগে-রথে বিচিত্র সজ্জায়। আর সারি সারি অজস্র দেবতা।

মণীশ বলে—হ্যাঁ মনে আছে পিসীমা কত ঠাকুর-দেবতা যেন একসঙ্গে সাজিয়ে রেখেছিল; আর ওঝারা পদ্ম-পুরাণের গান গেয়েছিল। কিন্তু আবছা সব মনে পড়ছে।

গোকুলকাকা বললেন,—আলবৎ মনে আছে। এর বেশি মনে থাকতে পারে না। কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী একটা আস্ত বাটপাড়।

পিসীমা সাবধান করে দিয়ে চুপি চুপি বললেন,—অ্যাঁঃ, কি বলছ গোকুল! এ সব কথা কানে গেলে সর্বনাশ হবে।

হি হি করে হেসে জবাব দেন গোকুলকাকা,—কি করবে বড়দি! কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে। মানুষের ভাগ্যে যা আছে, মানুষ কেন, কোন গ্রহই তা পালটাতে পারে না।

পিসীমা বললেন,—বেশ, তাই মানলাম। পরের চর্চা করে কোন লাভ নেই। ওসব কথা এখন থাক। মণীশ আমার মানুষ হয়ে উঠুক, তা হলেই আমার দুঃখ ঘুচবে। তা বাবা! সর্বেশ্বরবাবুর ওখানে বেশি নাই বা গেলি। পড়াশোনার ক্ষতি হবে।

মণীশ বললে,—সেজন্যে ভেব না পিসীমা। তিনিও মাষ্টার মানুষ, তাঁর নজর আরও কড়া।

গোকুলকাকা বললেন,—তাঁর কাছে কিছু কিছু দেখেশুনে নিতে পারিস। শুনেছি লোকটা অগাধ পণ্ডিত।

মণীশ বলে,—হ্যাঁ, দরকার হলে নেব গোকুলকাকা।

গোকুলকাকা বলেন,—আচ্ছা মণীশ! সেদিন নাকি তোরা পোড়া-রাজার

বাড়ি দেখতে ওই পাহাড়ী জঙ্গলে ঢুকেছিলি? কি দেখলি? সেখানে কি আছে?

মণীশ বললে,—হ্যাঁ। দেখবার মতন কিছুই নেই গোকুলকাকা! শুধু পোড়া মাটি আর পাথর চারধারে ছড়ানো রয়েছে। আর বাড়িটা তো জঙ্গলে ঢাকা। সেখানে ঢোকে কার সাধ্যি?

গোকুলকাকা বলেন,—তাই তো বাবা! দেখবার কি আছে সেখানে? এতদিন কাটালাম এখানে, কই আমি তো কোনদিন যাই নি দেখতে। কোথাকার কোন্ রাজা পুড়ে মরেছে, তার আর দেখবার কি আছে?

মণীশ বলে,—তবু বড় কষ্ট হয় কাকা! শান্তশীল আর কলাবতী পুড়ে মরলে; কি কষ্টে না তারা মরেছে।

গোকুলকাকা বলেন,—কষ্টে নয় রে বাবা! সুখেই মরেছে; সব পাপ এক সঙ্গে ধুয়ে মুছে গেছে। আগেকার রাজ-রাজড়ারা এরকমই ছিল। জ্যান্ত পুঁতে ফেলত, হাত-পা কেটে দিত। কেমন শাস্তি? এখন তো আমরা সুখেই আছি বলতে হবে। এমন যে রামচন্দ্র, তিনিও কম যান নি। কোথায় কোন্ শূদ্র তপস্যা করছিল, ছুটে গিয়ে তাকে মেরে এলেন। ভগবানের তপস্যায়ও নিস্তার নেই। আরামে আছি বাবা, ইংরেজ রাজত্বে। তোমরা যাই বল না কেন!

পিসীমা বলেন,—রাত অনেক হয়েছে মণীশ। এখন শুয়ে পড়?

পিসীমা আর গোকুলকাকা বেরিয়ে গেলেন—মণীশ ভাবে, কলাবতী আর শান্তশীলের কথা। সুজাতার মুখ কিন্তু উঁকি-ঝুঁকি মারে মনের পটে। কি উচ্ছল প্রকৃতির এই সুজাতা!

সুজাতার সঙ্গে সর্বেশ্বরের পূজার ঘরে প্রবেশ করে মণীশ বিস্মিত হয়। দেবতা?—এই কি দেবতা?

ছবি,—মাত্র তিনখানি ছবি। মণীশের মনের প্রশ্ন তার মনেই থেকে যায়। সম্পূর্ণ নূতন জগৎ তার সামনে। ছেলেবেলা থেকে যা দেখে এসেছে, এখানে তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ঠাকুর-দেবতা কিংবা পূজার সরঞ্জাম কোশাকুশি কোন কিছুই নেই। শুধু বেদীর উপর তিনখানি ছবি।

একখানা ছবি ক্রুশবিদ্ধ যীশু খ্রীষ্টের। অন্য দুখানি ছবির কোন মূর্তিই তার পরিচিত নয়। একখানিতে পাহাড় ডিঙিয়ে চলেছেন জটাজূটধারী এক ঋষি। আর একখানিতে দেখা যায়,—হোমাগ্নির সামনে দু জন ঋষি,—এক জন আনত ভঙ্গীতে আর এক জনের পায়ের উপর যেন লুটিয়ে পড়তে চাইছেন, অন্য জন তাঁকে হাত ধরে তুলছেন। ছবির বিষয়বস্তুও মণীশের অজ্ঞাত।

মাটির ঘর। লালমাটির মেঝের ওপর সাদা ধবধবে বেদী। তার ওপর পাশাপাশি ছবিগুলি সাজানো। পূজার কোন উপকরণ নেই; না আছে ফুল, না আছে নৈবেদ্য। সামনে পাতা রয়েছে একখানি আসন,—কালো হরিণের চামড়া। তবুও যেন কেমন এক শুচিতা, শুভ্রতা অনুভব করে মণীশ।

এই আসনের ওপর বসে সর্বেশ্বর প্রার্থনা করেন। শুধু প্রার্থনা নয়, পাহাড়ীদের উপদেশ দেন তিনি। ঠিক উপদেশও বলা চলে না, বক্তৃতা দেন সর্বেশ্বর। জগতের সব খবর দেন তাদের। কখনও বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি চুপ করে বসে থাকেন ধ্যানস্থ হয়ে।

সুজাতার সঙ্গে এই প্রথম সর্বেশ্বরের পূজার ঘরে মণীশ ঢুকল। সর্বেশ্বরের মুখে প্রশান্ত হাসি। কপালের ডানপাশে গভীর ক্ষতের দাগ; আধপাকা দাড়িগোঁফ বেশ বড়ই হয়েছে। উপরের পাটির সামনের একটা দাঁতও ভাঙ্গা। সর্বেশ্বর ডাকলেন মণীশকে,—এসেছ মণীশ! এতদিনে মনে পড়েছে? হ্যাঁ, তোমাদের এসব ভাল লাগবে কেন? সুরথও এ ঘরে কদাচিৎ ঢুকত। তার এসব ভাল লাগত না।

কেমন যেন বিমনা হয়ে পড়লেন সর্বেশ্বর। সুজাতা একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। মণীশ বলেন,—না। আমার ভাল লাগবে।

সর্বেশ্বর বললেন,—তোমার সব নূতন ঠেকছে বোধহয় মণীশ! কিন্তু এখানে কিছুই নূতন নয়, পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি। এই তিন মূর্তি চিরপুরাতন, চির নবীন —শাশ্বত। ঐ দেখ,—মহামুনি অগস্ত্যের ছবি। বিন্ধ্যাচল লঙ্ঘন করে চলেছেন তিনি। এক হাতে ত্রিশূল আর এক হাতে কমণ্ডলু। কি দীপ্ত মূর্তি তাঁর। ব্রাহ্মণ্য-গর্ব আর ক্ষাত্র-তেজের পাঁচিল এই বিন্ধ্য; আকাশ ছুঁয়ে আর্য-সভ্যতাকে

উত্তরাপথে আটকে রেখেছিল। তেজোদীপ্ত কটিবস্ত্রধারী বিদ্রোহী ব্রাহ্মণ তার মাথা চিরদিনের মত নত করে দিয়ে চলে গেলেন। অমৃতের বাণী শোনাতে গেলেন তিনি। কে তাঁর গতি রোধ করবে? অমৃতের পুত্রদের খোঁজে চললেন অগস্ত্য। একা,—সম্পূর্ণ একাকী। কোথায় গেলেন, কেউ জানল না। সাগরও লঙ্ঘন করলেন অগস্ত্য। দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে কমণ্ডলু-বারি ছিটিয়ে চললেন সেই বিদ্রোহী ঋষি অগস্ত্য।

তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছিল উত্তরাপথ। কিন্তু খুঁজে পায় নি। হাজার হাজার বছর কেটে গেছে। ব্যর্থ হয়েছে সে সন্ধান। কিন্তু স্তম্ভিত হয়েছে উত্তরাপথ। ঘরছাড়া সেই বিদ্রোহী ঋষিকে মরমূর্তিতে পায় নি ভারত; তাঁকে যখন খুঁজে পেয়েছে, তখন অমৃত-মূর্তিতে দেবতা হয়ে উঠেছেন অগস্ত্য। উত্তরাপথের আর্যসন্তান বিন্ধ্য লঙ্ঘন করে দক্ষিণাপথে অগস্ত্যকে খুঁজতে গিয়ে বিস্মিত হয়েছে। মঠ-মন্দির আর দেব-দেউলে তখন ছেয়ে গেছে দক্ষিণ-ভারত—সাগর-সৈকতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হিমালয়-দুহিতা পার্বতী কন্যাকুমারী।

উত্তরাপথের গর্বোন্নত মস্তক লুটিয়ে পড়ল কন্যাকুমারীর পায়ে। তবু তাদের আভিজাত্যের বৃথা দম্ভ কাটল না। সারা ভারতে ছড়িয়ে রয়েছে পার্বতীর সন্তানেরা,—তাদের কোল দিল না পার্বতীর ভক্ত উত্তরাপথ। অগস্ত্যের অভিশাপ —মাথা নত করে থাকতে হবে! যতদিন না অগস্ত্যের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, যত দিন না আর্য-সন্তানেরা আর্যত্বের দম্ভ ভুলে ওদের কোল না দেয়, ততদিন নিস্তার নেই।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয় মণীশ। মাঝে মাঝে সুজাতার মুখের দিকে তাকায়। সুজাতা যেন ধ্যানমগ্না। সর্বেশ্বর বলতে লাগলেন,—বুঝলে মণীশ আমরা তার ফল ভোগ করছি। কমণ্ডলু-বারির কি যে শক্তি, তা আমরা ভুলে গেছি। অমৃত ছিল সে কমণ্ডলু-বারিতে। ভারতের ব্রাহ্মণ সেই কমণ্ডলু হারিয়েছে। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরীতে শত শত বৎসর স্নান করলেও আমাদের পাপ ধুয়ে মুছে যাবে না। আবার চাই কৌপীনধারী মানবপ্রেমিক সাধক। সেদিন হয়ত আবার-আসবে মণীশ, সেদিন হয়ত আবার আসবে।

নূতন কথা আজ শুনল মণীশ। এমন করে কেউ কোনদিন অগস্ত্যের কথা

বলে নি। ইতিহাসে অগস্ত্যের নাম আছে। এত কথা কোনদিন ভাবেও নি সে। শুধু জানে, ভাদ্রের পয়লা তারিখে কোথাও যেতে নাই; অগস্ত্য-যাত্রা হয়। তার বাবা বলতেন,—অগস্ত্য না কি ঐ দিন যাত্রা করে বেরিয়েছিলেন, আর তিনি বাড়ি ফিরে আসেন নি। তাই ঐ দিনটা অভিশপ্ত।—বাড়িতে ফিরে আসা আর যায় না, এই ভয়টাই মণীশের বেশী ছিল।

ছবিতে অগস্ত্যের তেজোদীপ্ত প্রশান্ত মূর্তি সুন্দর লাগল। উন্নত ললাট, প্রশান্ত মুখ, মস্তকে জটার বেণীচূড়া। তাঁর পায়ের তলায় বিন্ধ্যাচল। পিছনে উত্তর ভারত হাহাকার করছে; কেউ বাধা দিতে পারলে না। সামনে দাঁড়িয়েছিল বিন্ধ্যাচল। সেও মাথা নত করলে। অভয় মন্ত্র উচ্চারণ করলেন বিন্ধ্যবাসিনী। অগস্ত্য-যাত্রা সুরু হল।

সর্বেশ্বর বলতে লাগলেন,—অগস্ত্য যাত্রার মানে জান মণীশ! আর্য-সভ্যতার জয়যাত্রা। সাগরের ঢেউকে কেউ বেঁধে রাখতে পারে? না পেরেছে? একা অগস্ত্য জয়যাত্রায় বের হলেন। দিগ্বিজয়ী ঋষি অগস্ত্য। ফিরে আসবে কি বাবা? ছাড়িয়ে আছে অগস্ত্য, দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে অমর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে ঋষি।

মণীশ মন্ত্র-মুগ্ধের মত সর্বেশ্বরের কথা শোনে। মনে মনে প্রশ্ন জাগে,—কে এই সর্বেশ্বর মাষ্টার! তা হলে যে সকলে বলে সর্বেশ্বর ম্লেচ্ছ, সর্বেশ্বর খ্রীষ্টান। জাত মানে না, ধর্ম মানে না। কিছুই মানে না এই সর্বেশ্বর মাষ্টার। ইংরেজী বই পড়ে ওঁর মাথা বিগড়ে গেছে। সংশয়-দোলায় দোলে মণীশের মন।

পার্বতীর পুত্র কারা?—এই পাহাড়ীরা? উত্তর ভারত এদের অবহেলা করেছে। ইতিহাসে আছে, আর্যদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে তাদের বশ্যতা যারা স্বীকার করে নি, তারাই পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। দাসত্ব স্বীকার করে নি তারা। কিন্তু এরা কি মণীশের আর সর্বেশ্বরের সগোত্র? এরাও কি মণীশের মত একই মানুষ? এদের আকৃতি-প্রকৃতি দেখে তো তা মনে হয় না।

সর্বেশ্বর মাষ্টার বলেন,—এরাও তোমার আমার মত মানুষ মণীশ! কোন তফাৎ নেই। আর্য, অনার্য, ইংরেজ, জাপানী ভিন্ন ভিন্ন আবহাওয়ার বিভিন্ন ধরনের

মানুষ। মূলে তারা এক; সকলেই অমৃতের সন্তান। তফাৎ আজ যা দেখছ, একশ বছর পরে সে তফাৎটাও চোখে পড়বে না।

বাতাসীমনিকে দেখে কিছু বুঝতে পার মণীশ?—হঠাৎ প্রশ্ন করলেন সর্বেশ্বর।

সুজাতার মুখে কৌতুকের হাসি। মণীশ কোন উত্তর দিতে পারে না। সর্বেশ্বর বললেন,—না, কিছুই বুঝতে পারবে না। তোমার মা, পিসীমা কিংবা মাসীমার সঙ্গে তার কি কোন তফাৎ আছে?—না, কিছুই নেই। সাহেবের মেয়েও বাঙালী মেয়ে হয়ে ওঠে মণীশ।

কথাটা উচ্চারণ করেই চমকে উঠলেন সর্বেশ্বর। সুজাতার মুখের দিকে তিনি আর তাকাতে পারলেন না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তিনি বললেন,—বলছিলাম খাঁটি ইংরেজের মেয়েও বাঙালী মায়ের ঘরে পড়লে বাঙালী হয়ে যায় বাবা!

সর্বেশ্বরের মুখে আবার প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন,—এই দেখ বশিষ্ঠের ছবি। আর্য-ভারতের প্রতীক—বেদ উপনিষদ আর ব্রহ্ম-বাদের মূর্তিমান আদর্শ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ। ঐ দেখ,—সামনে তাঁর হোমাগ্নি জ্বলছে। বশিষ্ঠমেধ যজ্ঞের পুরোহিত হয়েছেন বশিষ্ঠ। ত্রিভুবন খুঁজে কোথাও বিশ্বমিত্র এ যজ্ঞের পুরোহিত পেলে না; কেউ রাজী হল না। এরকম যজ্ঞের পুরোহিত হবার মত তপোবল আছে কার? বিশ্বামিত্র ছুটলেন ব্রহ্মার কাছে। ধিকিধিকি প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছেন বিশ্বামিত্র। বশিষ্ঠের সর্বনাশ করেছেন। একে একে বশিষ্ঠের পুত্রেরা মরেছে প্রতিহিংসার আগুনে। আর যে দগ্ধ করবার মত কিছুই বাকি নেই; নিজেই নিজের আগুনে পুড়ছেন বিশ্বামিত্র। তপোবলে নূতন জগৎ সৃষ্টি করেছেন; তবু কেউ স্বীকৃতি দেয় না। তবুও তিনি ব্রহ্মের সাক্ষাৎলাভ করতে পারেন না। ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারলেন না রাজর্ষি বিশ্বামিত্র। ঋষি-সমাজ তাঁর ভয়ে কম্পমান। ক্ষাত্রকুলও তাঁর তেজে ম্রিয়মাণ। জ্বলন্ত উল্কার মত অভিশাপের অগ্নি জ্বলে তাঁর চোখে মুখে। কখন কার উপরে পড়ে সে অভিশাপ তার ঠিক নেই।

সর্বেশ্বর আবেগভরে বলতে লাগলেন,—পুরোহিত মেলে না বশিষ্ঠমেধ যজ্ঞের। ব্রহ্মা বললেন,—বশিষ্ঠের কাছে যাও, বশিষ্ঠই হবে সে যজ্ঞের পুরোহিত। ব্রহ্মার কথা শুনে বিস্মিত হন বিশ্বামিত্র। মনে তাঁর সংশয় জাগে। বশিষ্ঠ হবে পুরোহিত? জিঘাংসার আগুনে অন্ধ হয়েছেন বিশ্বামিত্র। তাঁর সংকল্প ব্যর্থ হতে পারে না। বশিষ্ঠ বেঁচে থাকতে তাঁর যে ব্রাহ্মণত্ব লাভের আশা নেই। বিশ্বামিত্রের তপোবল, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি,—সবই যে ব্যর্থ হতে বসেছে!

দ্বিধাভরে বশিষ্ঠকে আমন্ত্রণ জানাতে গেলেন বিশ্বামিত্র। হাসি-মুখে রাজী হয়ে গেলেন বশিষ্ঠ। কোন দ্বিধা করলেন না। তবুও সংশয় জাগে বিশ্বামিত্রের মনে। তাঁর দম্ভের চূড়ায় যেন কম্পন সুরু হয়ে গেছে। ঐ যে জটাজুটধারী ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠমেধ যজ্ঞের প্রজ্বলিত অগ্নির সামনে নির্বিকার হয়ে বসেছেন ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ। পূর্ণাহুতি হবে; এখনই বশিষ্ঠের মাথা খসে পড়বে হোমাগ্নিতে। হাত তুলে শেষ মন্ত্র উচ্চারণ করছেন বশিষ্ঠ। ঐ যে, ঐ যে তারই সামনে তেজোদীপ্ত ঋষি বিশ্বামিত্র। প্রবল ভূমিকপে যেন তাঁর দম্ভের চূড়া ভেঙে পড়ল। বিশ্বামিত্র লুটিয়ে পড়লেন বশিষ্ঠের পদতলে,—তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ। আমায় ক্ষমা কর। জানতে চাই নে আমি ব্রহ্মাকে, ব্রাহ্মণত্বে আমার প্রয়োজন নেই। তোমাকে জেনেছি আমি, তাই আমার গৌরব। আমার সমস্ত তপস্যা আজ সার্থক হল। আমি আজ ব্রাহ্মণকে জেনেছি, ব্রহ্মাকে জানতে চাই নে। তুমি আমায় ক্ষমা কর।

বশিষ্ঠদেব দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন বিশ্বামিত্রকে। প্রশান্তচিত্তে বললেন,—ওঠ, ওঠ, বিশ্বামিত্র! সত্যই তোমার সাধনা আজ সার্থক হয়েছে। ওঠ, ওঠ, ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র! তোমার মত তপোবলে বলীয়ান্ ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করে আমিও আজ ধন্য হলাম।

স্তম্ভিত হলেন বিশ্বামিত্র। তিনি আজ ব্রাহ্মণ। না, না, এ হতে পারে না। অভিভূতের মত বশিষ্ঠকে তিনি বললেন,—তুমি আমায় দীক্ষা দাও ব্রাহ্মণ। যে মন্ত্রে সুখ, কিংবা দুঃখ বিচলিত করতে পারে না, যে মন্ত্রে কাম, ক্রোধ, মোহ, গর্ব মানুষকে পাগল করতে পারে না, সেই মন্ত্র দাও। যে মন্ত্রে মানুষ সর্বংসহা ধরিত্রীর

মত সইতে পারে, তবু তার হৃদয়ের প্রশান্তি নষ্ট হয় না, সেই অমৃত মন্ত্র আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাই।

বিশ্বামিত্রের কথা শুনে বশিষ্ঠদেব হেসে উঠলেন। প্রশান্ত হাস্যে তাঁকে বললেন,—সে মন্ত্র তুমি পেয়ে গেছ ঋষি। তুমি আজ ব্রাহ্মণ। ক্ষমাই সেই মহামন্ত্র।

সর্বেশ্বরের মুখেও প্রশান্ত হাসি। তিনি বললেন,—নিশ্চয়ই তোমরা আজ তা স্বীকার করবে না মণীশ! মুখে স্বীকার করলেও কাজে তা করতে পারবে না। তাই ভারতের ঘরে ঘরে আজ জিঘাংসার আগুন জ্বলছে। বিশ্বামিত্রের মত কঠোর সাধনা চাই; আগে বিশ্বামিত্রের মত গড়ে উঠতে হবে। ভীরুর ধর্ম ক্ষমা নয়। বীরের ধর্মই ক্ষমা। সে ক্ষমা বড় মহান; তাই বলি আগে গড়ে ওঠ, শক্তিমান হও। হৈ-চৈ করলে দেশ স্বাধীন হয় না মণীশ! হলেও দেশের মানুষ তার স্বাদ বুঝতে পারবে না। সেটা হবে সবলেরই রাজত্ব; সবলেরই অত্যাচার।

মণীশের মানসপটে তখন অগস্ত্যের জয়যাত্রার দৃশ্য ভাসছে,—পাহাড় ডিঙিয়ে চলেছেন অগস্ত্য; পাহাড়ের পর পাহাড়, তাঁর আশে-পাশে পাহাড়ী মানুষ। আকাশ-পাতাল ভাবছে মণীশ। হ্যাঁ, বশিষ্ঠের মত ঋষি চাই। জটাজূটধারী সন্ন্যাসীর মিছিল যেন দেখতে পাচ্ছে—কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে এ কি বাণী আজ সে শুনছে! এ রকম করে কেউ কোনদিন তাকে বুঝিয়ে বলে নি এ সব কথা। কাঁসরঘণ্টার ধ্বনিতে দেবারতি দেখেছে মণীশ। কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরীর বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বন। মহিষমর্দিনী দুর্গাপূজার আড়ম্বর আজ যেন তার কাছে ম্লান হয়ে ওঠে। অশ্বিনীপণ্ডিতের চণ্ডীপাঠ শ্রুতিমধুর হলেও কি উপকার হয় তাতে? দেবতার মাহাত্ম্য-বর্ণন ছাড়া তো আর কিছুই নয়!—দেবী তুষ্ট হন চণ্ডীপাঠে; অমঙ্গল নাশ হয় চণ্ডীর মাহাত্ম্যে। দুর্গানবমীতে মণীশের বাড়িতেও চণ্ডীপাঠ হয়। শুদ্ধচিত্তে তা শুনতে হয়। যুদ্ধের কাহিনী,—চণ্ডমুণ্ড, শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের কাহিনী। যত সব অবাস্তব গল্প‌ কি উপকার হয় চণ্ডীপাঠে?

চণ্ডীর কাহিনীর সঙ্গে নিজের নাড়ির যোগ দেখে না মণীশ। কিন্তু বশিষ্ঠ,

অগস্ত্য আর বিশ্বামিত্র,—এঁরা যে তারই সগোত্র; তারই মত মানুষ। এদের গৌরবে গরীয়ান সে। এঁরা যে তারই পূর্বপুরুষ, এই গর্বে বুকটা ফুলে ওঠে।—ইক্ষ্বাকুবংশের পুরোহিত বশিষ্ঠ। সেই বশিষ্ঠের চরিত্র এত মহান্! মণীশের মনোজগতে তখন তোলপাড় চলছে,—হ্যাঁ, বিশ্বামিত্রের তপোবলের কথা সে জানে। হরিশ্চন্দ্র-নাটকের কথা মনে পড়ে যায়। কি নৃশংস ছিল এই বিশ্বামিত্র। আর রাজা হরিশ্চন্দ্র? বশিষ্ঠের মতই হরিশ্চন্দ্রের চরিত্র। সেখানেও বিশ্বামিত্রের পরাজয় ঘটল। যাত্রার পালায় দেখা দৃশ্যের পর দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল তার। নূতন করে সব দেখতে শিখল মণীশ।

সুজাতা এবার কথা বললে,—কি ভাবছ মণীশদা?

মণীশ বসলে,—না, কিছুই ভাবছি না। শুধু ভাবছি মাষ্টারমশাই যা বলছেন, তা কি সম্ভব?

সুজাতা বললে,—নিশ্চয়ই সম্ভব হবে মণীশদা। সাত সমুদ্র তেরো নদী ডিঙিয়ে এসে সাহেবরা আজ অগস্ত্যের ব্রত উদ্‌যাপন করছে। নিজেও দেখছি, বাবার মুখেও শুনছি, তারাও পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। তারাও ছড়িয়ে দিচ্ছে অমৃত-মন্ত্র।

সুজাতার কথা শুনে হেসে উঠলেন সর্বেশ্বর। তিনি বললেন,—ঠিকই বলেছে সুজাতা। অমৃত-মন্ত্র ছড়িয়ে দিচ্ছে ওই মিশনারীরা। দুর্গম পাহাড়ে হিংস্র নরনারী আজ সভ্য-ভব্য হয়ে উঠছে। কিন্তু এ অমৃত-মন্ত্রের দোষ আছে বাবা! সত্যিকারের অমৃত-মন্ত্র নয় এটা; তারা ছড়াচ্ছে শুক্রাচার্যের সঞ্জীবনী মন্ত্র। এ মন্ত্রে দানবশক্তি জেগে উঠেছিল। যীশুর অমৃত-মন্ত্র ওদের হাতে সঞ্জীবনী মন্ত্রে পরিণত হয়েছে। সঞ্জীবনী মন্ত্রে মানুষের মনে উন্মাদনা জাগে; তারা চায় নিঙড়ে নিয়ে পৃথিবীটাকে ভোগ করতে। সভ্য হয় বটে মানুষ এ মন্ত্রে, কিন্তু ভোগের বাসনা তাকে উন্মত্ত করে দেয়। মাটির পৃথিবী তখন আর তাদের তৃপ্তি দিতে পারে না; সূর্য-চন্দ্রকে স্পর্শ করতে চায় তারা; স্বর্গের আসন টলমল করে ওঠে। দেব আর দানবের লড়াই বেধে যায়।

সর্বেশ্বর বলতে থাকেন,—তাই দেখ, সমস্ত ইউরোপ সভ্য-ভব্য হয়েও, চূড়ান্ত

পার্থিব উন্নতি করেও ক্ষান্ত থাকতে পারছে না। লড়াই করে মরছে; আরও চাই, আরও চাই,—বলে হাহাকার উঠছে সারা ইউরোপ জুড়ে। নিজেদের মধ্যেই হানাহানি কাটাকাটি লেগে যাচ্ছে।

মণীশ সর্বেশ্বরের কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তার চোখে তখন ভেসে উঠেছে মহান ব্রতী ঐ মিশনারীরা। মহান কাজ করছে ইংরেজ মিশনারী। দেশে দেশে সভ্যতার আলোক ছড়াচ্ছে ইংরেজ—রেল, স্টীমার, হাওয়াগাড়ি, টেলিগ্রাম কত কি। আর সঙ্গে চলেছে সাদা পোশাকে হাসিমুখে মিশনারী দল—গলায় ক্রুশ চিহ্ন,—হাতে বাইবেল। মিশনারীরা সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়ে চলেছে।

সুজাতা বলে,—তুমিই বলেছ বাবা, এ হানাহানি একদিন শেষ হয়ে যাবে। মানুষ জেগে উঠবে সেদিন, সেদিন মানুষের বুকে মানুষ ছুরি চালাতে পারবে না।

হাসিমুখে জবাব দেন সর্বেশ্বর,—না, পারবে না। সঞ্জীবনী মন্ত্রে বিজ্ঞানের সাধনায় জেগে উঠছে অসুর; মানুষ জেগে উঠছে না। এ মন্ত্রকে অমৃত-মন্ত্রে রূপায়িত করতে হবে। তা না হলে সবই পণ্ড হয়ে যাবে। ওই সব মূঢ় মূকদের মুখে শুধু ভাষা দিলে চলবে না, তাদের ভেতরকার মানুষকেও ভাষা দিতে হবে। সেই মানুষকে জাগিয়ে দিতে হবে। তপোবলে অসাধ্য-সাধনকারী বিশ্বামিত্রের অন্তর-পুরুষ ব্রাহ্মণ জেগে উঠবে একদিন। বুঝবে একদিন তোমরা, এখন বুঝতে পারবে না। সেদিন আসবে। শুধু স্কুলের লেখাপড়ায় কিছুই হবে না; তাতে দানবই জাগবে, মানব জেগে উঠবে না।

মণীশ বলে,—তা হলে কি এই লেখাপড়ার কোন মূল্য নেই মাষ্টারমশাই!

সর্বেশ্বর উত্তর দেন,—নিশ্চয়ই আছে।

মণীশ জিজ্ঞাসা করে,—তা হলে গান্ধীজী স্কুলগুলো ভাঙতে চাইছেন কেন?

সর্বেশ্বর বলেন—আমাদের এ শিক্ষার ধারায় গলদ আছে মণীশ। তাই তাঁরা ভাঙতে চাইছেন। কিন্তু গড়ার শক্তি অর্জন না করে এ ভাঙার কোন মানে হয় না। ভোগের জন্যই পৃথিবী। দানব না জাগলে মানব জাগতে পারবে না। কিন্তু মানবকে জাগাবার যে স্কুল নেই। সে রকম শিক্ষকেরই যে অভাব।

মণীশ বলে,—তা হলে কি হবে মাষ্টার মশাই! আমাদের তা হলে কি মুক্তি নেই?

সর্বেশ্বর সহাস্যে উত্তর দেন,—আছে মণীশ, নিশ্চয়ই আছে। ভাবের রাজ্যে, মনের রাজ্যে আমাদের এখন সাধনা করতে হবে; সে শিক্ষক—সে গুরু আসবেন, তাঁর জন্য পাঠশালা কিংবা স্কুল কলেজের প্রয়োজন নেই। একা এক জন শিক্ষক, একজন গুরু দাঁড়ালে সারা ভারতটাকেই দীক্ষা দিতে পারে। ঐ যে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি দেখছ। মৃত্যুর বিভীষিকা নেই তাঁর মুখে। ভাব দেখি, কি না অত্যাচার করে মেরেছে তাঁকে। তবু অভিশাপের বাণী উচ্চারণ করেন নি যীশু। নিজেই অনুতপ্ত হয়েছেন; নিজেই অপরাধীদের হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন জগৎ-পিতার কাছে,—পিতঃ, এরা না বুঝে এসব করছে এদের ক্ষমা কোর।

ছল ছল চোখে হাত জোড় করে দাঁড়াল সুজাতা। সর্বেশ্বর প্রার্থনার সুরে বলতে লাগলেন,—ক্ষমা কর, ক্ষমা কর এদেব। এরা না বুঝে অপরাধ করছে, এদের বোঝবার শক্তি দাও ভগবান। অমৃত ছিটিয়ে দাও এদের উপর। মানুষের অন্তরপুরুষ জেগে উঠুক। হে মহান পিতা, মানুষ মানুষকে ভালবাসতে শিখুক; রেষারেষি দূর হোক। এই সব তরুণ তোমার সেই মহান ব্রতে জীবন উৎসর্গ করুক। তাদের শক্তি দাও।

মণীশও সুজাতার দেখাদেখি হাত জোড় করে দাঁড়াল। সর্বেশ্বর বললেন, তোমার কাছে সবই নূতন ঠেকবে মণীশ। এখানে দেবতার স্থান নেই। আমাদের প্রার্থনা সেই মহান আদর্শের কাছে। সেই আদর্শ গ্রহণ করতে পারবে তুমি?

—হাঁ পারব। নিশ্চয়ই পারব মাষ্টার মশাই।

—বাধা আসবে বাবা! প্রবল বাধা আসবে। যে আবহাওয়ায়, যে সমাজে তুমি মানুষ হয়েছ, জন্মগত যে গণ্ডি তোমায় বেঁধে রেখেছে, সে গণ্ডি কি তুমি লঙ্ঘন করতে পারবে?

—নিশ্চয়ই পারব।

হাসি ফুটে উঠল সর্বেশ্বরের মুখে। তিনি বললেন,—বাধা আছে বাবা!

সৃষ্টিছাড়া সর্বেশ্বর মাষ্টারের ফাঁদে পা দিলে কেউ তোমায় ক্ষমা করবে না। তোমায় দেখে সুরথকে ভোলবার চেষ্টা করছি। কিন্তু সে হয় না বাবা! তুমি তোমার আপনজনকে ছাড়তে পারবে না। অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াবার সময় তোমার এখনও হয় নি।

মণীশ সর্বেশ্বরের কথায় চিন্তাকুল হয়ে পড়ে। কি বাধা থাকতে পারে তার এখানে আসার? ভেবেই পায় না সে, আপনজনকে ছাড়তে হবে কেন? সর্বেশ্বর রাজদ্রোহী নন, তার সঙ্গে মিশলে কারও চাকুরি যাবার ভয়ও নেই। হেঁয়ালির মত ঠেকে সর্বেশ্বরের কথা। তার মনে প্রশ্ন জাগে,—তার আপন জন কে? নেই, কেউ তো নেই; মা, বাবা কেউ নেই তার। পিসীমার ছল ছল চোখ ভেসে ওঠে চোখের সামনে; গোকুলকাকা হাসছেন,—কিং কুর্বন্তি!

সুজাতার চোখে-মুখেও করুণ আকৃতি। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণ। রূপ পালটাচ্ছে পৃথিবী। দক্ষিণা বাতাস প্রাণ-জাগানো মন্ত্রে রূপ পালটে দিচ্ছে বনবনানীর। সুজাতাও অপরূপা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার চোখের সামনে। নূতন দৃষ্টি পেয়েছে মণীশ। অগস্ত্যের মূর্তি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে; বিন্ধ্যাচল লঙ্ঘন করছেন অগস্ত্য।

আন্দোলনে ভাঁটা পড়লেও এক রকমের উদ্দীপনা দেখা দিল পল্লীতে পল্লীতে। অনেকে জেলে গেল। হৈ-চৈও বন্ধ হয়ে গেল। এখন আর আকাশ-বাতাস বন্দেমাতরম্ কিংবা আল্লাহ্-আকবর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে না। কাঞ্চনগড়ের ছেলেদের মধ্যেও বিশেষ কোন চাঞ্চল্য নেই।

কিন্তু সর্বেশ্বরের আশ্রম কর্মচঞ্চল হয়ে উঠল; আগে শুধু পাহাড়ী আর নীচু শ্রেণীর লোকেরাই সেখানে ভিড় জমাত। এখন ভদ্রঘরের ছেলেরাও সেখানে ভিড় করতে লাগল। শম্ভুনাথ মাঝে মাঝে শহরে যায় আবার ফিরে এসে নানা সংবাদ দেয়। স্বরাজ পাবার প্রথম পর্ব 'না কি শেষ হয়েছে। গান্ধীজী জেল থেকে বেরিয়ে এলেই দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হবে। শম্ভুনাথ বলে,—দেশটা এখনও তৈরী

হয় নি। যখন তৈরী হবে, তখন আপনাআপনি স্বরাজ এসে পড়বে। দেশের নাড়িটা টিপে দেখে নিয়েছেন গান্ধীজী।

সর্বেশ্বর পাহাড়ীদের মধ্যে এনেছিলেন পরিচ্ছন্ন জীবনধারা। তাদের মধ্যে তিনি তাঁরই আদর্শে মানুষকে জাগাবার সাধনা করছিলেন। তাদের নোংরা জীবনে আজ সভ্যতার ছাপ দেখা দিয়েছে। পাহাড়ের আনাচে-কানাচে তাদের কুটিরগুলি দেখলে চোখ জুড়োয়। পাড়ায় পাড়ায় বস্তিতে বস্তিতে আর রেষারেষি কিংবা হাঙ্গামা নেই। এ অঞ্চলের পাহাড়ীরা সর্বেশ্বরকে গুরুর চেয়েও বেশি মানে; শুধু তাদের লেখাপড়া নয়, আচার-আচরণও পালটে গেছে।

ভূতের রোজা, ডাইনী বুড়ীর দরজায় আর তারা সহজে যায় না। সর্বেশ্বরের শিশির ওষুধই তাদের অমৃত। অসুখ-বিসুখে সর্বেশ্বর ওষুধ বিতরণ করেন। সর্বেশ্বর হোমিওপ্যাথির বাক্স নিয়ে এ পাড়ায় ও পাড়ায় ঘোরেন। শক্ত কোন কিছু হলে সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার ভবানীশঙ্করকে ডেকে পাঠান।

নন্-কো-অপারেশনের হুজুগে যারা মেতেছিল, তাদের অনেকেই এখন সর্বেশ্বরবাবুকে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছে। পাহাড়ী বস্তিতে বস্তিতে তাদের কাজ ভাগ করে দিয়েছেন সর্বেশ্বর। তিনি বলেছেন,—এদের আগে মানুষ কর, হাতে-নাতে শিক্ষা দাও। তবে তো দেশ স্বাধীন করবে।

কোচ, হাজাং, গারো, কাছারী—কত জাতের কত লোক। পাহাড়ে পাহাড়ে ইংরেজ মিশনারী ডেরা গেড়েছে। মাঝে মাঝে সর্বেশ্বর বলেন,—ওদের হটিয়ে দিতে হবে। কিন্তু লড়াই করে নয়। ভালবেসে পাহাড়ীদের আপন করে নিতে হবে। ওরা যদি খ্রীষ্টান হয়ে যায়, আমাদেরই শক্তি কমে যাবে। সাহেবদের ওরা আপন লোক ভাববে; আর আমরা হয়ে যাব তাদের শত্রু, তাদের পর। আমাদের নাড়ীর যোগ রয়েছে ওদের সঙ্গে। এরা যেন পর না হয়ে যায় দেখো। হাজার হাজার বছর ধরে ওরা আমাদেরই ভয়ে বনে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এরা জানে না, আমরাই—আমাদের বাপ-পিতামহ পূর্বপুরুষ সেই আর্যরাই এদের সব কিছু থেকে বঞ্চিত করে দূরে করে দিয়েছে। সাহেব মিশনারীরা তাদের একথা শিখিয়ে দিলে, জানিয়ে দিলে সর্বনাশ হবে।

সর্বেশ্বরের কথায় অনেক কাজ হয়। গাঁয়ের যত অকর্মা ছেলে কাজের মানুষ হয়ে ওঠে। সুলেমান রাজা উৎসাহ দেন; তৃপ্তিও পান। তিনিই পাহাড়ীদের মাঝে আপনভোলা সর্বেশ্বরকে আবিষ্কার করেছিলেন। সর্বেশ্বরের সহায়তায়ই কাঞ্চনগড়ের স্কুল গড়ে তুলেছিলেন জমিদার সুলেমান রাজা।

গনি রাজা সুলেমান রাজারই ভাই। গনি রাজার জেল হয়েছে; কিন্তু সুলেমান রাজা তাতে দমেন নি। দেশের কাজে খিলাফতের কাজে ভাই জেলে গেছে এ তো ভালই। কিন্তু সুলেমান রাজার মতে এসব নিছক পাগলামি! খোদার মর্জি না হলে এদেশ স্বাধীন হতে পারে না। আর দেশ স্বাধীন হবারই বা আর দরকার কি? বেশ তো আছে দেশের লোক! স্বাধীন হয়ে কি লাভ হবে? যত সব হাঙ্গামহুজ্জুত চুকে গেছে; কথায় কথায় রাজা প্রাণ নিচ্ছেন না, ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি মারছে না। যুদ্ধ নেই, লুটপাট নেই, বেশ আছি আমরা! আমরা কি কারও অধীন? স্বাধীন হলে কি আমাদের পাখা গজাবে? আইন-কানুন না মানার নাম যদি স্বাধীন হওয়া বোঝায়, তা হলে তো সর্বনাশ!

কনকবাবু বলেন,—রাজাসাহেব ঠিকই বলেছেন। দেশের-গাঁয়ের এই সব লোক বোঝেই বা কি? এদের ওরকম করে ক্ষেপিয়ে দেওয়া মোটেই উচিত হয় নি। দেখলেন তো মিছামিছি কতকগুলি লোক মারা গেল।

সুলেমান রাজা বললেন,—সে আমি আগেই জানতাম মাষ্টার! কিন্তু বলবই বা কাকে? তোমাদের ওই গান্ধীজী আর মোহাম্মদ আলী তো আমার কথা শুনবেন না! তাঁদের কথা ছেড়েই দাও, গাঁয়ের ছেলে শম্ভু, সেই বা আমার কথা শুনল কোথা? এখন তো হল; সব চুপচাপ মেরে গেছে।

সুলেমান রাজা হাসতে লাগলেন। তার পর তিনি বললেন,—যাই বল মাষ্টার, আমাদের ওই পাগলা সর্বেশ্বরবাবু কিন্তু আসল কাজই করছে। যত সব পাহাড়ী ভূতদের মানুষ বানিয়ে ছাড়ছে।

কনকবাবু উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ, এক শ বার তা স্বীকার করতে হয়। আগে মানুষ তৈরী করতে হবে; গান্ধীজী যে অহিংস সৈনিক চান, তা এখন দেশে নেই।

সুলেমান রাজা সহাস্যে বলেন,—তা কোনদিন সম্ভব হবে না মাষ্টার!

অহিংস সৈনিক ?—একজন লাঠি চালাবে—বুকে গুলি ছুঁড়বে, আর বুক পেতে দিয়ে মরতে হবে। এ কোনদিন সম্ভব নয়।

কনকবাবু বলেন,—না রাজাসাহেব! আপনার কথা মানতে পারলাম না। আমার মনে হয়, এরকম সৈনিক হাজারে হাজারে বেরিয়ে আসবে একদিন। হয়-তো সময় লাগবে।

সুলেমান রাজা বলেন,—সে তুমি কি করে বলছ মাষ্টার ?

কনকবাবু বলেন,—সেদিন যা দেখেছি, সুবথ আর নাসিরের মৃত্যুর দিনে যা দেখেছি রাজাসাহেব, তাতে মনে হয়, সেদিন নিশ্চয়ই আসবে।

হো-হো করে হেসে উঠে সুলেমান রাজা বললেন,—বাচ্ছা ছেলেরা হুজুগে মাতে মাষ্টার! ওদের কথা ছেড়ে দাও। সারা দেশটা তো আর ছেলেমানুষ হয়ে উঠবে না।

কনকবাবু উত্তর দেন,—হবে। ওই ছেলেমানুষদের মতই নির্মল হয়ে উঠবে দেশের মানুষ। সবাই না হোক, তেত্রিশ কোটির মাঝে ত্রিশ লাখ মানুষ নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে। সেই ত্রিশ লাখই দেশটা স্বাধীন করে তুলবে।

সুলেমান রাজা বলেন,—ঠিক বুঝতে পারছি না মাষ্টার! অহিংস যুদ্ধ? সে আবার কি রকম? দেশটা দখল করতে হবে তো? ইংরেজ কি তার কামান বন্দুক ছেড়ে ত্রিশ লাখ লোক দেখেই পালাবে ?

কনকবাবু বললেন,—হ্যাঁ। যেদিন ইংরেজ বুঝতে পারবে যে যাদের নিয়ে সে এদেশ শাসন করতে বসেছে, তাদের মধ্য থেকে ত্রিশ লাখ লোক বেঁকে দাঁড়িয়েছে, মৃত্যুভয়ও তারা করে না, সেদিনই এ দেশ ছেড়ে পালাবে তারা।

সুলেমান রাজা বললেন,—বেশ! তাই হোক্ মাষ্টার? তাই হোক্। কিন্তু এই স্কুল-কলেজের ছেলেরা কি করবে ?

কনকবাবু উত্তর দেন,—তাদের মানুষ হবার মন্ত্র দিতে হবে। লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কানে দিতে হবে অহিংস মন্ত্র; দেশের ডাকে যেন তারা প্রাণ দিতে পারে। আর কিছুই করতে হবে না; স্কুল-কলেজ ভেঙে দিতে হবে না।

সুলেমান রাজা ঘাড় নেড়ে সম্মতির সুরে বলেন,—হয়তো তোমার কথাই ঠিক মাষ্টার! কিন্তু এই আন্দোলনে যে কত লোক বেকার হয়ে পড়ল, মিছামিছি কতজনের চাকুরি গেল, তাদের কথা ভেবেছ কি?

কনকবাবু উত্তর দেন,—ঠিক পথে না চললে তাদের অনেকেই বিপদে পড়বে এটা ঠিক। চাকুরি তারা না পেতে পারে কিন্তু অন্য কাজ করলে হয়তো তাদের ভরণপোষণের অভাব হবে না।

সুলেমান রাজা বলেন,—হ্যাঁ, এই তো আমাদের রহমন দারোগা। ছেলেটার জন্যই বেচারীর সর্বনাশ হল। ছেলে তো গেলই, চাকুরিও খতম। পুলিস সাহেব ভালমানুষ, তিনি তাঁকে রাখতেই চেয়েছিলেন, এখনও তাঁকে ডাকছেন; কিন্তু কি যে একগুঁয়েমি, শুধু বলে আর গোলামি করব না।

কনকবাবু বলেন,—তিনি তো সর্বেশ্বরবাবুর কাছেই কাজ করছেন।

সুলেমান রাজা বলেন,—সে আবার কাজ? পাহাড়ীদের চরিয়ে বেড়াচ্ছে।

কনকবাবু সহাস্যে উত্তর দেন,—না। রহমন দারোগা ওদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন; নিজে চাষবাসও দেখছেন।

সুলেমান রাজা বলেন,—ছাই করছেন। রহমন আবার লেপাপড়া জানে নাকি? দু পাতা ইংরেজী জানে কি না সন্দেহ; দাপটের জোরে দারোগা বনে গেছে। চাষ-বাস করাই ওর যোগ্য কাজ।

কনকবাবু বলেন,—পুরনো লোক! লেখাপড়া কিছু জানেন বৈ কি?

সুলেমান রাজা বলেন,—জানে; ওই ক-এর পিঠে আ আর গ-এর পিঠে ই। যাক্, চাকুরির মত কি আর সুখ কোথাও আছে মাষ্টার? আমাদের কথা ছেড়ে দাও, লেখাপড়া শিখি নি, জমিদারিটাও রয়েছে। কিন্তু তোমাদের মত লোকের চাকুরি না থাকলে কি হবে বল তো?

কনকবাবু বলেন,—কি আর হত? একটা কিছু করে নিশ্চয়ই চলত।

সুলেমান রাজা বলেন,—ভদ্দরলোকের ছেলে হয়ে না হয় দাড়িপাল্লা ধরতে, না হয় শখের দোকানদারি করতে। এই তো? এত সম্মান পেতে কোথায়? তোমরা যদি লেখাপড়া না শিখতে, দেশের ছেলেগুলো গবেট গোমূর্খ হয়ে থাকত।

কনকবাবু হেসে হেসে উত্তর দেন,—না রাজাসাহেব আমরা গোলাম তৈরি করছি। মানুষ তৈরি করছি না।

সুলেমান রাজা বলেন,—আলবৎ করছ। লেখাপড়ার গুণ আছে মাষ্টার! লেখাপড়া শিখে মানুষ ভদ্র হচ্ছে, চোর-ডাকাত কমে যাচ্ছে। দেশের লোক বুঝতে শিখেছে।

কনকবাবু বললেন,—হ্যাঁ। তা হচ্ছে বটে।

সুলেমান রাজা বলেন,—কিন্তু মাষ্টার! তোমাদের ওই কৃষ্ণপ্রসাদ চায় না দেশের লোক লেখাপড়া শিখুক। সে বলে কিনা,—সব মাথায় উঠবে। ছোট-লোকেরা লেখাপড়া শিখে কাউকে আর মানবে না।

হো-হো করে হেসে উঠলেন সুলেমান রাজা।

সন্ধ্যা অভিমান করে। মণীশ সেই যে সকাল-সকাল বেরিয়ে যায়, কখন বাড়ি ফেরে তার ঠিক নেই। ছুটির দিনেও তাকে পাওয়া এখন কঠিন। সেদিন মণীশের শরীর ভাল ছিল না; কাঞ্চনগড়ে যেতে দেন নি পিসীমা। মণীশের গা-টা গরম হয়েছিল। সন্ধ্যা এসে ঘরে ঢুকে দেখে মণীশ শুয়ে আছে।

সন্ধ্যা বলে,—বেশ জব্দ হয়েছিস, না?

মণীশ হেসে জবাব দেয়,—তোমার অভিশাপে সন্ধ্যাদি!

সন্ধ্যাও হেসে হেসে জবাব দেয়,—অভিশাপ নয় রে, তুই যা হয়ে উঠেছিস, এ রকম জব্দ না হলে আমরা মারা যাই আর কি?

—কেন? কি হয়েছে সন্ধ্যাদি!

—কি হবে আবার? তোর তো টিকিটি দেখবারও জো নেই। একলাটি সারাদিন কাটাই কি করে?

—কেন? এখন তো বেশ বই পড়তে শিখে গেছ। বই পড়ে তো বেশ কাটাতে পার।

—বই পড়ে কি আর সারাদিন কাটানো যায় মণীশ! সব জায়গা তো বুঝে উঠতে পারি না। কে আর বুঝিয়ে দেবে বল?

—আমায় বললেই পার।

—তোমায় দেখতে পেলে তো? রাত দশটার আগে তো বাড়ি ফের না। আচ্ছা বল্ দেখি মণীশ! সারাদিন ওখানে কি করিস?

—কি আবার করব? স্কুল আছে না?

—স্কুল বসে এগারোটায়। ন-টার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়িস, আর ছুটি হয় চারটেয়।

—সর্বেশ্বর বাবুর ওখানে বাকী সময়টা কাটাই সন্ধ্যাদি!

—জানি রে, সবই জানি। কিন্তু পরীক্ষাটা দিবি কি করে বল?

মণীশ একটু ভেবে বললে,—ঠিক কথা সন্ধ্যাদি! কিছুই ঠিক করতে পারছি না। কিন্তু আমার মনে হয় সন্ধ্যাদি, সর্বেশ্বরবাবুর ওখানে যা দেখছি আর যা শিখছি, দশ বছর বই পড়লেও সে জিনিস শেখা যায় না।

সন্ধ্যা গম্ভীর হয়ে বললে,—তা বুঝি। কিন্তু তুই-ই বলেছিস, পরীক্ষার পড়ার ক্ষতি হয় তাতে।

মণীশ বললে,—হোক্ না ক্ষতি সন্ধ্যাদি! মানুষ হওয়াটাই বড়।

সন্ধ্যা বলে,—ওঁরা নাকি খ্রীষ্টান? ওঁর মেয়ে নাকি ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়?

মণীশ হেসে বললে,—ওঁরা খ্রীষ্টান কিনা জানি নে। তবে আমার কি মনে হয় সন্ধ্যাদি জান? সর্বেশ্বরবাবু একজন ঋষি।

—ঋষি?—বিস্ময়ভরা সন্ধ্যার কণ্ঠ।

—হ্যাঁ সন্ধ্যাদি! এ রকম মানুষ দেখা যায় না। কি না করছেন তিনি? ঋষি না হলে এমন বুনো মানুষগুলোকে নিয়ে মানুষ-গড়ার কাজে লাগতে পারতেন না।

—মানুষ গড়ে তুলছেন?

—হ্যাঁ সন্ধ্যাদি! তোমায় তো অনেকদিন তাঁর কথা বলেছি। বোঝো দেখি, এ দেশের মানুষ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। ইচ্ছা করলে তিনি বড়লোকের মত দিন কাটাতে পারতেন, কিন্তু এখানে পড়ে আছেন কেন?

—তুই বুঝবি না মণীশ! ওঁরা খ্রীষ্টান, দেশের লোককে খ্রীষ্টান বানাতে চায়। তুই কিংবা আমি, ভদ্র ঘরের কেউ তো আর খ্রীষ্টান হবে না, তাই পাহাড়ীদের আর ছোটলোকদের নিয়ে পড়েছে।

—কে এ সব কথা তোমায় বলেছে সন্ধ্যাদি?

—কেন বাবাই বলেছেন। জমিদার-বাড়িতে কথা উঠেছে।

মণীশ উচ্চ হাস্যে বললে,—তাঁরা তাঁদের নিজেদের কথাই বলেছেন সন্ধ্যাদি। তাঁরা মানুষকে ছোট করে রাখতে চান, তা না হলে জমিদারি আর লোকের উপরে খবরদারি চলবে কেন? তাদের আইনেই একদল মানুষ চিরদিন ছোট হয়ে থাকবে? বিধবারা মাছ-মাংস খাবে না; আমরণ হা-পিত্যেশ করে স্বর্গের সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকবে।

কথাটা বলেই মণীশ যেন হকচকিয়ে উঠল। সন্ধ্যা মাথাটা নীচু করে নিলে। তার পর সন্ধ্যা ধীরে ধীরে বললে,—যার যা অদৃষ্টে আছে, কপালের লিখন কি খণ্ডানো যায় রে?

মণীশ বললে,—সবই অদৃষ্ট নয় সন্ধ্যাদি! অদৃষ্টের কতকটা মানুষ নিজেই সৃষ্টি করেছে।

সন্ধ্যা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। মণীশ বলে, আমরা কতটুকু জানি সন্ধ্যাদি! আমাদের আগলে রেখেছে আমাদের বাপ-মা, আমাদের সমাজ আর আমাদের গাঁ; তার পর আমাদের আশেপাশের মানুষ। বাইরের কোন খবরই আমরা রাখি না। কোন রকমে ভাতকাপড় জুটলেই আমরা জীবনটাকে সার্থক মনে করি।

সন্ধ্যা বলে,—আর কি চাই মণীশ?

মণীশ বলে,—চাই না? জগৎটাকে জানতে হবে, দেখতে হবে। হিমালয়ের চূড়ায় উঠে দেখতে হবে, কি আছে সেখানে? দেখতে পাচ্ছ না সন্ধ্যাদি, ইংরেজ কি করছে? দেশ-বিদেশে পাহাড়ে জঙ্গলে আঁতিপাতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছে,—কোথায় কি আছে তারা পরখ করে দেখতে চায়। আকাশে উড়ে দেখছে তারা! ভয় নেই, ডর নেই; এক জন পড়ে মরছে, তার পিছু পিছু আবার দশ জন এগিয়ে যাচ্ছে।

সন্ধ্যা হেসে হেসে বলে, তুই আজকাল বেশ বক্তৃতা দিতে শিখেছিস মণীশ! এত কথা তুই শিখলি কি করে?

মণীশ বলে,—আরও কত শেখবার আছে সন্ধ্যাদি! সে সুযোগ হয়তো পাব না; বাঁচতে হলে, মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচতে হবে।

সন্ধ্যা বলে,—ভাল তো, লেখাপড়া শিখে তুই হাকিম হবি, জজ হবি, ভাল চাকরি করবি।

মণীশ উত্তর দেয়—চাকরিই সব চেয়ে বড় কথা নয় সন্ধ্যাদি! চাকরির দিকে তাকালে মানুষ হওয়া যায় না; এমন একটা কিছু করতে হবে, যাতে দেশের লোকের উপকার হয়, দশ জনে নামটা জানে।

সন্ধ্যা বলে,—তাই হবে মণীশ! আমাদের কথা কি তোর তখন মনে থাকবে। সেদিন সুরুচি বলছিল, তুই তাদের কথা একদম ভুলে গেছিস। সুনন্দা তো অভিমান করে আব তোদের বাড়ি আসেই না।

মণীশ বলে,—তোমাদের ভুলতে পারব না সন্ধ্যাদি! তোমাদের আগল ভেঙে দেবার জন্যই আমাকে কাজে নামতে হবে।

—কি বলছিস বুঝতে পারছি না।

—না, তুমি বুঝতে পারবে না সন্ধ্যাদি! আমাদের দেশের মেয়েদের জীবন আমরা ব্যর্থ করে দিচ্ছি; তাদের নিয়ে আমরা ছিনিমিনি খেলছি।

—মণীশ! গম্ভীর হয়ে ওঠে সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর।

—কি বলছ সন্ধ্যাদি! আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ না? এই ধর না তোমার এই সারাজীবন কি করে কাটবে? রাঙ্গাপিসীর মত? আমরণ একাদশী করে আর ভাই-ভাইপোর সংসারে ঝি-গিরি করে? তোমার তো তাও নেই সন্ধ্যাদি!

—ভগবান আছেন মণীশ!

—না, ভগবান নেই। ভগবান এ রকম জীবন কাটাতে কাউকে বলেন নি। সাহেবদের কথা ভেবে দেখ দেখি।

—কি ভেবে দেখব রে? তাদের ধর্ম আলাদা।

—আলাদা ? না, সন্ধ্যাদি। ধর্ম সবই এক। মানুষ নিজের স্বার্থের জন্যে কতকগুলি নিয়ম বেঁধেছে, সেগুলো ধর্ম নয়।

ম্লানহাসি দেখা দেয় সন্ধ্যার মুখে,—মণীশ! নিয়ম না মানলে সমাজ চলতে পারে না। আর যা খুশি করে গেলে অনাচারে অশান্তি বাড়বে, তা কি বুঝিস না?

মণীশ বলে,—তুমিও দেখছি বেশ তর্ক করতে শিখে গেছ সন্ধ্যাদি!

সন্ধ্যা হাসিমুখে জবাব দেয়,—হ্যাঁ, তোর কাছেই তোর কথায়ই তর্ক করছি মণীশ। তোর দেওয়া বইগুলি না পড়লে, তোর কাছে না এলেই আমার ভাল ছিল।

সন্ধ্যার মুখে ম্লান ছায়া দেখা দেয়। মণীশ তা লক্ষ্য করে বলে,—সন্ধ্যাদি! আলোর সন্ধান পেলে কে অন্ধকারে থাকতে চায়? ইংরেজেরা নূতন করে আলোর সন্ধান দিয়েছে। এ দেশের লোক সে আলোব পরশ পেয়ে উন্মাদনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বড় ভুল করেছে ইংরেজ। আর তাই বা বলি কেন, মাষ্টারমশাই বলেন—আলোর স্রোত কেউ রোধ করতে পারবে না; গুহা-গহ্বরেও আলোর স্রোত বয়ে যাবে। গুহা-গহ্বরের মানুষও একদিন জেগে উঠবে সন্ধ্যাদি! তোমার সমাজের বাঁধন, সমাজের শাসন থাকবে না। কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী আর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কথা কেউ শুনবে না।

সন্ধ্যা বলে,—সেদিন আসতে অনেক দেরি মণীশ!

মণীশ বলে,—দেরি নেই সন্ধ্যাদি! সুরু হয়ে গেছে তা কবে। বড় বড় শহরে সে স্রোত বইছে; এখন গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় তার ঢেউ এসে লাগছে। তুমি তৈরী হও সন্ধ্যাদি! তোমারও কাজ আছে।

সন্ধ্যা বলে,—আমারও কাজ আছে?

মণীশ বলে,—হ্যাঁ সন্ধ্যাদি! জান সুজাতাকে দেখে আমার মনে হল, ওর মত মেয়েই এখন দরকার। শুধু হেঁসেল আগলে আর অন্দরে বন্ধ থাকলে চলবে না। তোমাদেরও কাজ আছে।

সন্ধ্যা হাসিমুখে জবাব দেয়,—সুজাতার কথা আলাদা মণীশ! ওরা যে ভিন্ন জাতের মানুষ রে।

না। সব মেয়েই একজাতের সন্ধ্যাদি!—দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় মণীশ।

মণীশকে বাধা দিয়ে সন্ধ্যা বলে,—তুই বিশ্রাম কর মণীশ! তোর কথাই মানলাম। মণীশ বিছানায় শুয়ে পড়ে, সন্ধ্যা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

এরই মধ্যে নানা কথা উঠেছে।

সর্বেশ্বরের আশ্রমে যাতায়াতটা কেউ ভাল চোখে দেখে না। ফুলছড়ির কর্তা-ব্যক্তিরা ফোঁস-ফোঁস করতে থাকেন। জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদ তো স্পষ্টই শাসিয়েছেন,—তিনি বেঁচে থাকতে এমন অনাচার চলবে না। মণীশই যেন সবচেয়ে বেশী অপরাধী। কৃষ্ণপ্রসাদ বলেন,—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে হয়ে জাত-ধর্ম দিতে বসেছে ছেলেটা। আগেই মানা করেছিলাম ওই ইংরেজী স্কুলে পাঠাতে; তা শোনে নি কেউ। বাপের ব্যবসা শিখলেই পারত।

বৈঠকখানায় বসে আছেন কৃষ্ণপ্রসাদ, রুপোর গড়গড়ায় সোনালী জরিতে মোড়া নলটায় ঘন ঘন টান দিচ্ছেন, আর অম্বুরী তামাকের সুগন্ধি ধোঁয়া ছাড়ছেন। বিশাল বপুটা তাকিয়ায় হেলান দেওয়া; গায়ে আদ্দির একটা ধবধবে জামা। জামা ঠেলে ভুঁড়িটা কেঁপে কেঁপে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। পাকানো কাঁচা-পাকা গোঁফ যেন ভ্রূকুটি করছে; মাথার মাঝখানটায় টাক। গায়ের রঙটা গৌর হলেও, তাতে এক রকম লাল আভা আছে।

জমিদারের মতই চেহারা বটে! কৃষ্ণপ্রসাদের মুখের দিকে তাকাতে সাধারণ লোকেরা সাহসই করে না। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে অর্থাৎ দায়ে না ঠেকলে দু-চার জন ছাড়া গাঁয়ের মাতব্বর লোকও তাঁর সামনে আসতে সাহস করে না।

সেই কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী ক্ষেপে উঠেছেন। প্রসন্ন তর্করত্নকে শুনিয়ে শুনিয়ে যেন আপন মনেই বলছেন,—কোন ধর্মই নেই লোকটার। খ্রীষ্টান হলেও আপত্তি ছিল না। কোথাকার কে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তার উপর আবার রাজদ্রোহী। বকাটে শম্ভুনাথটাও আবার উত্ত্যক্ত করে তুলেছে। বাঁচা গিয়েছিল, চলে গিয়েছিল শহরে। মামার অন্ন ধ্বংস করলি, এখন স্বদেশী ভূত চেপেছে ঘাড়ে। নিজের মা খেতে পায় না, বাবু এখন ঘরে ঘরে চরকা চালাবেন। দেশটা উচ্ছন্নে যাবে!

তর্করত্নও একপাশে বসে হুঁকো টানছিলেন। জমিদারের খাস বেয়ারা দুলাল-চাঁদ দাঁড়িয়েছিল তর্করত্নের পাশে। তর্করত্ন যেন মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কৃষ্ণপ্রসাদের কথায় সায় দিচ্ছিলেন। তর্করত্ন সকাল-সন্ধ্যে দু বেলা হাজিরা দেন জমিদারের সভায়। জমিদারের গুরু-বংশের প্রদীপ এই প্রসন্ন তর্করত্ন। তর্করত্ন বলে থাকেন—নাঃ, জমিদার বটে কৃষ্ণপ্রসাদ! দেব-দ্বিজে ভক্তি আছে; তাঁর জন্যই এখনও হিন্দু ধর্মটা টিকে আছে।

কৃষ্ণপ্রসাদ বলেন,—সুলেমান রাজাই সর্বেশ্বর মাষ্টারকে প্রশ্রয় দিয়েছে পণ্ডিত-কাকা! তাই তো লোকটা মাথায় উঠেছে। এতদিন পাহাড়ীদের নিয়েই ছিল; বেশ ছিল। এখন দেখছি, ভদ্রলোকের ছেলেদেরও মাথা খাবে।

পণ্ডিতকাকা অর্থাৎ তর্করত্ন বললেন,—দেখো বাবা কেষ্টপ্রসাদ! আমি আগেই বলেছিলাম, এখানে হাইস্কুল-টাইস্কুল করে লাভ কি? শুনলে কই? ওই সর্বেশ্বর মাষ্টারই যত নষ্টের গোড়া। সুলেমান রাজা তো ওর বুদ্ধিতে চলে। এখন বুঝলে তো? যত সব ছোট লোকের মরণ আর কি? ইংরেজী বিদ্যা ঢুকেছে, আর জাত ধর্ম থাকবে না। ছোট বড় ভেদাভেদ আর রইল কই? তুমি যদি তখন বাধা দিতে বাবা!

দুলালচাঁদ বললে,—উচিত কথাই কইছেন কর্তা ঠাকুর! সবই একাকার অইয়া যাইব। খুরওয়ালা জুতা পইর‍্যা মা সরস্বতী আমাগোর অন্দরমহলে ঢুইক্‌বা আর কি? হুঁ!

তর্করত্ন বললেন,—ঠিক কথা বলেছ দুলালচাঁদ! ইংরেজী বিদ্যা কি আর পাড়াগাঁয়ে সয়? সর্ব মাষ্টারের সঙ্গে আবার রহমন দারোগা যোগ দিয়েছে। আমাদের শম্ভু ছোঁড়াটাও ঘুর ঘুর করছে ওর ওখানে।

কৃষ্ণপ্রসাদ বলেন,—তাই তো ভাবছি, কি করা যায়? সর্বেশ্বর আবার ছেলেগুলোকে বশ করে ফেলেছে।

তর্করত্ন বললেন,—বেটা ম্লেচ্ছ। আকাট ম্লেচ্ছ। না হিন্দু, না মুসলমান। খ্রীষ্টানও নয়। শুনছি, যীশুর সঙ্গে সে এক আসনে বসিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূজো করে। মেরী আর দুর্গার মূর্তি রাখে পাশাপাশি। ঘোর কলি বাবা! ঘোর

কলি ! ঠাকুর-দেবতারও জাত মারলে তোমার সর্ব মাষ্টার।

তর্করত্ন ঘন ঘন হুঁকোয় দম দিচ্ছেন। কিন্তু কলকের আগুন যে নিভে গেছে সে দিকে খেয়ালই নেই। দুলালচাঁদ কল্‌কেটার ওপর দু-এক বার ফুঁ দিয়ে বললে,—আগুনটা নিভ্যা গেছে কর্তাঠাকুর ! জোর টান লাগান।

তর্করত্ন দু-একটা টান দিয়ে বললেন,—যাঃ ! সব মাটি হয়ে গেল দুলাল। হরেকে কল্‌কেটা বদলে দিতে বল। তর্করত্ন হুঁকোটা দুলালচাঁদের হাতে দিলেন।

হরে ওরফে হরিরামকে দু-এক বার ডাকতেই হরিরাম কলকেটা নিয়ে গেল। তার পর দুলালচাঁদ হাতমুখ নেড়ে বলতে লাগল,—হুঁ কর্তা ! হেই কথাই বইলছি আমি একদিন গেছলাম সর্ব মাষ্টারেব আশ্রমে। নিজর চোখে দেইখ্যা আইছি—যত সব খিরিস্তানী কাণ্ড ! সব এক কইর‍্যা দিছে কর্তাঠাকুর। সব এক কইর‍্যা দিছে। আমাগোর বাবা মহাদেবের ছবির সঙ্গে যীশুর ছবি বওয়াইছে একটা বেদীর উপর। হুঁ, এ আবার পূজা ?

তর্করত্ন তাচ্ছিল্যের সুরে বলে উঠেন,—পূজো করে সর্ব মাষ্টার ?

হাঃ-হাঃ-হাঃ—বিদ্রূপের হাসি। তার পর বলেন,—সর্ব মাষ্টার বামুন হয়ে গেছে নাকি ? গলায় পৈতে ঝুলিয়েছে বুঝি ?

হুঁকোটা হাতে তুলে দিয়ে যায় হরিরাম। বার দু-তিন হুঁকোয় জোর দম দিয়ে ধোঁয়া ছাড়েন বৃদ্ধ প্রসন্ন তর্করত্ন।

দুলালচাঁদ বলে, হুঁ ! যা বইলছেন কর্তাঠাকুর ! এ আবার পূজো ? কিছু নয়, সব ভেলকি ! সব ভেলকি ! চোখ দুইটা বুইজ্যা চুপ কইর‍্যা থাকে কিছুক্ষণ। তার পর পাহাড়ীদের কি যে আবোল-তাবোল বুঝায় বুইঝ্যা উইঠ্‌তে পাইরলাম না। হুঁ ! ধিঙ্গি মাইয়াটার আবার কি না চটক। হুঁ !

তর্করত্ন বলেন,—তুমি নিজের চোখে দেখেছ দুলাল ? কি হয় সেখানে।

দুলালচাঁদ বলে,—হুঁ ! আমার মাথা আর মুণ্ডু কর্তাঠাকুর ! মাইয়াটা পেরসাদ বিলি করে।

বিস্মিত তর্করত্ন চোখ দুটো বড় বড় করে প্রশ্ন করেন,—কি বললে প্রসাদ বিলোয় ? প্রসাদ ?

দুলালচাঁদ জবাব দেয়—হাঁ কর্তাঠাকুর পেরসাদ দেয়।

তর্করত্ন উত্তেজিত কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করেন—প্রসাদ বিলি করে সর্বেশ্বরের মেয়েটা, আর সবাই তা খায় ?

দুলালচাঁদ বলে,—তবে আর বইলছি কি কর্তাঠাকুর! পেরসাদ বিলির সময় কাড়াকাড়ি লেগে যায় সব ছোঁড়াদের মইধ্যে। সে কি ঢলাঢলি কর্তাঠাকুর! যদি একবার দেইখতে ?

তর্করত্ন বলেন,—আরে রাম! তা হলে ফাঁদ পেতেছে বল। কি সর্বনাশ, জাতি ধর্ম আর রইল না। আমাদের মহাদেব নাকি স্তবস্তুতি করছেন যীশুখ্রীষ্টকে, এমন একটা ছবি বানিয়ে রেখেছে ওঁর পূজার ঘরে শুনলে কেষ্টপ্রসাদ!

কৃষ্ণপ্রসাদ গম্ভীর ভাবে বলেন,—তার যা খুশি করুক তাতে কোন ক্ষতি নেই পণ্ডিতকাকা! কিন্তু ভদ্রপাড়ায় হাত বাড়িয়েছে সর্বেশ্বর মাষ্টার। এ আমি হতে দেব না।

তর্করত্ন বললেন—কি বললে বাবা! যা খুশি করবে? আমাদের ঠাকুর-দেবতাদেরও জাত মারবে সর্ব মাষ্টার।

দুলালচাঁদ বলে,—মাইরবার আর বাকি কি আছে কর্তাঠাকুর! মাইর‍্যা দিছে। আমাগোর ঠাকুরদেবতার জাত মাইর‍্যা দিয়েছে ঐ সর্ব মাষ্টার। ইস্কুলের ছেলেগুলো তো এক-একটা আস্ত কালাপাহাড় অইছে। কামিনী কবিরাজের পুলা ওই মণীশটা তো রাতদিন ঐখানে পইড়্যা আছে। হুঁ!

তর্করত্ন বলেন,—এর একটা বিহিত কর কেষ্টপ্রসাদ!

দুলালচাঁদ বলে—যত সব খিরিস্তানী কাণ্ড! হুঁ।

তর্করত্ন বলেন,—চারপো কলির তিনপো হয়ে এসেছে বাবা কেষ্টপ্রসাদ! আগে তবু সামলে সুমলে চলে যাচ্ছিল। এখন তোমার এই স্বদেশী ভূত আর টিকতে দেবে না। বাকি একপো পূর্ণ হয় আর কি ?

কৃষ্ণপ্রসাদ উত্তর দিলেন,—আমি একা আর কতদূর সামলাব বলুন। আমাদের নিজের ছেলেরাই অবাধ্য হয়ে উঠেছে। ওদিকে সুলেমান রাজা রয়েছে। সে-ই যত নষ্টের গোড়া। গনি রাজা তো জেলে পচে মরছে। তবুও তার আক্কেল হল না।

তর্করত্ন বললেন,—আমাদের ধর্ম গেলে ওদের কি ক্ষতি বাবা! ওদের ধর্ম তো আর যাবার নয়।

হঠাৎ কোথা থেকে শম্ভুনাথ এসে আলোচনায় বাধা জন্মাল। তাকে দেখে কৃষ্ণপ্রসাদের মুখের ভাব আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। ছেলেটির ধৃষ্টতায় কৃষ্ণপ্রসাদ অস্থির হয়ে উঠেছেন।

বকাটে বেকার শম্ভুনাথ। লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা। লম্বা লম্বা কথা বলে। এতদিন পাড়ার বউ-ঝিকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তার পর বাঁচা গিয়েছিল কিছুদিন। শম্ভুনাথ চাকরির খোঁজে গিয়েছিল। কিন্তু ফিরে এল স্বদেশীর পাণ্ডা হয়ে। মাতব্বর বনে গেছে শম্ভুনাথ; স্বদেশী করে বেড়ায়। যত সব হুজুগ!

কৃষ্ণপ্রসাদ শম্ভুনাথের কথাই ভাবছিলেন। তর্করত্নের কথাটা বোধ হয় শম্ভুনাথের কানে গিয়েছিল। শম্ভু বলেন,—কাদের ধর্ম যাচ্ছে পণ্ডিতমশাই। আমাদের আবার ধর্ম আছে না কি? পরাধীন যারা তাদের আবার ধর্ম কী।

দুলালচাঁদ বলে,—হুঁ! একটা কথার মত কথা কইছ শম্ভুভাই! আমাগোর আর ধর্ম রইল কই! আংরেজী বিদ্যা আর স্বদেশী ভূত আমাগোর ধর্মর গলা টিপ্যা মাইরছে।

শম্ভুনাথ সহাস্যে উত্তর দেয়,—তোমার গলাটা তো ঠিক আছে দুলালদা!

দুলালচাঁদ বিদ্রূপটা হজম করে নিয়ে বলে,—তোমরা থাইকতে আমার আর ভয়টা কি ভাই!

তার পর শম্ভুনাথ কৃষ্ণপ্রসাদকে বললে,—আপনাকে একটা কথা জানাতে এসেছি জেঠামশাই, আমরা সদর থেকে ঘরে ঘরে চরকা বিলি করছি। তাতে আপনার কেন যে আপত্তি বুঝতে পারি নে।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—আপত্তি? আমার আপত্তি থাকবে কেন? তবে বুঝলে বাবা! রাজত্বটা তো আমার নয়; যাদের রাজত্ব তারা যেটা সুনজরে দেখে না, সেটা করতে আমি দিই কি করে?

শম্ভুনাথ বলে,—কাদের কথা বলছেন, জেঠামশাই! ইংরেজদের তো? তাদের আপত্তি শুনছে কে? আমরা চরকায় সুতো কাটব, সেই সুতোয় তৈরী কাপড়

পরব। তাতে তাদের আপত্তিই বা থাকবে কেন?

কৃষ্ণপ্রসাদ বিদ্রূপের সুরে বলেন,—আরে বাবা! কাট না যত পার সুতো। কিন্তু তোমরা লোককে হুজুগে মাতিয়ে তুলছ কেন? বলি সবাই যদি সুতো কাটতে লেগে যায়, তবে মাঠে লাঙল দেবে কে? মা-মাসীরা যদি চরকা নিয়ে বসে থাকে, হেঁসেলে ঢুকবে কে বাবা? এই করে কি দেশের উন্নতি হবে?

শম্ভুনাথ উত্তর দেয়,—নিশ্চয়ই হবে। সব কাজই চলবে শুধু অবসর সময় সুতো কাটবে। গাঁয়ের লোক তো সারাদিনই বসে কাটায়। কাজ করলে কুঁড়েমিও কাটবে, পরনিন্দা-পরচর্চা নিয়ে আর থাকবে না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। দেশটাও স্বাধীন হবে।

কৃষ্ণপ্রসাদ শম্ভুনাথের হাবভাব ও কথাবার্তা শুনে স্তম্ভিত হন।—বলে কি! দেশ স্বাধীন হবে। আচ্ছা, তাহলে রাজা হবে কে? কে হবে দিল্লীর বাদশা? আকাশ-পাতাল ভাবেন কৃষ্ণপ্রসাদ।

তাঁকে গ্রাম-সম্পর্কে, তা গ্রাম-সম্পর্কে কেন, কিছুটা রক্তের সম্পর্কেই জেঠামশাই বলে ডাকে শম্ভুনাথ। বাপ তো সম্পত্তিটা উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে নবাবি করে। তবুও লোকটা ভালই ছিল, আর এই শম্ভুনাথ! বাপের ঠিক উল্টো! কাউকে গ্রাহ্যই করে না। লেখাপড়া হয় নি। গুণ্ডামি করেই বেড়াত। সেদিনের ছেলে শম্ভুনাথ যে হঠাৎ এমন লায়েক হয়ে উঠবে, কৃষ্ণপ্রসাদ তা স্বপ্নেও ভাবেন নি।

তবুও আজকালকার ছেলে। ইংরেজের গোলাগুলির সামনে বুক উঁচিয়ে দাঁড়ায়। এদের একটু এড়িয়েই চলতে হয়; যা গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলেগুলো।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—বেশ তো বাবা! তোমাদের যা খুশি কর। রাসু বামনী, পদ্মপিসী যে চিরকাল চরকায় সুতো কেটে আসছেন, কেউ তো কোন আপত্তি করছে না।

শম্ভুনাথ বললে,—এখন সকলকেই সুতো কাটতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখতে হবে। ঘরে ভাত আছে, ঘরে কাপড় হবে। বিলাতী কাপড় অচল করে তুলব আমরা।

কৃষ্ণপ্রসাদ বলেন,—সে তো চিরদিনই হয়ে আসছে বাবা! আমাদের যুগী, তাঁতী আর জোলারা তো আর মরে যায় নি। তারা আর কত কাপড় যোগাবে বল? সকলেই এখন বাবু সাজতে চায়। দশ হাত চুয়াল্লিশ-পঞ্চাশ-বাহান্নতেও বাবুদের কুলোয় না। তারা আবার খদ্দর পরবে? দিক দেখি, সাহেবরা কাপড় বন্ধ করে। কি হবে তখন ভেবে দেখেছ কি?

দুলালচাঁদ বললে,—হুঁ! হেই কথা ভাইব্যা কথা কও শম্ভুভাই। দিক্ দেখি,—সাহেবরা কাপড় বন্ধ করে। সক্কলে একদিনে বে-বস্ত্র অইয়্যা যাইমু না?

কৃষ্ণপ্রসাদের মুখে ক্রূর হাসি ফুটে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন,—দু দিনের শখ, দু দিনেই মিটে যাবে বাবা। বেশ ছিলে শহরে। মামাদের ধরে করে চাকরি-বাকরি বাগিয়ে নাও গে। তারা যা হোক একটা কিছু জুটিয়ে দিতে পারবে। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে এমন ফ্যা-ফ্যা করে কদিন ঘুরে বেড়াবে! তোমার মায়ের কথা ভেবে দেখেছ কি?

দুলালচাঁদ বললে,—সইত্যি কথা শম্ভুভাই! বেগার খাইট্টা পরাণটা দিলে। নিজর কিছুই কইরলা না।

তর্করত্ন এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। শম্ভুকে তিনি ভয় করেই চলেন। কি জানি গোঁয়ার ছেলেটা আবার কি করে বসে! এই তো সেদিন তাঁর গলা থেকে উড়ুনিটা কেড়ে নিয়ে গিয়ে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। আর বলেছিল,—ওটা বিলাতী কাপড় পণ্ডিতমশাই! মদন তাঁতীকে বলব একটা উড়ুনি আপনাকে বুনে দেবে। গুণ্ডার সর্দার এই ছেলেটা।

তর্করত্ন বলেন,—বাবা শম্ভু! তুমি তো সদ্‌বংশের ছেলে বাবা! রাতদিন হুজুগেই মেতে আছ। দীননাথদার ছেলে কি না! তোমার বাবা তো পরের জন্যেই জীবনটা দিলেন। আর তুমি—।

শম্ভুনাথ বাধা দিয়া বললে,—আমার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। দেশ উদ্ধার হলে সবই হবে। আপনার বাড়িতেও একটা চরকা দিয়ে এসেছি।

তর্করত্ন যেন আঁতকে উঠলেন,—অ্যাঁঃ! বল কি? আমার বাড়িতে চরকা কাটবে কে?

শম্ভু বললে,—কেন? সন্ধ্যা কাটবে।

শম্ভুর কথায় তর্করত্নের যেন মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি বললেন,—সে কি আর পারবে বাবা? কে শিখিয়ে দেবে তাকে? হতভাগী মেয়েটা কপাল পুড়িয়ে এসে আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে। কি আর করব? কাশী কিংবা নবদ্বীপে পাঠিয়ে দেব মনে করছি।—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন বৃদ্ধ প্রসন্ন তর্করত্ন।

শম্ভুনাথ বললে,—মেয়েটার জীবন তো আপনিই পুড়িয়ে দিয়েছেন পণ্ডিত মশাই! এখন দুঃখ করলে কি হবে? এগারো বছরের মেয়ের সঙ্গে একটা পঞ্চাশ বছর বয়সের মাতাল বুড়োকে জুটিয়ে দিলেন।

দুলালচাঁদ বললে,—হুঁ! অদ্দিষ্টের লিখন ভায়া! অদ্দিষ্টের লিখন! কুল রাইখতে অইলে বছর রাইখবা ক্যামনে! ঠিকই কয় গোকুলঠাকুর—কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে।

শম্ভুনাথ বললে,—তারও ব্যবস্থা করব আমরা। সন্ধ্যা ভাল সুতো কাটতে পারে। কাঞ্চনগড়ে তাকে ট্রেনিং দিয়ে কাজে লাগিয়ে দেব। এরকম মেয়েদেরই আমাদের দরকার।

তর্করত্ন মনে মনে প্রমাদ গুণলেন।—কি বলে ছোঁড়াটা! সর্বনাশ হবে। কুলে কালি পড়বে। একে তো যুবতী বিধবা মেয়েকে সামলে রাখা দায়। তার উপর সন্ধ্যা রূপসী। শম্ভুর মত ছেলেরা যদি পিছু লাগে, তা হলে সোনায় সোহাগা হবে।

তর্করত্ন অসহায়ের মত বলেন,—না বাবা শম্ভু! কাজ কি এসব ঝঞ্ঝাটে গিয়ে! বামুনের ঘরের বিধবা মেয়ে, একাদশী করবে, ঠাকুর-দেবতার নাম করবে। পরকালটা তো আছে। আর তোমার দিদিমাকে তো জানই।

মৃদু হাস্যে শম্ভুনাথ উত্তর দেয়,—জানি বৈ কি! তাঁকে বুঝিয়ে বলেছি। তিনি তো রাজী হয়েছেন।

তর্করত্ন বললেন,—রাজী হয়েছে সন্ধ্যার মা?

শম্ভুনাথ জবাব দেয়,—হ্যাঁ, এই তো আমি সন্ধ্যাকে চরকা দিয়ে দু-দশ মিনিট সুতো কাটা শিখিয়ে এসেছি। বেশ শিখে গেছে।

শম্ভুনাথের কথা শুনে তর্করত্ন মাথা চুলকোতে লাগলেন। দুলালচাঁদ বললে—পাইরব না ক্যানে কর্তাঠাকুর! আমার দিদি ঠাউকরাইন যে সাক্ষ্যাৎ দুগ্‌গা পির্‌তিমা!

তর্করত্ন চুপ করে থাকেন। এগারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল সন্ধ্যার। বিয়ের পাঁচ-সাত মাসের মধ্যেই বিধবা হয়ে ফিরে এল সে। বয়স তার বাড়ছে। ষোল সতেরো হবে। এরকম মেয়েকে সামলে রাখা যে কি দায়, তা ঐ চ্যাংড়া ছোঁড়া কি বুঝবে? রাহুর মত ঘুরঘুর করছে ছোঁড়ারা। এমন কি তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলেরা পর্যন্ত তর্করত্ন গৃহিণীর মতে রাহুর পর্যায়ে পড়ে।

তর্করত্ন ভাবেন,—গিন্নী রাজী হয়ে গেল! রাজী হয়ে গেল সন্ধ্যার মা! বুড়ো বয়সে মতিভ্রম হল! শাস্ত্রে বলে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী!

শম্ভুনাথ বলে,—মিছামিছি ভাবছেন পণ্ডিত মশাই। ভালই হল। একটা কাজ নিয়ে থাকলে বরং ভালই হবে। লেখাপড়াও শিখবে; গাঁয়ে গাঁয়ে আমাদের সেণ্টার খোলা হবে। মেয়েদের জন্যে মেয়ে টীচার দরকার। সন্ধ্যার মত মেয়ে কাজ গুছিয়ে নিতে পারবে।

তর্করত্ন বললেন—গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াবে সন্ধ্যা? মাষ্টারনী সাজবে? কি বলছ শম্ভু? আমার মেয়ে খ্রীষ্টান হবে?

শম্ভুনাথ বলে—খ্রীষ্টান হতে যাবে কেন? দেশের কাজ করবে, দশের সেবা করবে। এ একটা মহৎ কাজ।

তর্করত্ন বললেন,—এরকম কাজের লোকের তো অভাব নেই শম্ভু! এ গরীব ব্রাহ্মণের বিধবা মেয়েকে নিয়ে টানাটানি কেন? সর্বনাশ হবে।

তর্করত্ন ভয়ে কিংবা রাগে কাঁপতে লাগলেন বোঝা গেল না। দুলালচাঁদ হাঁক দিলে—হরে! ওরে হরে! কল্কে পালটে দিয়ে যা।

তার পর দুলালচাঁদ বললে—সইত্যি কথা শম্ভুভাই! বেরাম্‌ভনের বিধবাকে নিয়ে টানাটানি কেন? শহর থাইক্যা খিরিস্তান মাগী-টাগী যোগাড় কইর্যা লও। নিজের ঘরের মাইয়্যাদের নিয়ে টানাটানি কইরবার দরকারটা কি?

তর্করত্ন বললেন,—তাই কর বাবা শম্ভু! তাই কর।

কৃষ্ণপ্রসাদ এতক্ষণে মুখ খুললেন, বললেন,—দেখ শম্ভু! আমি তোমার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে অনেক সহ্য করেছি। দীননাথদার কথাও আমার মনে আছে। তুমি ঘরের ছেলে, তোমার শত দোষও আমাদের মার্জনা করতে হবে। কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে।

শম্ভুনাথ বললে,—আমি তো কোন খারাপ কাজ করছি না জেঠামশাই।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—খারাপ কাজ বলব কেন? কিন্তু যা করছ তার পরিণাম ভেবেছ কি? স্কুলের ছেলেদের ক্ষেপিয়ে দিলে। দুটি বাচ্চা ছেলে প্রাণ দিল পুলিশের হাতে। এখন এসেছ ঘরের বউ-ঝিকে ক্ষেপিয়ে বের করবার মতলবে। এটা কি ভাল কাজ?

শম্ভুনাথ বললে,—আপনি ভুল বুঝেছেন নিশ্চয়ই। কোন অন্যায় কাজ তো করি নি জেঠামশাই, দেশের জন্য প্রাণ বলি দেওয়া তো মহৎ কাজ। আর আমাদের মা-বোনেরা যেদিন দেশের কাজে রাস্তায় রাস্তায় বের হবেন, সেদিন সত্যই স্বাধীনতা আসবে।

কৃষ্ণপ্রসাদের মুখে ক্রূর হাসি।—হাঃ হাঃ হাঃ! বেশ, বেঁচে থাকলে সব দেখতে পাব বাবা! কিন্তু একটা কথা, তুমি এ গাঁয়ে—এ ফুলছড়ি গাঁয়ে—এসব করতে পারবে না। কাঞ্চনগড়ে তোমার সুলেমান রাজার এলাকায় সর্বেশ্বর মাষ্টারের আশ্রয়ে যা খুশি কর গে। পারবে সুলেমান রাজার অন্দরে গিয়ে সুতো কাটা শেখাতে? পারবে?

শম্ভু বললে,—নিশ্চয় পারব। জানেন তো মাষ্টারসাহেব গনি রাজা জেলে গেছেন দেশের জন্য।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন—জানি। ওঁদের অন্দরমহলে যেদিন চরকা চালাতে পারবে, সেদিন এখানে এস শম্ভুনাথ। নিজের হাতে সেদিন আমিও সুতো কাটব।

শম্ভুনাথ বললে,—তাই হবে, জেঠামশাই! তাই হবে।

শম্ভুনাথ চলে গেল। তর্করত্ন বললেন,—আস্পর্ধা দেখলে?

দুলালচাঁদ বললে—সবই চুপসে যাবে কর্তাঠাকুর! সব চুপসে যাবে।

কৃষ্ণপ্রসাদ গম্ভীর। তিনি কোন উত্তরই দিলেন না। অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন। গড়গড়ার নলটা হাত থেকে পড়ে গেল, সেদিকে খেয়ালই নেই।

অদম্য উৎসাহ সন্ধ্যার। নাই বা থাকল মণীশ, সে নিজেই ঘ্যানর্-ঘ্যানর্ করে চরকা চালায়। বেশ কাজ পেয়েছে। জয়কালী বলেন,—আচ্ছা আপদ জুটেছে দেখছি!

সন্ধ্যা বলে,—আপদ বলছ কেন মা?

জয়কালী বলেন,—আপদ নয় তো কি? দুপুরবেলা একটু ঘুমোব, না কানের কাছে ঘর্-ঘর্ ঘ্যানর্-ঘ্যানর্, কেমন সুতো কাটছিস?

সন্ধ্যা বলে,—অনেকখানি হয়েছে মা! দেখ-দেখ কেমন সুন্দর মিহি হয়েছে।

জয়কালী বলেন,—শম্ভু যাই বলুক মা! এত সুতো কেটে কি হবে? তার চাইতে বই-টই পড়া ভাল। পড় না রে, সেই গল্পটা, সেই যে দেশে খুব দুর্ভিক্ষ হল।

সন্ধ্যা বলে,—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর মা! বঙ্কিমবাবু সেটা তাঁর আনন্দমঠে লিখেছেন।

জয়কালী বলেন,—বেশ লিখেছে কিন্তু! আচ্ছা সেই কল্যাণীকে প্রেতের মত লোকগুলি নিয়ে গেল। তার পরে কি হল রে?

সন্ধ্যা বলে,—বেশ আজই তোমাকে পড়ে শোনাব মা। কল্যাণী আর মহেন্দ্র সিংহের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হল বটে, কিন্তু আবার তারা এক সঙ্গে মিলেছিল।

জয়কালী বলেন,—বেশ, আমাকে পড়ে শোনাবি। আচ্ছা, মণীশটার তো কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না। সে কি রাতদিন কাঞ্চনগড়ে পড়ে থাকে নাকি?

সন্ধ্যা বলে,—তা কেন হবে? অনেক কিছু শিখেছে মণীশ, সর্বেশ্বর মাষ্টার ঋষিতুল্য লোক মা!

জয়কালী বলেন,—ঋষিতুল্য? বলিস কি রে? সে তো আর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নয় খিরিস্তান। যত সব ছোট লোকদের নিয়েই থাকে।

সন্ধ্যা বলে,—তিনি তো তাদের মানুষ করে তুলছেন মা।

জয়কালী বলেন,—ওদের কাজই তাই। জানিস তো তোর মামার বাড়ির পাশে কত খ্রীষ্টান আছে। আসলে ওরা ওই রকমই গেঁয়ো ভূত ছিল; নীচুজাত ছিল সব। আচার-আচরণ কিছুই জানত না। সাহেবরাই তাদের খিরিস্তান বানিয়ে মানুষ করে দিলে।

সন্ধ্যা বলে,—তা হলে বল সাহেবরা খুব ভাল কাজ করছে।

জয়কালী উত্তর দেন,—ভাল কাজই বটে। কিন্তু আমাদের তাতে ক্ষতিই হচ্ছে। আমার বাবা বলতেন, সাহেবরা আমাদের বুক থেকে ওদের ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ওদের পর করে দিচ্ছে।

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁ মা, মণীশও তাই বলছিল। খিরিস্তানরা তাই করে। কিন্তু মা! সর্বেশ্বরবাবু খিরিস্তান নন, তিনি এদের আমাদের দলেই টানছেন।

মা ও মেয়েতে এমনই কথা চলে। জয়কালীও মাঝে মাঝে মেয়ের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সুতো কাটতে যান। কিন্তু সুতো ডেলা পাকিয়ে যায়; বার বার যায় ছিঁড়ে। জয়কালী হি হি করে হাসেন।

সন্ধ্যা রাগ করে। সে বলে,—এ কি করলে মা! সব যে গুটিয়ে গেল। ইস্! এতখানি তুলো নষ্ট করলে! কোনদিন চরকা ভেঙে দু টুকরো করে ছাড়বে তুমি।

জয়কালীর হাসির মাত্রা আরও বেড়ে যায়। তিনি মেয়েকে বলেন,—কি বলছিস্ সন্ধ্যা! আমি কি আর সুতো কাটতে পারি নে! অনভ্যাস হয়ে গেছে। তোদের মত তো আমার বয়স নয় রে।

কথাটা বলেই সচকিত হয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকান জয়কালী। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও বেরিয়ে আসে। হ্যাঁ, তাঁর সন্ধ্যা! অস্তোন্মুখ সূর্যের আভা প্রতি-ফলিত হয় উঠোনের কাঞ্চনচাঁপার সবুজ পাতা ও ফুলে। সাদা থান কাপড় পরেছে সন্ধ্যা! রুক্ষ কেশবাস মৃদু হাওয়ায় আন্দোলিত; রুক্ষ হলেও সে কৃষ্ণ-কেশদাম আকাশের এক কোণে ভেসে থাকা গাঢ় কালো মেঘখণ্ডকেই যেন বিদ্রূপ করছে। বড় সরল এই সন্ধ্যা! যৌবন-জোয়ার যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেছে!

পাষাণে রূপান্তরিত হয়েছে অহল্যা,—কার পাপে, কার শাপে ?

কি দোষ করেছে সন্ধ্যা! পূর্বজন্ম-পরজন্ম ? চিন্তাধারার ঢেউ একের পর এক আঘাত হানে সন্ধ্যা-জননী জয়কালীর মনে।

প্রথম প্রথম ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সমাজ আর পরকালের আতঙ্ক তাঁকে কঠোর কঠিন করে তুলেছিল। তর্করত্ন-বাড়ির ত্রিসীমানায় কাউকে দেখলেই রেগে উঠতেন তিনি। ছেলে কিংবা মেয়ে কারও নিস্তার ছিল না। কিশোর থেকে বৃদ্ধ সবাই যেন রাহু। তাঁর সন্ধ্যাকে যেন গ্রাস করতে আসছে এই আতঙ্ক ছিল মনে। ছুতোনাতায় পাড়াপড়শীদের সঙ্গে ঝগড়াবিবাদ ও বচসার অন্ত ছিল না।

বৃদ্ধ প্রসন্ন তর্করত্ন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন।• তাঁরও রেহাই পাবার উপায় ছিল না। কোনরকমে চোখ বুজে তিনি সবই সহ্য করতেন। আর সন্ধ্যা ? মায়ের আতিশয্যে উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছিল সে ; তাও ভেঙে গেল। হঠাৎ মণীশের মায়ের মৃত্যুর দিনে ছুটে গেলেন জয়কালী। সেদিন থেকে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে মুক্তির স্বাদ পেলে। জয়কালী কি যেন কি বুঝে নিশ্চিন্ত হলেন।

তর্করত্ন সশঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তার্কিকের মন, সকল বস্তুতেই তর্কের সম্পর্ক খোঁজে। সংশয় ও সন্দেহে ভরা তর্করত্নের মন। কিন্তু জয়কালীর ভয়ে তর্করত্ন বড় কিছু বলতে ভরসা পান না। কৃষ্ণপ্রসাদবাবুর বৈঠকখানায় শম্ভুনাথের মুখে সন্ধ্যার চরকা-ধরার খবরটা শুনে বাড়িতে ফিরে অবশ্য কিছুক্ষণ ফোঁসফাঁস করেছিলেন।

জয়কালী উত্তর দিয়েছিলেন,—তুমি ভেবেছ কি ? কারও সঙ্গে মিশতে পাবে না, লেখাপড়া করতে পাবে না, মেয়েটা কি নিয়ে থাকবে ? তুমি তো চিরটা কাল মেয়েকে আগলে বসে থাকবে না, বরং একটা কিছু নিয়ে থাকলে মনও ভাল থাকবে।

এর উপর আর কথা বলা চলে না। তবুও তর্করত্ন বলেছিলেন,—শম্ভুনাথের মত ছেলেদের বিশ্বাস কর তুমি ?

জয়কালী বলেছিলেন,—কি করবে তোমার শম্ভুনাথ ? আমি আছি কি করতে ?

তর্করত্ন নীরবই ছিলেন। সত্যি জয়কালীর মত মা বেঁচে থাকতে বেচাল কিছু করতে কারও সাহস না হবারই কথা।

মা ও মেয়েতে এমনি দিন কাটে। মেয়ে মায়ের কাছে মণীশের থেকে শোনা কত খবর বলে। মাঝে মাঝে পুরনো খবরের কাগজ নিয়ে আসে মণীশ। সে কাগজ পড়েও সন্ধ্যা মাকে শোনায়।—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথা। মস্ত বড় ব্যারিস্টার মাসে হাজার হাজার টাকা রোজগার করেন। বাড়িঘর সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন তিনি।

জয়কালী বলেন,—হ্যাঁ, রাজারাই তো সন্ন্যাসী হয় রে। তা, তিনি কি তপস্যা করতে বেরিয়ে গেলেন?

সন্ধ্যা বলে,—না মা! দেশের কাজে সব দান করেছেন তিনি। এখন থেকে শুধু দেশের সেবা করবেন।

জয়কালী বলেন,—দেশের সেবা!

সন্ধ্যা বলে,—হ্যাঁ মা! দেশের সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে দেশের লোককে বুঝিয়ে দিচ্ছেন—কি করে মানুষ হতে হবে; কি করে ইংরেজ তাড়িয়ে দেশের সুখ বাড়াতে হবে।

জয়কালী বলেন,—এ রকম লোক হয় না কি রে? ভগবানকে পাবার জন্যেই মানুষ সন্ন্যাসী হয়। এ আবার কি সন্ন্যাস?

সন্ধ্যা বলে,—মণীশ বলে, এ স্বদেশী ব্রত। যতদিন না দেশের লোক ভালরকম খেতে পরতে পারে, ততদিন ভাল কাপড়-চোপড় এরা পরবেন না। সাধারণ লোকের মতই দু মুঠো খাবেন। গান্ধীজীও এই ব্রত নিয়েছেন।

জয়কালী বলেন,—দেশের লোক তো খুব সুখেই আছে।

সন্ধ্যা বলে,—তুমি জান না মা! আমরা পাড়াগাঁয়ে থাকি কতটুকু খবর রাখি। আমাদের গাঁয়ের সকলেই কি পেট পুরে খেতে পায়?

জয়কালী বললেন,—তা সত্যি।

সন্ধ্যা বলে,—ইংরেজরা কাপড় দিচ্ছে, তাই আমরা পরছি। এসব তাদের ব্যবসা চালানো মা! ব্যবসা চালাবার জন্যেই দেশটা দখল করে রয়েছে। এ দেশের

সব পয়সা তাদের দেশে নিয়ে যাচ্ছে। তার পর একদিন আমরা ফতুর হয়ে যাব।

জয়কালী বলেন,—এত কথাও জানিস্ বাপু! মণীশ বুঝি এসব শিখিয়েছে। বেশ মা! তুই তোর কাজ করে যা। মণীশ ঘরের ছেলে। কিন্তু ওই সব ছোঁড়াদের আমার বিশ্বাস নেই। কখন কি বিপদে ফেলে দেবে।

সন্ধ্যা বলে—তুমি কার কথা বলছ মা?

জয়কালী বলেন,—কার কথা বলব আবার? এসব ভাল ছেলের সঙ্গে এখন অনেক মন্দ ছেলেও এসে ভিড়েছে। সব কি সমান হয় রে!

তর্করত্নের গৃহে মা ও মেয়ের সময় এমনি করেই কাটে। সন্ধ্যার মনোজগতে পড়েছে নূতন আলো; শুধু স্বদেশীর ডাক নয়; আর আনন্দমঠের উদ্দীপনা নয়। উপন্যাসের নায়িকাদের মধ্যে যেন নিজেকে খুঁজে দেখে সন্ধ্যা।

দিন এগিয়ে চলে। রূপ পাল্টায় পৃথিবী; কাঞ্চনগড়ও রূপ পাল্টেছে। স্কুলের অনতিদূরেই ছিল পুলিশের থানা; এখন বসেছে তহসিল আপিস; হাসপাতালও বসেছে একটা। বাজারের পরিপাটিও চোখে ঠেকে।

মানুষ বেড়েছে; ওপারে কদমপুরের পাহাড়ের ঘোর জঙ্গলে একটি একটি করে চুঙ্গির মত গম্বুজ উঠছে; ঘোর জঙ্গলে নাকি কেরোসিন তেলের সন্ধান পেয়েছে সাহেবরা।

মণীশ ভাবে,—কি আশ্চর্য! কি করে যে এরা বোঝে?

নূতন লোকের সমাগম হয়েছে ওপারে। দু-একখানি করে অনেকগুলো ঘরও উঠেছে পাহাড়ের গায়ে। এপার থেকে দেখা যায়, গৈরিক পথ এঁকে বেঁকে উঠে কোথায় মিশে গেছে পাহাড়ের গায়ে।

এপারেও এসেছে পরিবর্তন। গঞ্জ অর্থাৎ বাণিজ্য-কেন্দ্র হয়ে উঠেছে শিয়াগঞ্জের বাজার। বিকিকিনির হাট শুধু নয়, বড় বড় নৌকাও এসে ঘাটে ভেড়ে। নদীর চরে বসে শত শত দোকান। সুজাতা বলে শহর গড়ে উঠছে। এমনি করেই গড়ে ওঠে শহর। সকাল সন্ধ্যায় কলের বাঁশি বাজে। ভোরের বাঁশিতে

আহ্বানের সুর শুনতে পায় মণীশ—ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ; জাগ জাগ। কাজে লাগতে হবে।

সন্ধ্যার বাঁশিতে একটানা ক্লান্তির আমেজ—ভোঁ-ও-ও-ও! ছুটি ছুটি! আর যে পারি না,—এবার ছুটি।

দলে দলে লোক চলে; খেয়া নৌকা ভর্তি লোকজন। পিঁপড়ের সারি—নামছে, নামছে,—পাহাড় বেয়ে নামছে।

সর্বেশ্বর বলেন,—সর্বনাশ হল কলের মায়া,—মোহিনী মায়া! মানুষগুলো কলের পুতুল হয়ে পড়বে। চাষ-বাস উচ্ছন্ন যাবে। সস্তা পয়সার মুখ দেখে বিগড়ে যাবে মাথা!

পাহাড়ীসর্দার বলাই মাঝি এসে বলে,—আমরা কাজ করতে যাব ওখানে। হুকুম দাও মাষ্টারমশাই!

সর্বেশ্বর বলেন,—আমি হুকুম দেবার মালিক নই সর্দার!

বলাই মাঝি বলে,—ভোর ছটায় বাঁশি বাজে; আটটায় কাজ সুরু হবে; পাঁচটায় ছুটি। হপ্তায় হপ্তায় মজুরি দেবে।

সর্বেশ্বর বলেন,—সবই জানি। কিন্তু তোমাদের ঘর সামলাবে কে সর্দার?

সর্দার হাসি-মুখে জবাব দেয়—মেয়ে পুরুষ সবাইকে নিতে চায় সাহেবরা। আমরা কিন্তু মেয়েদের নিয়ে যাব না।

সর্বেশ্বর বলেন,—বেশ করেছ। কিন্তু চাষ-বাসের কি হবে?

বলাই উত্তর দেয়,—চাষ-বাসে আর কি লাভ হবে মাষ্টারমশাই! এরা যে অনেক টাকা দেবে।

সর্বেশ্বর বললেন,—চিরটা কাল এরা থাকবে না। তোমাদের দেহমনও এমন থাকবে না। তখন উপায় কি হবে? চাষ-বাস যে ভুলে যাবে তোমরা।

হি হি করে হাসে বলাই সর্দার। দৈত্যের মত বুকের পাটা; নিজের দেহের দিকে দু-এক বার তাকিয়ে উত্তর দেয়,—নাঃ মাষ্টারমশাই! সে হবেক নাই। টাকা হলে সবই হবে।

সর্বেশ্বর মাষ্টার বললেন,—তোমরা যা ভাল বোঝো কর সর্দার! আমি আর কি

বলব। কিন্তু সব দিকে বুঝে শুনে কাজ কোরো।

সর্দার বিদায় নেয়; পাহাড়ী পল্লীতে নূতন সাড়া পড়ে যায়। সুজাতার কাজ বেড়ে গেছে। না, না, বাধা দেওয়া গেল না। রহমন দারোগা বলেন,—এ আবার এক নূতন চাল চেলেছে ইংরেজ! সবই মাটি করে দেবে। কাদের নিয়ে আর কাদের জন্য কাজ করব মাষ্টারমশাই! এরা যে ফাঁদে পা দিয়েছে, তা বুঝতে পারছে না। আপনার চরকাগুলো ভেঙে ফেলুন। হারামজাদাদের বোঝাতে পারলাম না।

তবুও পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ান রহমান দারোগা। এখন আর দারোগা নন, দস্তুরমত ডাক্তার। হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স বগলে ঘুরে বেড়ান পাড়ায় পাড়ায়। শুধু ওষুধ নয়, সাবু, বার্লি, চিনি মিছরিও তাঁকে যোগাতে হয়।

পাহাড়ী পুরুষদের বেশির ভাগই যায় তেলের খনিতে কাজ করতে। বাড়িতে থাকে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আর মেয়েরা। তাদের অসুখ-বিসুখের খবর নেবার ফুরসৎ নেই মরদদের। সকালে বাঁশির আওয়াজে ঘুম ভাঙে; তার পর নাকে মুখে চারটি গুঁজে দেয় ছুট। রাত্রে ফিরে আসে; ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়ে তারা।

নূতন আমেজ লেগেছে পাহাড়ীদের মধ্যে। দেশী মদের দোকান বসেছে কারখানার পাশে। নেশায় চুর হয়ে ফেরে পাহাড়ী মরদেরা। ছুটির দিনে চলে হল্লোড়!

সুজাতার কিন্তু বিরাম নেই; মেয়েদের দিয়েছে চরকা। পাহাড়ী মেয়েদের মাঝে সুজাতা এনেছে নূতন জীবন। মণীশও যায় মাঝে মাঝে। শম্ভুনাথ শহর থেকে নিয়ে আসে চরকা। পাহাড়ের গায়ে কার্পাসের বন,—নূতন ছবি ফুটে ওঠে সর্বেশ্বরের আশ্রমের আশেপাশে।

মণীশের জীবনেও নূতন অধ্যায়। কাঞ্চনগড়ের পাঠ শেষ হয়েছে; এখন সেও থাকে শহরে। তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কনকবাবু। কিন্তু কাঞ্চনগড়ের মোহ কাটাতে সে পারে নি।

সুজাতা তার জীবনে সমস্তার সৃষ্টি করেছে। দুর্বার আকর্ষণ! পড়াশোনায় তেমন আসক্তি আর নেই তার।

গোকুলকাকা আর পিসীমা ?—তাঁরাও মিটিমিটি জ্বলে ওঠেন চোখের সামনে। আর সন্ধ্যা ?—হঠাৎ কেমন এক শিহরণ জাগে দেহমনে। আরও কত জন—তারাও উঁকিঝুঁকি মারে মনের কোণে—সুনন্দা, আরতি, সুরুচি !

সম্মুখে তার আসমুদ্রহিমালয়ের ছবি—ভারতের মানচিত্র। কটিবস্ত্রধারী এক ক্ষীণকায় পুরুষ চলেছেন জাতীয় পতাকা হস্তে। মণীশ স্বপ্ন দেখে।

অহিংস অসহযোগ। নূতন কথা, নূতন বাণী আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে। সঞ্জীবনী মন্ত্রে যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল দেশটা। অভূতপূর্ব সে দৃশ্য।

গোলামির শেকল কি তাঁরা ছিঁড়তে পেরেছে ? শত শত সুরথ আর নাসির প্রাণ দিয়েছে। হাজারে হাজারে তারা সব জেগে গিয়েছে। গোলামখানা কি ভেঙ্গে দিতে পেরেছে তারা ? সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে ইংরেজের সিংহাসনে কি এর কোন কাঁপন লেগেছে ?

সর্বেশ্বরের মনে কত প্রশ্ন জাগে। একে একে জেল থেকে ফিরছে সবাই। বেকারে বেকারে দেশ ভরে উঠেছে। কি আশ্চর্য ! এতদিন কি এতগুলি লোক বেকার ছিল ? তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী আজ নিজেকে নিতান্ত অসহায়, নিতান্ত নিঃস্ব ভাবছে।

কেন ? কেন ?—কেন এরা হঠাৎ এমন লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেল ? এরা কি সবাই গোলামি করত ? না, না, তা সত্যি নয়। গোলামির মোহে আচ্ছন্ন ছিল এদের মন। নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা এতদিন এরা ভাবতে পারে নি। অকর্মাদের মধ্যে আজ জেগে উঠেছে কর্মী মানুষ। এদের জন্য কাজ চাই।

সর্বেশ্বর মাষ্টারের কানে কানে যেন ধ্বনিত হয়,—মিথ্যে নয় মিথ্যে নয়। এত বড় সঞ্জীবনী মন্ত্র যে দিতে পারে, তার কথা মিথ্যে হতে পারে না। দেশ স্বাধীন হয় নি বটে কিন্তু স্বাধীন মানুষ জেগে উঠেছে। নিরস্ত্র সৈনিক তারা, বুক পেতে দেয় গুলির সামনে। মরবে তবু মারবে না। এরা এগিয়ে চলবে। এদের মধ্যে গোপন কিছুই নেই ; এরা সত্যাশ্রয়ী, সত্যাগ্রহী।

অহিংস মন্ত্র কাজ দিয়েছে। আপন মনে হেসে ওঠেন সর্বেশ্বর মাষ্টার।

কর্মী মানুষ জেগে উঠেছে ; কাজ চাই, কাজ। চরকার সুতো কেটে আর খদ্দর বুনে কি কর্মী মানুষ শান্ত থাকবে ? তাদের অন্তরে যে হোমাগ্নি জ্বলে উঠেছে। এ হোমাগ্নির সমিধ যোগাবে কে ?

বুদ্ধিজীবী নেতারা নূতন পথ ধরেছেন। স্বরাজ্য পার্টি গড়ে উঠেছে ! মনে মনে ভাবেন সর্বেশ্বর মাষ্টার। ইংরেজ প্রলোভনের ডালি সামনে ধরেছে ; আইন সভায় যেন অনেকখানি অধিকার দিয়েছে ; দেশের কাজে দেশের লোকের হাতে ক্ষমতা এসেছে। হাসি পায় ! স্বরাজ্য দল সে মরীচিকা ভেঙ্গে দেবে। তা কি সম্ভব ?

না, না, অহিংস অসহযোগ ! অসহযোগের সঞ্জীবনী শক্তি তা হলে যে ব্যর্থ হয়ে যাবে। অহিংস অসহযোগ—বারবার কথাটা উচ্চারণ করেন সর্বেশ্বর মাষ্টার। মনে পড়ে যায় পিছনে-ফেলে-আসা দিনগুলি।

একদিন সর্বেশ্বরও উন্মত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এভাবে নয়, অহিংস মন্ত্রে নয়। অহিংস মন্ত্রের কোন গোপনতা নেই ; কিন্তু সে মন্ত্র ছিল বড় গোপন। অহিংসার বদলে হিংসার নীতি ছিল সে মন্ত্রে। রক্তলোলুপ হয়ে উঠেছিল তাঁদের মন।

নিজের হাত নিজেই উলটে-পালটে দেখেন সর্বেশ্বর। এই হাতে, এই হাতেই কত গুলি ছুঁড়েছেন তিনি। নেতার আদেশে কর্তব্যের খাতিরে দেশমাতৃকার স্বার্থে বিশ্বাসঘাতক সহকর্মীকেও গুলি করতে হয়েছে।

উঃ ! কি ভয়াবহ, নির্মম নিষ্ঠুর সে কাজ। অথচ সে সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেল। সিদ্ধির বদলে এল ব্যর্থতা। কিন্তু এ নূতন মিছিল যে বন্ধ হবার নয়, ব্যর্থ হবার নয়।

দিব্যচক্ষে দেখছেন সর্বেশ্বর মাষ্টার ! নূতন ভারত জাগছে ; পূর্ব গগনে নূতন সূর্যের অভ্যুদয় ঘটবে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে অহিংস সত্যাগ্রহী।

নিজের জীবনেও আজ নূতন অধ্যায়। পুরাতনকে বিদায় দিয়ে তিনি পা ফেলছেন নূতনকে আলিঙ্গন করতে।

নূতন পরিবেশ। নূতন কাজে ব্রতী হয়েছেন তিনি। তাঁর পরিকল্পনার এ রূপ ছিল না। হয়তো অজ্ঞাত পরিবেশের মধ্যেই জীবনটা কেটে যেত। পাহাড়ীদের মধ্যেই অজ্ঞাতকুলশীল থেকে যেতেন সর্বেশ্বর মাষ্টার। অবশ্য সুরথ আর সুজাতার

সম্বন্ধে চিন্তা ছিল। কিন্তু তারও সমাধান হত নূতন পথে।

কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন আর এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। সুজাতা যেন নূতন কাজ পেয়ে গেছে। শুধু পাহাড়ীরা নয়, আশেপাশের প্রায় সকলেই তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে! তাঁর আশ্রম আজ কর্মমুখর হয়ে উঠেছে। যারা তাঁকে এড়িয়ে চলত, তাদের ছেলেমেয়েরাই তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে।

খনির মজুরির মোহ পাহাড়ীদের প্রলুব্ধ করলেও সর্বেশ্বরের কর্মের বিরাম নেই। মণীশ, অবিনাশ, সন্দীপ, হাসিম, ও শম্ভু কত জন এসেছে; এক সুরথ গেছে, তার বদলে এসেছে অনেকে। অভিভূত হয়ে পড়েন সর্বেশ্বর মাষ্টার। রহমন দারোগা পাহাড় বেয়ে নেমে যাচ্ছেন; একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন সর্বেশ্বর। বিচিত্র মানুষের জীবন।

সর্বেশ্বরের নিজের জীবনের কথা মনে পড়ে। তাঁরও জীবন যে বিচিত্র। কেউ তাঁর পরিচয় জানে না। নিজের কথা ভুলে গেছেন সর্বেশ্বর। স্মৃতি তাঁকে বিহ্বল করে তোলে। দূরে, বহুদূরে স্মৃতির যবনিকা ভেদ করে ছবির পর ছবি ভেসে ওঠে।

শ্যামলী! হ্যাঁ শ্যামলীই বটে। ডাগর ডাগর চোখ; ঠিক গৌরবর্ণ বলা চলে না। মেঘের মত কেশদাম। নাম ছিল শ্যামলী। সর্বেশ্বরই ডাকতেন তাকে শ্যামা বলে।

সেকালের গাঁয়ের মেয়ে। লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানত না; সর্বেশ্বরই তাকে প্রথম পাঠ দিয়েছিলেন; সহজ সহজ বই পড়তে শিখেছিল শ্যামলী। চিঠিও লিখত সর্বেশ্বরকে।

গলা ছিল তার মিষ্টি! বাউল, বৈষ্ণব বৈরাগীর গান শুনে শুনে গাইতে শিখেছিল। অপূর্ব গলা!

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।

শ্যামলীকে সর্বেশ্বর রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি উপহার দিয়েছিলেন; গান গাইতে জানতেন না সর্বেশ্বর। কিন্তু বিস্মিত হলেন, শ্যামার সঙ্গীত শুনে।

ছিন্ন করে লও হে মোরে
আর বিলম্ব নয়।
ধূলায় পাছে ঝরে পড়ি
এই জাগে মোর ভয়।

প্রতিবেশী রাধানাথ কাকার মেয়ে শ্যামলী। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছিল; সর্বেশ্বরের মায়ের কাছেই সে যেন তার নিজের মাকে খুঁজে পেয়েছিল। সর্বেশ্বরের মা বলতেন,—এ মেয়েকে আমি নিজের ঘরেই রাখব।

মনে মনে পুলক জাগত সর্বেশ্বরের। উদ্গত যৌবনের স্বপ্ন! সেই শ্যামলী আজ কোথায়? বনবনানীর শ্যামশোভার দিকে তাকিয়ে থাকেন সর্বেশ্বর। মনে হল,—ফুটন্ত বেলফুলটার চোখ থেকে দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

স্বপ্ন তাঁর স্বপ্নই থেকে গেল। নিশীথ রাত্রে পালিয়েছিলেন সর্বেশ্বর। এমনি করেই শ্যামার চোখ থেকে সেদিন জল ঝরেছিল; জ্যোৎস্নার ধারায় চক্‌চক্ করছিল শ্যামার চোখ দুটি।

মিলন হয় নি; বিপ্লবীর মিলনে কত বাধা। মায়ের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয় নি। বাইরে হাঁকডাক, অন্দরে সর্বেশ্বর, মায়ের চোখে জল ঝরছে। ছয় মাসের পর হঠাৎ ছেলে বাড়ি এসেছে। তবু চুপ চুপ,—ফেউ লেগেছে পেছনে।

কেমন করে যে শ্যামলী খবর পেয়েছিল আশ্চর্য! লুকিয়ে পালাচ্ছিলেন সর্বেশ্বর! আমবাগানের ধার দিয়ে রাধানাথের ফুলবাগানের যে ধারটায় অজস্র বেলফুল ফুটে রয়েছে সেখানেই এসে শ্যামলী তাঁর হাত ধরেছিল।

শ্যামা!

চোখের জল দর দর করে বইছে। শ্যামা উত্তর দিতে পারে না। শুধু সর্বেশ্বরের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে একমুঠো বেলফুল ঢেলে দিয়েছিল তাঁর পায়ের উপর।

এ কি হল শ্যামা!

শ্যামা উত্তর দেয় নি; শুধু বলেছিল, আমায় মনে রেখো।

অভিভূত সর্বেশ্বর শ্যামাকে শুধু একটিবার মাত্র বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন; বেলফুলের মতই নির্মল, সুন্দর ও কোমল ছিল শ্যামা।

সর্বেশ্বর বলেছিলেন,—মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের লড়াই শ্যামা! মৃত্যুকে জয় করতে পারলে নিশ্চয়ই তোমার কাছে ফিরে আসব। মাকে দেখো।

হাসি পায় আজ সে সব কথা মনে পড়লে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি সর্বেশ্বর। তাঁর সেই পল্লীভূমিতে আবার ফিরে যেতে বড় দেরি হয়ে গিয়েছিল।

মাকে হারিয়েছিলেন সর্বেশ্বর। তাঁদের ভিটে শূন্য পড়েছিল। কেউ তাঁকে বড় চিনতেই পারে নি। ছদ্মবেশে যেতে হয়েছিল গোপনতার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। চোখের জল ফেলতে গিয়েছিলেন সর্বেশ্বর।

শ্যামা! হ্যাঁ, শ্যামলী নাকি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল; কেন হয়েছিল? তাও জানেন সর্বেশ্বর। দীর্ঘ বিচ্ছেদে যখন আর মিলনের কোন আশাই রইল না, ধীরে ধীরে সেই ফুটন্ত বেলফুল শুকিয়ে গেল!

জীবনের ছিন্ন পাতাগুলি এক এক করে উড়ে যায়,—স্মৃতির ঝড়ে। কোথায় শ্যামলী? দুর্বার স্রোতে ভেসে চলেছে জীবন; আজকের সর্বেশ্বর আর সেই সর্বেশ্বরে কত তফাৎ!

সর্বেশ্বরের জীবনে পরিবর্তন এনে দিয়েছে কে? বিপ্লবীর জীবন! মনে পড়ে যায় বিপ্লবী মহেন্দ্রদাকে। আর মনে পড়ে আধপাগলা সাহেব রবার্টসনকে।

বিচিত্র চরিত্র! বিচিত্র,—অদ্ভুত মানুষ এই ইংরেজ রবার্টসন! পাগল নয়, মহান আত্মা রবার্টসন। রবার্টসনই সোনার কাঠির স্পর্শে সব ওলট-পালট করে দিয়েছে। জন্ম নিয়েছে বিপ্লবী সর্বেশ্বরের মাঝে এক নূতন সর্বেশ্বর!

রবার্টসনেরই স্মৃতির আলেখ্য বহন করছে সুজাতা। অতীত অতীতে মিশে গেছে; আর, নিজের বলতে যারা ছিল, তাদের কেউ নেই। তাদের খোঁজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন সর্বেশ্বর।

রবার্টসন, লালিয়া, আর এক পর্বতকন্যা মিসেস্ রবার্টসন এসেছিল জীবনে! জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। সে অধ্যায়ও শেষ হয়ে গেছে।

কত কথা মনে পড়ে। অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন সর্বেশ্বর। বি. এ পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা থেকে কি এক গোপন বার্তা নিয়ে পূর্বাচলের দিকে যাত্রা করেছিলেন সর্বেশ্বর।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর সে বিপ্লবযুগ। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন সর্বেশ্বর। দেশ-মাতৃকার নামে শপথ। আদেশ-লঙ্ঘনে নিশ্চিত মৃত্যু। আবার আদেশপালনেও মৃত্যুভয় আছে। তার উপর পুলিশের হাতে ধরা পড়লে লাঞ্ছনা আর বর্বরোচিত নির্যাতন!

ছদ্মবেশে, ছদ্মনামে কত ঘুরে বেড়িয়েছেন সর্বেশ্বর। দিনের পর দিন পাহাড়ে জঙ্গলে কাটাতে হয়েছে। কোনদিন অন্ন জুটেছে, কোনদিন জোটে নি। অনাহার, অনিদ্রা আর উৎকণ্ঠায় কেটে গেছে কতদিন। সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন চলে-ছিল দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত।

যাঁদের সঙ্গে তিনি কাজ করতেন, তাঁদের সকলের পরিচয়ও জানতেন না তিনি। এমনি মন্ত্রগুপ্তি ছিল তাঁদের কার্যধারায়। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সের যুবক উদ্ভিন্ন যৌবনে তখন উন্মত্ত। তাঁর সামনে সুজলা-সুফলা-মলয়জ-শীতলা তাঁর জন্মভূমি। কিন্তু এলায়িত তাঁর কুন্তল; মুখে তাঁর ক্রূর হাসি। মন্ত্রগুরু বলতেন,—মা আমাদের বিদেশীর দ্বারা লাঞ্ছিতা সর্বেশ্বর! ঐ দেখ, তাঁর চোখে অশ্রু ঝরছে। তাঁর ছেলেরা গোলামি করছে; মায়ের ঐশ্বর্য লুটে নিচ্ছে বিদেশী।

উত্তেজিত হয়ে উঠতেন সর্বেশ্বর। কঠোর সংযম, গীতা-পাঠ ও নিয়ম-নিষ্ঠায় মনকে বলিষ্ঠ করতে হত। কিন্তু দলের কার্যকলাপের এমন গোপনীয়তা পছন্দ করতেন না তিনি। যাঁদের সঙ্গে কাজ করবেন, তাঁদেরও পরিচয় জানবার অধিকার নেই? মনে হত,—কেন এ লুকোচুরি? কেন লুকিয়ে থাকবেন তাঁরা? গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর দখল করে যাবেন; কে বাধা দেবে? কটা সাহেব আছে এদেশে? লুকিয়ে-চুরিয়ে বোমা ছুঁড়ে কি লাভ? বিদ্রোহী হয়ে উঠত তাঁর মন। তবু দলের কাজ, নেতার আদেশ নির্বিচারে তাঁকে পালন করতে হত।

মহেন্দ্রদা বলতেন—ডিসিপ্লিন। যোদ্ধার প্রথম ও প্রধান কাজ হল ডিসিপ্লিন। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও এগিয়ে যেতে হবে। কোন ওজর আপত্তি চলবে না।

কত পরীক্ষা দিতে হয়েছে সর্বেশ্বরকে। শুধু দূতিয়ালি করতে হয়েছে তিন বৎসর। নিজের শিক্ষাদীক্ষার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উপর যবনিকা টেনে দিয়ে বনে-বাদাড়ে কাটিয়েছেন সর্বেশ্বর। মায়ের কথাও ভুলিয়ে দিয়েছিল জন্মভূমি-মা।

হাসিও পায়,—মহেন্দ্রদা ছদ্মবেশে কত রহস্যের অভিনয় করে গেছেন। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে গিয়ে একদিন যা আশ্চর্য কাণ্ড করেছিলেন মহেন্দ্রদা। সর্বেশ্বর আর বিজয় ছিল তাঁর সঙ্গে। চারদিকে ধরপাকড়; পালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। পুলিশ দলবল নিয়ে আসছে। কুশিয়ারা নদীর ঘাটে এসে পৌঁছেছেন তাঁরা। সর্বেশ্বরকে বধূ সাজতে হল। বিজয় চাষী বুড়ো সেজে নৌকোয় বসে হুঁকো টানছে। মহেন্দ্রদা হলেন মাঝি; হাঁটুর উপর ময়লা আটহাতি কাপড়, খালি গা। মাথায় গামছা বাঁধা। মাঝি গান ধরেছে,—

ওবা নাইয়া, নদীর কূল পাইলাম না।
কূল পাইলাম না রে নাইয়া কূল পাইলাম না।
ওপারেতে আন্ধাইর নামে মিটিমিটি বাতি
ওরে, বাইতে বাইতে পরান গেল
শুকাই গেল ছাতি।
ভাইব্যা রাধাকমণ বলে
নদীব কূলে বইয়া।
ভুল পথে চালাইলা নৌকা
নাই রে সময় নাইয়া॥

ছইয়ের তলায় হুঁকো টানে বিজয় দত্ত। চেহারা ছিল কতকটা চাষাভুষোর মতই। সর্বেশ্বর বধূ সেজে বসেছিলেন; মাথায় ঘোমটা। নৌকো চলেছে ভাটির দিকে। মহেন্দ্রদা নির্বিকার। কিন্তু ছটফট করছে বিজয় আর ছটফট করছেন সর্বেশ্বর, যদি ধরা পড়ি!

হঠাৎ হাঁক শোনা যায়,—হেই মাঝি, নৌকো ভিড়োও।

মহেন্দ্রদা গান থামিয়ে উত্তর দেন, সওয়ারী আছে নৌকায়।

পুলিশের লোক! দুজন কন্‌স্টেবল্ আর সঙ্গে একজন দারোগা। দারোগা বদন চক্রবর্তী। জবরদস্ত দারোগা বদন চক্রবর্তী। দারোগা হাঁক দিয়ে বলে,—নৌকো ভিড়াও! আমাদের পার করে দাও।

মহেন্দ্রদা উত্তর দেন,—হউর বাড়ি যাইব কর্তা, নৌকায় বউ মানুষ আছে।

কন্‌স্টেবল বলে,—বউ আছে তো কি অইছেরে ব্যাটা। দারোগা বাবুকে শুধু পার কইর‍্যা দে।

দারোগা বললেন,—দে রে বাবা! সারাদিন হারামজাদাদের পিছু পিছু ঘুরেও হদিস পাচ্ছি না। এখন ফিরে যাব।

মহেন্দ্রদা নৌকো ভিড়োলেন; সর্বেশ্বরের প্রাণ তখন ওষ্ঠাগত। এরকম করে কেউ ধরা দেয়? যদি বুঝতে পারে বদন দারোগা!

দারোগা নৌকোয় পা দিয়েই বললেন,—বাঁচালে বাবা! এ তল্লাটে একখানাও নৌকো দেখ্‌তে পাচ্ছি নে। নিশ্চয়ই হারামজাদারা নৌকোগুলো লুকিয়ে ফেলেছে। গাঁয়ের লোকগুলোও ভারি বজ্জাত!

মহেন্দ্রদা বললেন,—হুঁ কর্তা!

দারোগা জিজ্ঞেস করেন,—কোথাকার সওয়ারী?

মহেন্দ্রদা বলেন,—আজ্ঞে বৈরাগীবাজার যাবে।

ছইয়ের সামনে পর্দা খাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজয় ফিস্ ফিস্ করে বলছে,—দেই ব্যাটাদের সাবাড় করে।

সর্বেশ্বর তার হাত চেপে ধরলেন। তা হলে আর রক্ষে থাকবে না। কন্‌স্টেবল দু জনও দারোগার দেখাদেখি বসে পড়ল।

দারোগা বললেন,--তামাকু আছে মাঝি? আমার সিগারেটগুলো ফুরিয়ে গেছে।

মহেন্দ্রদা হেঁকে বললেন,—ও হরেকেষ্টদা, দারোগাবাবুরে তামাকু পিয়াও না।

হরেকৃষ্ণ ওরফে বিজয় তামাক সেজে হুঁকোটা বের করে দেয়; ক্লান্ত দারোগা বদন চক্রবর্তী মনের সুখে হুঁকোয় দম দেন।

মাঝি আবার গান সুরু করে,—

ওবা নাইয়া নদীর কূল পাইলাম না।
কালো মেঘে আকাশ ছাইল
উথলে দরিয়া,
ওরে, ডুবু ডুবু অইল'রে নৌকা
ডুবি যে মরিয়া॥

হঠাৎ বদন চক্রবর্তীর যেন কি খেয়াল হল; তিনি বললেন,—দেখি নৌকোর ভেতরটা।

মহেন্দ্রদা বললেন,—চাষী-মাঝির বউ-ঝি আছে দারোগাবাবু। লাজ পাবে।

বদন চক্রবর্তী বললেন,—ভয় কি? খুলে দাও পর্দা।

কনস্টেবল দু জনে পর্দা টেনে নামাতে গেল। সন্ধ্যা তখন হয়ে গেছে; কালো আঁধার নামছে চারদিক ঘিরে। বিজয় হুঙ্কার ছাড়লে, খবরদার!

গুড়ুম-গুড়ুম কয়েকটি আওয়াজ।

সর্বেশ্বর ও বিজয়কে নিয়ে ছুটে পালালেন মহেন্দ্রদা। বিজয়কে ভর্ৎসনা করেছিলেন তিনি,—ছিঃ, ছিঃ, হঠাৎ একি করে বসলি!

বিজয় বললে,—ঠিকই করেছি। এ ছাড়া আর কি উপায় ছিল!

হেসেছিলেন মহেন্দ্রদা। মহেন্দ্রদাই ছিলেন সর্বেশ্বরের শিক্ষাগুরু। কঠোর-কঠিন প্রাণের মধ্যেও লুক্কায়িত ছিল অফুরন্ত স্নেহ-ভালবাসা।

পাথারিয়া পাহাড়ের দুর্গম অভ্যন্তরে ছিল পূর্বাচলের বিপ্লবীদের আড্ডা। না, না, আড্ডা নয়, আশ্রম। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের কথা মনে পড়ে যায় সর্বেশ্বরের।

গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা দুর্গম দুর্ভেদ্য পার্বত্য পথ। দিনের বেলায়ও সে পথে সূর্যের কিরণ প্রবেশ করে না। বড়লেখা স্টেশনের পূর্বদিকে দেখা যায় সারি সারি পাহাড়। সেই পাহাড়ের অভ্যন্তরে ছিল আশ্রম। সেই আশ্রমে গুহার মধ্যে সর্বেশ্বরকে কাটাতে হয়েছে অনেক দিন।

দুর্গম অরণ্যের মধ্যে যে এত সুন্দর জায়গা থাকতে পারে, তা কেউ কোনদিন ভাবতেও পারে না। উঁচু একটা পাহাড়ের গায়ের উপর হেলে পড়েছে আরেকটা পাহাড়। প্রকৃতির আচ্ছাদনীর মাঝখানে কালো পাথরের একটা সংকীর্ণ চত্বর। এখানে যে জনমানব থাকতে পারে, তার কাছে গেলেও কেউ সহজে বুঝতে পারে না।

এমন অরণ্য-কুহেলীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সর্বেশ্বর প্রথম প্রথম শিউরে উঠতেন। মনে মনে প্রশ্ন জাগত?—কে আবিষ্কার করেছে এ দুর্ভেদ্য স্থান?

পাথারিয়া-পাহাড়ের সেই দুর্গম প্রদেশেই সর্বেশ্বর অস্ত্রদীক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁকে গুলি-ছোঁড়া শিখিয়েছিলেন মহেন্দ্র গুপ্ত,—তাঁর মহেন্দ্রদা। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ী ঝরণাধারায় স্নান করে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। মহেন্দ্রদা তাঁর হাতে পিস্তল দিয়ে বলেছিলেন,—সূর্যদেবকে প্রণাম কর সর্বেশ্বর! তার পর বলেছিলেন,—আমাদের জন্মভূমি জননীর দুঃখ মোছাতে গিয়ে কোন দুর্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। নির্বিচারে দেশদ্রোহীকে শাস্তি দিতে হবে। আপন একান্ত প্রিয়জন হলেও তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাত কাঁপলে চলবে না।

সর্বেশ্বরের মনে উন্মাদনা জেগেছিল। হ্যাঁ, জন্মভূমির দুঃখ ঘোচাতে হবে। নির্মম, নিষ্ঠুর হতে হবে।

আজ সেই অস্ত্রগুরু মহেন্দ্রদা কোথায়? তাঁর পরিণাম,—তাঁর জীবনের শেষ দৃশ্য মনে পড়লে হাহাকারে সর্বেশ্বরের মন শিউরে ওঠে। সে দৃশ্য যে ভোলবার নয়।

নির্ভীক মহেন্দ্রদা যে এমন নির্ভীক হতে পারেন,—সর্বেশ্বর স্বপ্নেও তা ভাবেন নি। নিজের বিচার নিজেই করেছিলেন তিনি। নির্মম ও ভয়ানক সে পরিণাম নিজেই তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন।

মহেন্দ্রদার কথা যতই মনে পড়ে, ততই মুগ্ধ হয়ে যান সর্বেশ্বর। এমন নির্মম মানুষটার মধ্যে যে হৃদয়বান মহাপুরুষ লুকিয়েছিলেন, তারও সন্ধান পেয়েছিলেন সর্বেশ্বর সেই শেষের দিনে। সত্যই গুরু হবার মত যোগ্যতা ছিল তাঁর। শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে বারংবার নত হয়ে যায় মাথা; দু চোখ জলে ভরে ওঠে।

সেই নির্মম ভয়াবহ দিন। বিপ্লবী নেতারা ধরা পড়েছেন। কলকাতায় বিচার হচ্ছে। পাথারিয়া জঙ্গলের আশ্রমেও বসেছে বিচার-সভা। মহেন্দ্রদাকে ঘিরে বসেছিল সর্বেশ্বরের মতই আটাশজন যুবক। সকলেই সেদিন কিংকর্তব্য-বিমূঢ়।

সেই বিপ্লবী দলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে মহেন্দ্রদার কথার উপর। সমস্ত দলের কাজ লণ্ড-ভণ্ড করে দিয়েছে ইংরেজের গুপ্তচরেরা। বালেশ্বরের বুড়ী বালামের তীরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শেষ আশা নিভে গেছে।

মহেন্দ্রদা বললেন,—আমি ভেবে দেখেছি, এ পথে আর কাজ হবে না। তোমরা ফিরে যাও সব। ভুল পথে চলে আর লাভ নেই।

মহেন্দ্রদার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল বিজয় দত্ত। বিজয় বলেছিল,—তা হলে কি করতে হবে আমাদের? আমরা দেশের কাছে কি বিশ্বাসঘাতক হব? আমাদের প্রতিজ্ঞা, আমাদের শপথ,—তার কি হবে?

মহেন্দ্রদা বললেন,—কি আর হবে? দেশের সেবা করবার কত পথ আছে। দেশের কুসংস্কার দূর কর। সমাজ-সংস্কারে লেগে যাও।

বিজয় উত্তর দিলে,—আমাদের গায়ে যে ছাপ মারা আছে মহেন্দ্রদা! আমরা কি পুলিশের হাতে ধরা দেব?

মহেন্দ্রদা বললেন,—না, আমি তা বলছি না। ধরা দেবে কেন? সমাজ-সেবা তো মহৎ কাজ; তাতে কেউ বাধা দেবে না।

উত্তেজিত হয়ে বিজয় বলে ওঠে,—একি বলছেন মহেন্দ্রদা! কোথায় গিয়ে কার সেবা করব? ফিরে যাবার রাস্তা কি আর আপনারা রেখেছেন?

মহেন্দ্রদা বললেন,—নিশ্চয়ই তার জন্য আমরা দায়ী। অন্যের কথা জানি না। তার প্রায়শ্চিত্ত আমি নিশ্চয়ই করব। কিন্তু ভেবেচিন্তে কাজ কর। এ ছাড়া যে কোন উপায় নেই।

গর্জে ওঠে বিজয়,—উপায় নেই! পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে মরব আমরা। তাতেও গৌরব আছে।

মহেন্দ্রদা বললেন,—না, না! ওপথে আর যেয়ো না বিজয়! মিছামিছি প্রাণ দেবে কেন? তোমাদের মত সৈনিক বেঁচে থাকলে দেশের অনেক উপকার হবে। দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে তোমরা! ফিরে যাও, এখনও সময় আছে। তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে অনায়াসে মিশে যেতে পারবে তোমরা। কেউ জানতেও পারবে না।

সকলেই বিচলিত হয়ে উঠল। মহেন্দ্রদার কথার উপর আর কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। সকলেরই মনে দুর্ভাবনা। 'কি হবে?—কি হবে?

বিজয় বললে,—সমস্ত বিপ্লবী দল নির্মূল হলেও আমরা তো এখনও রয়েছি

মহেন্দ্রদা! আমরা নূতন করে কাজ সুরু করব। নূতন দল গড়ে তুলব।

প্রশান্ত হাসি হেসে মহেন্দ্রদা বললেন,—সে আর সম্ভব নয় বিজয়! এ পথে দেশের মুক্তি নেই।

বিজয় বললে,—নেই? কে বললে? ভীরুর মত, কাপুরুষের মত আমাদের বেঁচে থাকতে বলছেন আপনি। না, না, এ হতে পাবে না। আমাদের শপথ আমরা ভাঙতে পারব না। নির্মূল করব সাহেবদের! আসুন, এধারে তো কোন কিছুই ঘটে নি। নিশ্চিন্ত আছে ওই চা-বাগানের সাহেবরা। ওদের আমরা শেষ করে দিই। আমাদের অস্ত্র দিন মহেন্দ্রদা!

মহেন্দ্রদা উত্তরে বলেন,—অস্ত্র? সে এখন পাবে না বিজয়! চা-বাগানের দু-চারটে সাহেবকে মারলে কি দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে?

বিজয় বললে,—সেই নির্দেশই এসেছিল আমাদের কাছে।

মহেন্দ্রদা বললেন,—আমাদের সব প্ল্যান নষ্ট হয়ে গেছে বিজয়! এখন মনে হচ্ছে মস্ত বড় ভুল করেছি আমরা। এ সব তরুণ কিশোরদের আর বিপথে চালাতে পারব না আমি।

বিজয় গর্জে উঠেছিল,—কি! কি বলছেন আপনি? এতদিন এ ধর্মজ্ঞান কোথায় ছিল আপনার? আমাদের সর্বনাশ করে আপনি রেহাই পেতে চান? এ অবিচার আমরা মানব না আজ। আপনার যা খুশি আপনি করুন। আমাদের কাজে বাধা দেবেন না।

মহেন্দ্রদা বললেন,—বেশ, তাই হবে। কিন্তু আমাদের এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। লুসাই পাহাড়ের দিকে তোরা এখনই পালিয়ে যা।

বিজয় হুঙ্কার দিয়ে উঠল,—কেন? আমরা কি মরতে ভয় পাই মহেন্দ্রদা!

উৎকণ্ঠার স্বরে মহেন্দ্রদা বললেন,—না। কিন্তু বিজয়, মিছামিছি প্রাণ দিয়ে কি হবে বল? এখানকার সন্ধান পেয়ে গেছে তারা।

উত্তেজিত বিজয় উত্তর দেয়,—এ আমি বিশ্বাস করি না মহেন্দ্রদা! ছল-ছুতো করে আপনি আমাদের তাড়িয়ে দিতে চান। আপনার মতলব আমি বুঝতে পেরেছি।

মহেন্দ্রদা বললেন,—বিশ্বাস করলি না? মনে রাখিস, তোদের অনিষ্ট চিন্তা আমি কোনদিন করি নি। কোনদিন করবও না। আমার মনে হয়, পুলিস বেড়াজাল পেতেছে। দক্ষিণের ওই পাথারকান্দির দিক দিয়ে তোরা বেরিয়ে যা। উত্তর, পশ্চিম কিংবা পূবদিকে গেলে বিপদ হবে।

বিজয় বললে,—আপনি দেখছি অন্তর্যামী হয়ে উঠলেন মহেন্দ্রদা! আশ্রম খুলে এখন থেকে গুরুগিরি করলেই আপনার দিন বেশ কেটে যাবে। আমরা কিন্তু এ সব ভণ্ডামি করতে পারব না।

কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে যায়। হঠাৎ সিটাং ছুটে এসে মহেন্দ্রদার কানে কানে কি বললে। মিকির যুবক সিটাং। মিকির আর হাজাংবাই সব খবর আনে। তারাই আগলে রেখেছে এ পাহাড়ী আড্ডা।

মহেন্দ্রদা বললেন,—তোরা পালা, পুলিস এসে পড়েছে। সঙ্গীন উঁচিয়ে আসছে গুর্খারা। এক্ষুনি পালা।

টর্চের আলো পড়তে লাগল পাহাড়ের গায়ে। বিজয় বললে, আমরা লড়াই করে মরব মহেন্দ্রদা! গোলাঘর খুলে দিন; রাইফেল নিয়ে আমরা দাঁড়াব।

তাই হবে। কিন্তু তোরা পালা। বলতে বলতে চক্ষের নিমেষে গোলাঘরে ঢুকলেন মহেন্দ্রদা। তার পর সে কি ভীষণ আওয়াজ! গোলাঘরে আগুন দিয়েছেন মহেন্দ্রদা। সঞ্চিত বোমা-বারুদের স্তূপে বিস্ফোরণ ঘটল। আর মহেন্দ্রদা তাঁর কথা রাখলেন। প্রায়শ্চিত্ত করলেন তিনি।

প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্ত! হতভম্বের মত আটাশ জন যুবক দাঁড়িয়ে সে প্রায়শ্চিত্ত দেখতে পেল। কারও কারও চোখে তীব্র জ্বালা! সে জ্বালায় জল ঝরেছে কি রক্ত ঝরেছে তা সর্বেশ্বর আজ মনে করতে পারেন না।

বিজয় দত্ত বললে,—দেশদ্রোহী। বিশ্বাসঘাতক!

এদিকে টর্চের আলো পড়ছে চারদিক থেকে। এক জন বলে উঠল,—সর্বনাশ হবে বিজয়দা। এখন কি হবে? মহেন্দ্রদা তো ঠিকই বলেছেন।

বিজয় বললে,—মিছামিছি দাঁড়িয়ে মরতে পারব না। ছুটে চল ঐ পথে।

নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা সুরু হল।

আজ আর এক পাহাড়ে দাঁড়িয়ে সর্বেশ্বর সেদিনের স্বপ্ন দেখছেন। আনন্দমঠ ধ্বংস হয়েছে; সন্তানেরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছে। অন্ধকারে হাহাকার উঠছে। আর কোন আশা নেই।

দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাল সব। জঙ্গলের পর জঙ্গল, উঁচু নীচু পাহাড়! ভীষণ সে পথ। পা ফসকালে আর রক্ষা নেই। গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ হচ্ছে পেছনে। ফিরে তাকালে সর্বনাশ।

ভোরের দিকে অনেকটা নিশ্চিন্ত হল সবাই। কিন্তু যাবে কোথায়? পাথারকান্দি বাঁ হাতে রেখে পাহাড়ীপথে চলেছে তারা অনিশ্চিতের পথে। ঘুমিয়ে রয়েছে জনপদ; ঘুমিয়ে রয়েছে পাহাড়-জঙ্গল! পথের যে আর শেষ নেই।

কে আশ্রয় দেবে? কিই-বা তাদের পরিচয়? গোটা ভারতবর্ষটাই যেন বিদ্রোহীদের ভয়ে আতঙ্কে মুষড়ে পড়েছে। তারা যে বিপ্লবী।

মাঝে মাঝে পাহাড়ী বস্তী। কেউ কথা বোঝে না; এক সঙ্গে এত জন চললে বিপদ আছে। লোকে সন্দেহ করতে পারে। হাতেও কোন অস্ত্র নেই; তার উপর কপর্দকশূন্য সকলে।

বিজয় দত্ত বললে, আমাদের আর এক সঙ্গে চললে হবে না। এবার ভাই, ছাড়াছাড়ি। নিজের পথ নিজে বেছে নাও। আমি বলছি,—তোমরা লুসাই অঞ্চলেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থাক। আমি পরে তোমাদের খুঁজে নেব। মনে রেখ,—আমাদের শপথ আমরা ভাঙ্গব না।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠল। তার পর এক এক জন এক এক পথ ধরলে। সে বিদায়-দৃশ্য বড় মর্মান্তিক! বিজয় দত্ত কেঁদেই ফেললে। আর সর্বেশ্বর?—হতাশায় ও নৈরাশ্যে অন্ধকার দেখেছিলেন সেদিন।

পুরোনো দিনের ছবি ভেসে ওঠে সর্বেশ্বরের মানসপটে।

শ্রান্ত-ক্লান্ত সর্বেশ্বর। দু দিন উপবাসী। পাহাড়ী ঝরনার জল ছাড়া কিছুই পেটে পড়ে নি। অজানা অচেনা পথ; কোথায় যে এগিয়ে চলেছেন জানেন না। পাহাড়ের পর পাহাড়। দূরে চা-বাগিচার শ্যামলশ্রী দেখা যাচ্ছিল। লালটালির দু-একখানি কুঠির কতক অংশও যেন উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। পথ আর ফুরোয় না।

পা দুখানা যেন আর নাড়তে পারেন না। পাহাড়ের উপর একটা গাছতলায় অচৈতন্য হয়ে পড়লেন সর্বেশ্বর।

কতক্ষণ,—কতক্ষণ যে এরূপ অবস্থায় ছিলেন তা বলতে পারেন না। কিন্তু হঠাৎ জ্ঞান হবার পর মনে হল—এ কি স্বপ্ন ?

চোখ খুললেম সর্বেশ্বর। বিস্মিত নির্বাক দৃষ্টি তাঁর। তাঁর চোখে-মুখে জলের ছাট দিচ্ছে এক সাহেব,—খাঁটি ইংরেজ।

সন্দেহ-দোলায় দোলে মন ; তবে কি পুলিসের হাতে পড়লেন তিনি ? তবু, তবু ভাল লাগে।

কথা বলতে পারেন না। সর্বাঙ্গে বেদনা ; হাত-পা নাড়তেও কষ্ট হচ্ছে। পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে। অস্থি কষ্টে উচ্চারণ করলেন, জল, জল, ওয়াটার প্লীজ।

সাহেব ফ্লাস্ক খুলে জল ঢেলে দিলে সর্বেশ্বরের মুখে। শিকারীর বেশে সাহেব, পুলিস নয় ; তবু বিশ্বাস নেই ওদের। শত্রুর জাত ; নিশ্চয়ই ধরিয়ে দেবে।

সর্বেশ্বর ভাবেন,—ভয়ই বা কিসের ? মহেন্দ্রদা তো অভয়মন্ত্র দিয়ে গেছেন। চোখের সামনে প্রায়শ্চিত্ত দেখেছেন সর্বেশ্বর। তাঁরও প্রায়শ্চিত্তের দরকার। নরহত্যা করেছেন তিনি। ডাকাতি করতে গিয়ে আত্মরক্ষার জন্য গুলি ছুঁড়তে হয়েছে। না, না, সে তো সত্যিকারের ডাকাতি নয়। দেশসেবার রসদ যোগাতে ডাকাতি করতে হয়েছে। যারা অন্যকে বঞ্চিত করে সঞ্চয় করেছে, তাদের ধন লুট করলে কিসের অপরাধ ? অজস্র মজুরের রসে পুষ্ট হয়ে উঠেছে বিদেশী মালিক ; আর দেশী নেকড়েগুলো। পাপ-পুণ্যের দোহাই দিয়ে, ধর্মের ভয় দেখিয়ে মানুষকে যারা ছোট করে রেখেছে, তাদের শাস্তি দিলে পাপ হয় না ;— এই শিক্ষাই পেয়েছেন সর্বেশ্বর।

আজ সাহেবকে দেখে তিনি ভীত হবেন কেন ? দুর্দম তেজে রক্ত বইছে যুবক সর্বেশ্বরের বুকে। ভয় কি ?—আকাশ-পাতাল ভাবেন সর্বেশ্বর। জ্যোৎস্না-রাত্রের সেই বেলফুলের অঞ্জলির সঙ্গে ডাগর ডাগর দুটি অশ্রুভরা চোখও তাঁর মনে পড়ে।

সাহেবের মুখে মিষ্টি হাসি,—মাই গুড্ বয়! ইউ আর টু-উ্ মাচ্ টায়ার্ড! তুমি বড় ক্লান্ত! এখন কেমন বোধ করছ?

বাংলা বলছে সাহেব। আশ্চর্য হন সর্বেশ্বর। কিন্তু তাঁর প্রকৃত পরিচয় পেলে কি আর সাহেব রক্ষা করবে। নিশ্চয়ই তাঁকে ধরিয়ে দেবে।

সাহেব বললে,—পালিয়ে বেড়াচ্ছ? পাহাড়ের পথে পালিয়ে এসেছ? তুমি—তুমি শিওর্লি, ইউ আর এ রিভলিউশনারি। ইউ আর এ প্যাট্রিয়ট, মাই গুড্ ফ্রেণ্ড্!

সাহেবের কথা শুনে স্তম্ভিত হন সর্বেশ্বর। নিশ্চয়ই পুলিসের লোক। তা না হলে কি করে বুঝলে এ সাহেব যে তিনি পালিয়ে এসেছেন? কি করে বুঝলে তিনি বিপ্লবী। আর রক্ষে নেই। এরা সব খবর রাখে। ঠিক বলেছিলেন মহেন্দ্রদা, এরা বেড়াজাল পেতেছে। এবার জালে পড়েছেন সর্বেশ্বর।

তবু সাহসে বুক বেঁধে সর্বেশ্বর বলেন,—হ্যাঁ। কিন্তু আমি মরতে ভয় পাই না সাহেব। তুমি আমাকে ধরিয়ে দিতে পার।

হো-হো করে হেসে উঠল সাহেব। তার পর বললে,—মাই গুড ফ্রেণ্ড্, আমাকে ভুল বুঝো না। আমি রাজার জাত বটে, কিন্তু রাজা নই। আমি তোমার রাজার কোন মাইনে-করা গোলামও নই। আমি তোমাদের বন্ধু। আই এম রবার্টসন্,—এ ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া। এখন চল আমার সঙ্গে।

সাহেব হাসতে লাগল। তাজ্জব ব্যাপার। নিশ্চয়ই সর্বেশ্বরকে ছলনা করছে এ সাহেব। যখন তার খপ্পরেই পড়েছেন, তখন আর উপায়ই বা কি আছে!

সর্বেশ্বর অতি কষ্টে বললেন,—আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি তো হাঁটতে পারব না মিস্টার রবার্টসন্!

অল্ রাইট্!—কুছ পরোয়া নেই।

এগিয়ে আরও কাছে এসে হাঁটু গেড়ে সর্বেশ্বরের কাছে সাহেব বসে পড়ল। তার পর তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে,—তোমার কোন ভয় নেই, আমার সঙ্গে থাকলে তুমি নিরাপদেই থাকবে। আই লভ্ ইণ্ডিয়া।

তার পর সর্বেশ্বরকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিজের ঘাড়ের ওপর তুলে নিলে

রবার্টসন্। একটা গাছে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল তার বন্দুক। সেই বন্দুকটাও হাতে নিলে। সর্বেশ্বর এলিয়ে পড়লেন তার ঘাড়ের ওপর।

পাহাড়ের উঁচু পথ ভেঙে চলল রবার্টসন্। পথ চলতে চলতে বকর বকর করে,—মাই গুড বয়! কি মার্ভেলাস্ আইডিয়া! দেশ স্বাধীন করবে তোমরা! নিশ্চয়ই পারবে। দু দিন দেরি হতে পারে। ঘাবড়াও মত্। এত বড় দেশটাকে তৈরি করতে দেরি হবে বৈ কি! কি সুন্দর এ দেশ! এই হিলি কান্ট্রি,—সোনার দেশ। আমার দেশকে আমি ভালবাসি। কিন্তু এ দেশ এমন সুন্দর যে, একে ভাল না বেসে থাকতে পারছি না।

সাহেবের কণ্ঠস্বর কানে আসে; ক্লান্ত অবসন্ন সর্বেশ্বর।

সাহেব বলতে লাগল,—তোমরাও খুব মহৎ। এমন সুন্দর দেশে যাদের জন্ম, তাদের অন্তর সুন্দর না হয়ে যায় না। তুমি থাকবে আমার কাছে? কোন ভয় নেই। তোমায় আমি কাজ দেব। নট্ টু বি স্লেভ্। বাট ইউ উইল গেট চান্স্ টু সার্ভ ইওর কান্ট্রি। বুঝলে? আই এম রবার্টসন্—ম্যানেজিং ডিরেক্টর অব্ সো ম্যানি টী গার্ডেনস্।

বকর বকর করছে রবার্টসন্। সর্বেশ্বর ভাবেন,—লোকটা নিশ্চয় পাগল। এখন পাগলের হাত থেকে রেহাই পেলে হয়। হাসিও পায়!

রবার্টসনের বাংলোয় এসে পৌছলেন সর্বেশ্বর। উঁচু টিলার উপর লাল টালির ছাউনি। সামনে চত্বরে নানা রঙেব ফুল। বিচিত্র শোভা! সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনের বারান্দায় রাখা গদি-আঁটা কৌচের ওপর সর্বেশ্বরকে শুইয়ে দিলে রবার্টসন্!

রবার্টসন্ হাঁক-ডাক সুরু করলে—মাই ডার্লিং! ডার্লিং, ডার্লিং,—মলি,—মলি!

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল—সাহেবের মেম,—মুঠো মুঠো গোলাপে-গড়া এক নারীমূর্তি। মুখে তাঁর উচ্ছল হাসি—হু ইজ দেয়ার?—মাই ডার্লিং! কাদের ছেলে?

রবার্টসন্ উত্তর দেয়,—ছেলে নয়! হি ইজ ইওর সন্ ইন্ ডিস্ট্রেস্!

হো হো হাসির ঢেউ খেলতে লাগল। হাততালি দিতে লাগল মিসেস্ রবার্টসন্!

—নো, নো, হি উইল বি ইওর সন্-ইন্-ল।

—ভেরি গুড্! ভেরি গুড্ আইডিয়া! ডিয়ার ডার্লিং!

উঠে দাঁড়াবার শক্তিও নেই। তার ওপর জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। সর্বেশ্বরের যেন চেতনা লোপ পাবার উপক্রম হয়েছিল।

দু-তিন দিন তাঁর বিশেষ কোন চেতনাও ছিল না। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন,—অক্লান্ত পরিচর্যা চলেছে। ডাক্তার দেখছে। মিসেস্ রবার্টসন্ আর রবার্টসনের মুখের সঙ্গে আর একটি মুখ মাঝে মাঝে দেখেন। উদ্‌ভ্রান্ত ছল ছল চোখে চেয়ে থাকে সে তাঁর মুখের দিকে।

রবার্টসন্ আর তাঁর পত্নীকে চেনেন তিনি। কিন্তু নূতন মুখটি কার? হয়তো কোন নার্স আনিয়েছে রবার্টসন্। কিন্তু না, না, তা নয়। সে মুখ মমতায় ভরা,—সাহেবের জাত নয়; পাহাড়ী কিংবা এ অঞ্চলের লোক বলেও মনে হয় না। পিঙ্গল, রুক্ষ চুলের মধ্যে টানা টানা চক্ষে চঞ্চল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি,—মাঝে মাঝে ছল ছল করে ওঠে।

না, আর সন্দেহ নেই। রবার্টসন সত্যই এদেশকে ভালবাসে। এমন দরদী মানুষ জীবনে তিনি আর কখনও পান নি। আজ জীবনের প্রায় শেষ অঙ্কে দাঁড়িয়ে হিসাব-নিকাশ করেন সর্বেশ্বর।

আবার ভেসে ওঠে সেই দৃশ্য।

লালিয়া! পাগলা রবার্টসনের পাগলা মেয়ে! সাহেবের কুড়োনো মেয়ে লালিয়া। রাতদিন সর্বেশ্বরের পরিচর্যা করেছে লালিয়া।

রবার্টসন বলে,—একেও তোমারই মত কুড়িয়ে পেয়েছি সর্বেশ্বর। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। কোথায় বাড়ি, কোথায় ঘর ঠিক বলতে পারে না। হিন্দু কি মুসলমান, বুঝতে পারি না। পাগলী,—বুঝলে সর্বেশ্বর, ম্যাড্। এখন ভাল হয়ে গেছে; সুন্দর গলা, কেবল গান গায়,—তোমাদের বৈষ্ণবের গান। আর কত গান।

সাহেব বলতে থাকে,—অনেক দিন এদেশে আছি। মনিপুরীদের গান আর নাচ আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু লালিয়া,—মাই গুড্ গার্ল।—এ নাইটিঙ্গেল!

সাহেব সুর করে গান ধরে—

মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব।
আমার কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।

হো হো করে হেসে ওঠে রবার্টসন। লালিয়া যে গান করে, সর্বেশ্বর তা বুঝতে পারেন নি।

সাহেব বলে,—তুমি এখানে আসার দিন থেকেই ও গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। বুঝলে সর্বেশ্বর,—মনে হয় জিপসির মেয়ে। বাট আই ওয়াণ্ট এ সন্-ইন্-ল। তা না হলে এর পাগলামি সারবে না।

সর্বেশ্বরের মুখেও হাসি ফুটে ওঠে। লালিয়া পালিয়ে যায়। তার করুণ উচ্ছল চাহনি সর্বেশ্বরের চোখে পড়ে। যৌবনেব পথে এগিয়ে চলেছে লালিয়া।

আর মিসেস্ রবার্টসন? সাহেবের ডালিং মল্লি,—মল্লিকা। সাহেব বলে,—জান সর্বেশ্বর! ওঁর আসল নাম মিলি। এদেশে এ নামটা মানায় না। তাই নাম দিয়েছি—মল্লি, মল্লিকা। বনের মাঝে মল্লিকা ফুল—বেশ সুন্দর! পর্বতেই জন্ম ওঁর। সেই স্কটল্যাণ্ডের এক পাহাড়ী কুঠিতে। বেশ মানিয়েছে এদেশের সঙ্গে।

মিসেস্ রবার্টসন বলে,—বেশ! তোমার নামটাও বদলে ফেল। কি বল সর্বেশ্বর! সাহেবের নামটাও পালটে দেওয়া উচিত।

হাসি ও হুল্লোড়ে দিন কাটে।

মনে পড়ে ফেলে-আসা দিনগুলি।

সর্বেশ্বর প্রৌঢ়ত্বের সীমা পার হয়েছেন। যুবক সর্বেশ্বর আজ নেই; নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজে দেখেন সর্বেশ্বর। হ্যাঁ সুজাতা! সুজাতার কি হবে? সকলেই জানে সুজাতা সর্বেশ্বরের মেয়ে।

সুজাতাও তাই জানে। কিন্তু এর পরিণতি কোথায়? যৌবনের পথে পা ফেলেছে সুজাতা। এই পাহাড়ে-জঙ্গলে পাহাড়ীদের নিয়েই কি তার জীবন কাটবে?

মণীশ?—আকাশ-পাতাল ভাবেন সর্বেশ্বর। মণীশ আর সুজাতা! সুরথ গিয়েছে। মণীশ এসেছে নূতনরূপে সুজাতার জীবনে। রাশ টেনে রাখা যাবে না।

মৃদু মৃদু হাসি সর্বেশ্বরের মুখে।

লালিয়া? জিপ্‌সীর মেয়ে লালিয়া। বোঁটা ছেঁড়া ফুল ঝরে পড়েছিল পাহাড়ের গায়ে। কুড়িয়ে পেয়েছিল রবার্টসন সাহেব;—পাগলা রবার্টসন। লালিয়ার স্মৃতি মুছে গেছে কিন্তু রবার্টসনের স্মৃতি নিয়ে তাঁর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুজাতা।

আশ্চর্য মানুষ ছিল রবার্টসন। তাঁর কাছেই সর্বেশ্বর নূতন মন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছিলেন। এখনও কানে বাজে, এদের মানুষ করে গড়ে তোলো সর্বেশ্বর! তোমার দেশকে গড়ে তুলতে যদি চাও, এদের বাদ দিলে চলবে না। এরা যে তোমার ঘরের মানুষ। এরাই তোমাদের পর হয়ে যাচ্ছে। জান, ইংরেজ কারা? ব্রিটিশ কারা? কত দস্যু কত পার্বত্য জাতি মিশে গেছে আমাদের রক্তে। এখন তাদের চিহ্নমাত্র পাবে না। ব্রিটনরা আজ ব্রিটিশ হয়ে গেছে; ইংরেজ আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

সত্যই রবার্টসন কাজ দিয়েছিল সর্বেশ্বরকে। নূতন কাজ। সর্বেশ্বর স্বপ্নেও ভাবেন নি কোনদিন তাঁকে এ-কাজে নামতে হবে। রবার্টসন বলেছিল, কাজ দিলাম সর্বেশ্বর! স্কুল খুলে দিলাম। তুমি এই পাহাড়ীদের আর কুলীদের ভেতরের মানুষকে জাগিয়ে তোলো। বনে-বাদাড়ে থাকতে থাকতে এরা বুনো হয়ে গেছে। বুঝলে, ইউ আর এ রিভলিউশনারি—সত্যই এটা রিভলিউশন! সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ! কিন্তু সাবধান—বি কেয়ারফুল; এদের ধর্ম দিয়ো না। এদের প্রাণের ধর্ম জাগতে দাও। এরা মানুষ হোক্। ধর্মের গণ্ডি দিয়ে এদের বেঁধে রেখো না। তোমার সঙ্গে থাকবে লালিয়া—মাই গুড্ গার্ল!

প্রাণখোলা হাসি রবার্টসনের। সত্যই রবার্টসন স্কুল খুলে দিলে। পরিচ্ছন্ন পরিবেশে পাহাড়ী শিশুদের মেলা; উন্মাদনায় ভরে ওঠে সর্বেশ্বরের মন। সর্বেশ্বর আজ মাষ্টার, সর্বেশ্বর আজ শিক্ষক। পাহাড়ী কিশোর-কিশোরীদের পাঠ দিতে দিতে এক এক সময় আনমনা হয়ে ওঠেন সর্বেশ্বর। হ্যাঁ, মনে পড়ে—একদিন এক কিশোরীকে প্রথম পাঠ দিয়েছিলেন তিনি,—শ্যামলীকে, শ্যামাকে।

আর আজ? আজ তাঁরই সহযোগী আর এক অজ্ঞাতকুলশীলা নারী; হিন্দু কি মুসলমান, বাঙালী কি পাহাড়ী—কিছুই বোঝবার উপায় নেই। সবাই বলে জিপ্‌সী,—বেদের মেয়ে।

পাগলী লালিয়া। পাগলামি তার সেরে গেছে। পাহাড়ী শিশুদের নিযে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে লালিয়া,—রবার্টসন্ সাহেবের কুড়োনো মেয়ে। বিস্মৃতির অতলে ডুবেছে তার অতীত। বাপ-মা কাউকে তার মনে নেই। তাব হাবভাব দেখে মনে হয়, নিজেকেই কখনও কখনও সে ভুলে যায়।

কোমরে আঁচল বেঁধে এলো চুলে ছুটে বেড়ায় লালিয়া। লেখাপড়া শিখেছে সে। রবার্টসনের যত্নে অনেকখানি শিখেছে। ছোটরা তাকে ভালবাসে। কুলী ছেলেমেয়েরা তাকে ঘিরে থাকে।

কালো পাথরে খোদাই-করা ছোট-বড শিশু। কোথা থেকে আমদানি করেছে কে জানে? বুড়োরা বলে,—হেই বাবু, আমাদের দেশ সেই সাঁওতাল দেশে। এমনি ছোট ছোট পাহাড়ে-ঘেরা আমাদের দেশ। মাটিতে আভ্ চিক্ চিক্ করে। ফাগুনে চৈতে মহুয়া মন মাতায়। শিমুল আর পলাশ আগুন ছড়ায় পাহাড়ে-পাহাড়ে। তোদের এদেশে মহুয়া নেই; বর্ষা-ভাদরে কেবল বিষ্টি, কেবল বিষ্টি। অত জল, অত পানি মোদের ভাল লাগে না।

কেন এসেছিলে দেশ ছেড়ে?

কেন এসেছিলাম? এক বাবু গিয়ে বলেছিল, লোভ দেখিয়েছিল—কাঁড়ি কাঁড়ি মদ দেবে; কাজ দেবে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেবে, শুধু পাহাড়ে পাহাড়ে মাটি কোপাতে হবে; চায়ের চাষে যোগান দিতে হবে,—আর কিচ্ছু না।

সে সব নিশ্চয়ই পেয়েছ?

হাসত সে বুড়ো সর্দার! পেয়েছি বাবু সাহেব! কিন্তু যা হারিয়েছি, তা আর পাব না। সেই বাবু বলেছিল,—যখন খুশি দেশে ফিরতে পারবে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে দেশে ফিরে আসবে। রেলগাড়ি চেপে যখন খুশি আরাম করে দেশে ফিরবে।

ফিরে গেছলে কোনদিন?

হো-হো করে হাসে সর্দার! সে হাসিতে বেদনা ঝরে পড়ে। হেই কোন্ বছরে এসেছি বাবু সাহেব। আমার বুড়ী-মা বুঝি আর বেঁচে নেই। যাওয়া আর হয় নি। এখানে সাহেব বলে, গিরমিট আছে, টিপ-সই দিয়েছি; কুড়ি বছরের গিরমিট।

গিরমিট মানে এগ্রিমেণ্ট! কুড়ি বছরের এগ্রিমেণ্ট। আর ফিরে যেতে পারে নি বুড়ো। এখানেই সংসার বেঁধেছে; মায়া পড়ে গেছে;—গৃহস্থালি পেতেছে; ছেলে-মেয়ে, নাতি-পুতি রয়েছে; সবাই কাজ পেয়েছে। ফিরে যাবার সূত্র হারিয়ে গেছে। আসামের চা বাগিচার সাদা সাদা ফুলেব মাঝে মহুয়া মধু নেই; চিরদিনের জন্য হারিয়েছে এরা। ভাষাও হারিয়েছে—হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া, আসামী আর ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী মিশে গড়ে উঠেছে এদের বুলি।

লালিয়ার সুন্দর ও সহজ গতিভঙ্গী মুগ্ধ করে সর্বেশ্বরকে। কুলী-শিশু কোলে নিয়ে লালিয়া আদর করে; এর গাল টিপে দেয়, ওকে চুমু খায়। খিল খিল করে হাসে তারা। কখনও বা হাততালি দেয় লালিয়া। স্কুল নয়, পাঠশালা নয়, রবার্টসনের স্কুলের উঠোনটা হয়ে ওঠে পাহাড়ী আর কুলী শিশুদের খেলাঘর।

পাহাড়ীরা প্রথম প্রথম এড়িয়ে থাকত তাঁদের। কিন্তু লালিয়া তাদের বস্তিতে বস্তিতে যায়; তাদের কি যে বোঝায় কে জানে। তারাও আসে দলে দলে।

প্রকৃতির শিশু তারা। গায়ের তামাটে রঙ। কানে বড় বড় তামার কুণ্ডল। পুরুষদেরও চুলে খোঁপাবাঁধা। বড় বড় মেয়েরা লুঙ্গির মত করে মোটা কাপড় জড়িয়ে থাকে কোমরে। বুকের উপরে মোটা একটা আবরণ। কারও বা তাও উন্মুক্ত

শিশু কেন? পাহাড়ী কিশোরীরাও প্রায় উলঙ্গই থাকে। শুধু কোমরে

লুঙ্গির মত কাপড়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা। উন্মুক্ত বক্ষে উদ্ভিন্ন যৌবনের জোয়ার দেখা দিয়েছে; কড়ি আর বড় বড় পুঁতির মালার লহরী কণ্ঠে দুলিয়ে সে যৌবন জোয়ারকে তারা বাঁধতে চায়; কিন্তু তামাটে স্বর্ণবৃত্ত প্রজাপতির মতই বিচিত্র দেখায়।

কিচির মিচির, কিড়িং কিড়িং কি বলে তারা সর্বেশ্বর বোঝেন না। আশ্চর্য! রবার্টসন তাদের কথা বোঝে; আর লালিয়াও বোঝে। ওদের দেখলে সর্বেশ্বরের করুণা জাগলেও কেমন যেন ভয় লাগে।

লালিয়ার ভয় নেই। সর্বেশ্বরকে টেনে নিয়ে যায়; পাহাড়ী বস্তিতে মাইলের পর মাইল ঘোর জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে যেতে লালিয়া ভয় করে না।

লুসাই সর্দার হুচুং একদিন লালিয়াকে সাবধান করে দিয়েছিল,—দিদিসাহেব! অত দূর যাস নি। ওরা খারাব লোক আছে। মেরে ফেলতে পারে।

সত্যি, আশে-পাশের লুসাইদের বুনোভাব কিছু কিছু কেটে গেলেও পাহাড়ের অভ্যন্তরে একেবারে আদিম বন্যেরা রয়েছে। সভ্য মানুষ দেখলে তারা ভয় পায়। ভয় পায় বলেই লুকিয়ে বিষ-মাখানো তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলে।

লালিয়া বলে,—ভয় কি মাষ্টার? একদিন তো মরতেই হবে। ওরা বড় সুন্দর। বুনো মানুষগুলো বড় সুন্দর। দেখ নি ওরা আমাদের মত মুখোশ পরে থাকে না। এদের ভেতর-বাহির দুইই সমান।

রবার্টসন বলেন,—এদের জাগাতে হবে। ইউ মাস্ট টেক্ রিস্ক্ মাই বয়! কিন্তু দ্রুত নয়! স্লোলি,—এ বিট স্লোলি।

মিসেস্ রবার্টসন বললন,—ইয়েস; মিশনারীদের দেখেছ? তারা লোভ দেখিয়ে ওদের হাত করে। বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখায়।

রবার্টসন বলেন,—বাট উই আর নট মিশনারিজ। আমরা ওদের ভালবাসি। ওদের ভালবাসা দিতে হবে, ধর্ম নয়; ভয় দেখিয়ে ক্রুশ বিলি করতে হবে না। জ্ঞানের আলো দিতে হবে। মাই গুড্ গার্ল লালিয়া! আই ওয়াণ্ট এ সন্-ইন্-ল।

সেই যে অজ্ঞাতবাসে জীবনের নূতন পথে যাত্রা; আজও সে যাত্রা শেষ

হয় নি সর্বেশ্বরের। সেদিন ছিল লালিয়া, রবার্টসন আর মিসেস্ রবার্টসন। আর আজ এসেছে অনেকে; পাহাড়ীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে তাঁরই মত ভদ্রঘরের ছেলেরা। নূতন বাণী আকাশে-বাতাসে—বন্দেমাতরম্।

কথাটা ভুলেই গিয়েছিলেন সর্বেশ্বর! আবার যে প্রাণমাতানো এ ধ্বনি শুনতে পাবেন, তা ভাবতেও পারেন নি। তাঁদের সেই গোপন মন্ত্রে গোপনে দীক্ষা নয়,—আজ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে আসমুদ্র-হিমাচল।

নিরস্ত্র সংগ্রাম! গোলাবারুদ, বোমা, পিস্তল—কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। শুধু জাতীয় পতাকা হাতে এগিয়ে যেতে হবে; আর বলতে হবে,—বিলাতী জিনিস ছাড়; অসহযোগ, অহিংস অসহযোগ। অচল করে তোল বিদেশী শাসনযন্ত্র।

আমাদের স্বাধীনতা খর্ব করেছে এরা, আমাদের পরার কাপড় আমরা তৈরী করব; আমাদের নুন আমাদের-সাগরের জল থেকে আমরা তৈরী করে নেব।

গাঁজা, ভাঙ্, তাড়ি, মদ স্পর্শ করব না! এ প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

এতে যদি আইনভঙ্গ হয়, হোক। এ আবার কোন্ আইন? ভগবানের দেওয়া আলো, বাতাস, জল—তাতেও কি আমাদের অধিকার নেই?

সর্বেশ্বর ভাবেন। অতীতকে ভুলতে পারেন না। তাঁর বিপ্লবী অতীত জীবনকে ভুলিয়ে দিয়েছিল রবার্টসন সাহেব। আর ভুলিয়ে দিয়েছিল লালিয়া। আজ তাদেরও ভুলতে হচ্ছে।

কিন্তু এই যে আন্দোলন, এই যে আসমুদ্র-হিমাচল কেঁপে উঠেছে; তার মধ্যেও যেন কোথায় ফাঁক দেখতে পান সর্বেশ্বর। রবার্টসনই বলেছিল—ছোট যারা, নীচু যারা, আর বুনো হয়ে যারা রয়েছে, তাদের বাদ দিয়ে তোমরা এগিয়ে যেতে পারবে না সর্বেশ্বর।

সর্বেশ্বরও সে কথা বুঝেছিলেন। লালিয়াকে পেয়েছিলেন কর্মসঙ্গিনীরূপে। পাহাড়ীদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সত্যই নূতন কাজের সন্ধান পেয়েছিলেন সর্বেশ্বর। তাঁর ভয় কেটে গিয়েছিল; কথায় কথায় খিলখিল করে হাসত লালিয়া।

লালিয়া বলত,—চল, চল মাষ্টার! ওই যে, ওই যে বস্তি দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ী

পথে বনজঙ্গল ভেঙ্গে চলত দু জনে। লালিয়া কখনও বা বলত, আর পারছি না। আমার হাত ধরে টেনে নাও।

সর্বেশ্বরও ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। কোন দিন বা বনের মধ্যে চাঁপাফুলের গাছ দেখে কেমন বেয়ে বেয়ে তার উপর উঠে পড়ত লালিয়া। তার পর পুষ্পবৃষ্টি হত সর্বেশ্বরের মাথায়। আজ সে সব কথা মনে পড়লে সর্বেশ্বরের হাসি পায়।

রবার্টসনের পাঠশালা। দুপুরে ছেলেমেয়েদের পালা। পুরুষ আর নারীরা কাজে বেরিয়ে যায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আসে পাঠশালায়। কচি বাচ্চাদের পর্যন্ত কেউ কেউ রেখে যায়। ছোট ছোট খাটিয়ায় বিছানা পাতা। কেউ বা দোলনায় দোল খাচ্ছে। আর লালিয়া শিস্ দিচ্ছে কিংবা ছড়া কাটছে—

দোল দোলে দোল সোনার টিয়ে—
দোল রে মানিক দুধ পিয়ে—
দোল দোল দোলনা
মাকে যেন ভুলিস না।

মিসেস রবার্টসন যোগ দেন দুপুর বেলা। স্লেট, পেনসিল আর বর্ণপরিচয়ের বই আসে শহর থেকে। বিচিত্র খেয়াল রবার্টসনের। কুলীকামিনরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে ছেলেদের দেখে যায়। তারাও পায় নূতন জীবনের আস্বাদ।

সন্ধ্যা থেকে বসে বিচিত্র আসর ; কত দেশের কত গল্প করে রবার্টসন সাহেব। বাইবেল কোরান আর মহাভারতের কত কাহিনী বলে। ধর্মের কথা নেই তাতে, আছে শুধু মানুষের অন্তর জাগাবার মন্ত্র। সর্বেশ্বর এ কৌশল এ মন্ত্র শিখলেন রবার্টসনের কাছে।

বিপ্লবী জীবনে নূতন বিপ্লব। তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মাঝে কত কোটি যে লুকিয়ে আছে এই পাহাড়ে জঙ্গলে। মাঝে মাঝে মহেন্দ্রদার কথা মনে পড়ে যায়। সর্বেশ্বরের মনে উদ্দীপনা জাগে। এদের জাগিয়ে তুলতে হবে। এরাও মানুষ। এরা জাগলে দেশের স্বাধীনতা আটকে থাকবে না। এরাই হবে তার রক্ষক। এদেরই বঞ্চিত করে মহাপাপ করেছিল আর্যরা। দস্যুর মত এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এদের যা কিছু ছিল, সবই কেড়ে নিয়েছিল। তবু এরা স্বাধীনতা দেয় নি,

মাথা নত করে নি এরা। বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে হাজার হাজার বছর এরা বনেরই মানুষ হয়ে গেছে। স্বাধীনতার মন্ত্র এদের কাছেই শিখতে হবে।

বিপ্লবী মহেন্দ্রদার কথারই প্রতিধ্বনি করে রবার্টসন সাহেব। খাঁটি ইংরেজের বাচ্চা এই রবার্টসন। মিথ্যা নয় তাঁর কথা।

বুঝলে সর্বেশ্বর! এদের বাঁচিয়ে তুলতে হবে। আমরাও বর্বর ছিলাম, দস্যু ছিলাম। তুমি ইতিহাস পড় নি? হিস্ট্রী অব্ ইংল্যাণ্ড? জান ইংরেজ কারা?

হো হো করে হেসে ওঠে রবার্টসন। তার পর বলে,—রোমানরা এসেই আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিলে। আমরা কিন্তু পালিয়ে যাই নি। এরা—এই তোমাদের দেশের অনার্যরা পালিয়ে গিয়েছিল। তা না হলে, এমন বিভেদ থাকত না। কিন্তু এখন সময় এসেছে, এবার এরা প্রতিশোধ নেবে। সাবধান হতে হবে।

সাহেবের কথা হেঁয়ালির মতই ঠেকত সর্বেশ্বরের কাছে। সর্বেশ্বর এখনও বুঝতে পারেন না কেন এরা প্রতিশোধ নেবে। শান্ত নিরীহ এরা। নাগা আর লুসাইরা হিংস্র প্রকৃতির হলেও সমতলের এই পোশাক-পরা ভদ্র মানুষদের সঙ্গে তারা ভাল ব্যবহারই করে। এদের না ঘাঁটালে কারও অনিষ্ট করে না। এদের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে দেখেছেন সর্বেশ্বর। সত্যি এরাও মানুষ; কিন্তু এরা বন্য।

রবার্টসন বলতেন,—বুঝলে না সর্বেশ্বর! আই থিঙ্ক ইউ ডু নট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড। এরা জাগছে সর্বেশ্বর। তুমি না জাগালেও এরা জাগছে। ইংরেজের সভ্যতার আলোক সূর্যের আলোর চেয়েও প্রাণমাতানো। পাহাড়ে জঙ্গলে, আনাচে-কানাচে সে আলো গিয়ে পড়ছে। এদের জাগিয়ে তুলছে আমারই দেশের মিশনারীরা। যীশুর শিষ্যেরা—স্বর্গের দূত হয়ে তোমাদের ঘরে ঘরে আলো বিতরণ করতে এসেছে।

হো হো করে হাসে রবার্টসন,—এদেশে এসেছে ধর্ম দিতে! ধর্ম যে এদেশের আকাশে-বাতাসে আর ধূলিকণায়। এদেশের মাঝি-মাল্লা গান গায়—

মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে

আমি আর বাইতে পারি নে।

—কি মার্ভেলাস আইডিয়া! বুঝলে সর্বেশ্বর, তোমাদের কালিয়া সোনা কদম-

তলায় বাঁশি বাজায়। এখানে যীশুর বাঁশি কেউ শুনবে না। তাই মিশনারীরা বনে-বাদাড়ে ঢুকেছে; যেখানে ধর্ম নেই,—অধর্ম নেই—সহজ সরল মন; তাদের মনেই ছাপ দিতে লেগে গেছে তারা। কিন্তু বড় অকালে এদের ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছে সর্বেশ্বর। এর ফল ভাল হবে না। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করছে অকালে।

আবার সেই প্রাণখোলা হাসি।

—কেন? তাঁরাও ভাল কাজই করছেন সাহেব! এদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলছেন।

—বুঝলে না? তোমাদের সর্বনাশ করছেন মাই বয়! এরা তোমাদের পর হয়ে উঠছে। ধর্মের বিভেদ বড় সাংঘাতিক। এদেশের লোক দেশকে বোঝে না, বোঝে ধর্মকে।

সর্বেশ্বর বলেন,—তোমার কথা আমি বুঝতে পারলাম না সাহেব। এরা তো কেমন সভ্য-ভব্য হয়ে উঠছে। এর আগে কী নোংরা হয়ে থাকত এরা।

রবার্টসন বলে,—তা ঠিক বটে; তবে সভ্য-ভব্য হয়ে উঠলেই মানুষের লোভও বেড়ে যায়। আর মিশনারীরা কি মন্ত্র দিচ্ছে জান? তারা বলে দিচ্ছে,—এই উঁচু জাতের লোকেরা, যারা বাড়ি ঘর করে বেশ সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ পরে শহরে গাঁয়ে বাস করছে, এরা তোমাদের শত্রু। এই সব শহর, এই সব সুন্দর ঘরবাড়ি এইগুলি তোমাদেরই ছিল। এরা সব কেড়ে নিয়েছে। এরাই তোমাদের বনে জঙ্গলে তাড়িয়ে দিয়েছে। তোমরা নুন পাও না, আগুন পাও না, কাপড় পাও না। সবই এরা ভোগ করছে। হাজার হাজার বছর ধরে এরা তোমাদের ঠকিয়ে আসছে। তাই তোমাদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

বিস্ময়বিমূঢ় সর্বেশ্বর রবার্টসনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

রবার্টসন বলে,—মিশনারীরা তোমাদের অনিষ্ট করছে সর্বেশ্বর। তারাই এদের বন্ধু সেজে এদের খ্রীষ্টান করে তুলছে।

সর্বেশ্বর বলেন,—এরা যদি খ্রীষ্টান হয়ে যায়, তাতে ক্ষতি কি?

রবার্টসন বলে,—কোন ক্ষতি নেই?—দেখছ না, এদেশের প্রতি এদের বিদ্বেষ জেগে উঠছে সর্বেশ্বর। তোমাদেরই দোষে এটা হচ্ছে। তোমরা এদের জেনে

নিতে পার না সর্বেশ্বর! এমন সুন্দর এ দেশ। এদেশের মানুষগুলোর অন্তরই আলাদা। তোমরা মূর্তিপূজা কর, আর আমাদের দেশের লোক ভাবে তোমরা পুতুল পূজা করছ। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। সত্যি তোমরা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পার সর্বেশ্বর! এদেশের গাছ-পাথর, আকাশ-বাতাস জুড়ে নানা রূপে নানা দেবতা। সত্যি ঈশ্বর নানা রূপ ধরে আপনি ধরা দেন মানুষের কাছে। মূর্তিপূজা মিথ্যে নয় সর্বেশ্বর! বহুবিচিত্র এদেশে বহুরূপে ঈশ্বরের প্রকাশ,—এ আমি অস্বীকার করতে পারি নে।

সর্বেশ্বর রবার্টসনের কথাবার্তা শুনে মুগ্ধ হন। তিনি বুঝেছিলেন, মহাজ্ঞানী এই রবার্টসন। সত্যিই এদেশকে সে ভালবাসে। এ দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আত্মাকে জেনে নিয়েছে রবার্টসন। আশ্চর্য!

রবার্টসন বলে,—আমি ফিলোজফির ছাত্র ছিলাম, ভাল করেই তা পড়েছি। তোমাদের ইণ্ডিয়ান ফিলোজফি আমায় মুগ্ধ করেছে; শুধু পাঠ্য বই নয়, ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে যত বই পাওয়া যায়, সবই তখন আমি পড়ে নিয়েছিলাম। ম্যাকস্-মূলারের বই আমাকে বেশি সহায়তা করেছিল। কি জানি বড় লোভ লেগে গেল। এ দেশ দেখবার নেশা ছাড়তে পারলাম না; ইচ্ছা করলেই তোমাদের শাসক হয়ে এ দেশে আসতে পারতাম সর্বেশ্বর! কিন্তু জানতাম তাতে এ দেশকে দেখা যাবে না। তাই এ বেশেই এসেছি।

হো হো করে রবার্টসনের প্রাণখোলা হাসি।

—আধ-পাগলা এক সাধু এসেছিল সর্বেশ্বর! সে-ই আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেছে। সে-ই আমায় বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, এ জগৎটাই মহামায়ার খেলা। তুমি, আমি, যদু, মধু সবই মহামায়ার সন্তান। সমস্ত বিশ্বটা জুড়েই তিনি রয়েছেন। আমাদের সকলের মাঝেই তিনি আছেন। জগৎটা মিথ্যা নয়, মায়া নয় কিছুই। তোমার আমার মা—সেই মহামায়ারই অংশ; তাঁরাই মায়ারূপে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। মহামায়াই মা হয়ে আমাদের লালন-পালন করছেন। ভাই, বোন, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র কিংবা কন্যা সকলের মাঝেই তিনি আছেন। এই সমস্ত পৃথিবী, আকাশ ও বাতাসে তিনি ব্যাপ্ত আছেন; তা না হলে আমরা

বেঁচে থাকতে পারতাম না।

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক সর্বেশ্বর সেদিন চমকে উঠেছিলেন রবার্টসনের কথা শুনে। তাঁর নিজের দেশকে, তাঁর নিজের ধর্মকে এমন করে একজন বিদেশী বিধর্মী জানতে পেরেছে, অথচ নিজেরা অবহেলা করছেন এ দেশের সংস্কৃতি ও ধারাকে। লজ্জারক্ত হয়ে ওঠে সর্বেশ্বরের মুখ।

রবার্টসন্ সর্বেশ্বরের চোখ ফুটিয়ে দিলে। নূতন চোখে নিজের দেশকে দেখতে শিখলেন তিনি। নিজের দেশের সত্যিকার পরিচয়ে মন দিলেন সর্বেশ্বর। রবার্ট-সনের পাঠাগারে ইংরেজী, বাংলা আর সংস্কৃত বইয়ের অভাব ছিল না। সর্বেশ্বর নূতন করে দেশের ইতিহাস পাঠ করতে সুরু করলেন। রবার্টসনই বুঝিয়েছিল,—অগস্ত্য-যাত্রার কাহিনী, আর পূর্বাচলে কপিল মুনির জয়যাত্রার কথা। কপিল মুনির কৌশলেই গঙ্গাকে আসতে হয়েছিল পূর্বদেশে। গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গম ঘটিয়ে কপিলমুনি আরও পূব দিকে যাত্রা করেছিলেন। কাছাড়ের জঙ্গলে ভুবন আর সিদ্ধেশ্বরে কপিলমুনির সিদ্ধাশ্রম তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। মানুষকে মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। শিব আর শক্তিকে একাসনে বসাতে হবে।

রবার্টসনের সেই পাঠশালার আদর্শেই সর্বেশ্বরের এই নূতন অভিযান। সেই আশ্রয় তাঁকে ছাড়তে হয়েছিল। নির্মম সে কাহিনী। সে কাহিনী লিখে রেখেছেন সর্বেশ্বর! তাঁর জীবনের অতীত অধ্যায় গাঁথা আছে তাঁর ডায়েরীর পাতায় পাতায়।

পাঠশালার কাজ চলে। সকাল ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভার অপূর্ব প্রার্থনামন্ত্র; —মঙ্গলময়, মঙ্গল কর, নির্মল কর, সুন্দর কর হে ভগবান।

অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো
সুন্দর করো হে।

তার পর আনন্দমঠের সেই "বন্দেমাতরম্" গান।

উল্লাসে নেচে নেচে হাততালি দিতেন রবার্টসন সাহেব। মিসেস্ রবার্টসনও সে প্রার্থনায় যোগ দিতেন। লালিয়া হাত জোড় করে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকত।

পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠল পাহাড়ীদের জীবন। লুসাই কিশোর-কিশোরী যোগ দিল এ পাঠশালায়। খ্রীষ্টান মিশনারীদের টনক নড়ল। কিন্তু রবার্টসনের অদম্য উৎসাহ কেউ নেভাতে পারলে না। রবার্টসন বলে, কারও কোন ক্ষতি তো আমি করছি নে। এদের কোন ধর্মও দিচ্ছি নে; রাজদ্রোহী করেও তুলছি নে। আর খ্রীষ্টান হতে কিংবা হিন্দু হতেও মানা করছি নে। এদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলছি। এতে কার কি আপত্তি থাকতে পারে।

পাদরী উইলি সাহেবকে নিয়ে পুলিশের কর্তা রীড্ সাহেব দু-চার দিন রবার্টসনের কাছে আনাগোনা করেও তাঁকে নিরস্ত করতে পারেন নি।

শহর থেকে মাঝে মাঝে সাহেবরা রবার্টসনের এ বিচিত্র পাঠশালা দেখতে আসত। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লয়েড সাহেব রবার্টসনের বন্ধু ছিলেন। তিনি এলে দু-চার দিন এখানে থাকতেন। মিস্টার লয়েড সর্বেশ্বরকে উৎসাহিত করতেন।

রবার্টসন বলতেন,—দেখ লয়েড! আমি তো ধর্মপ্রচার করতে আসি নি। আমি এসেছি আমার কাজে। যাদের নিয়ে কাজ করছি, তাদের যদি কিছু উপকার হয়, তা কি আমি করব না?

তার পর উচ্চহাস্যে বলতে থাকতেন,—এ লেবার মে বি দি প্রাইম মিনিস্টার অব্ গ্রেট্ ব্রিটেন ওয়ান ডে। ইজ্ ইট্ নট্ ট্রু? সেই লেবার নিয়েই আমার কারবার। এদের বাঁচিয়ে না রাখলে আমাদের চলবে কি করে?

লয়েড সাহেব হেসে হেসে মাথা নাড়তেন। তিনি যখন আসতেন তখন পাহাড়ীদের জন্য বিস্তর কম্বল আর কাপড় নিয়ে আসতেন। মিসেস্ রবার্টসন আর লালিয়া তা পাহাড়ীদের বিলি করত। কুলী-শিশুরা পেত রঙ-বেরঙের জামা। কিশোর-কিশোরীরাও নূতন সাজে সাজত।

•

মিসেস রবার্টসনের কন্যার জন্ম। সেদিন শরৎ কালের পূর্ণিমা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন। নার্স আর ডাক্তার এসেছে শহর থেকে। হঠাৎ সাহেবের বাংলো

থেকে শোনা গেল শাঁখের আওয়াজ; পাহাড়ী বস্তী আর কুলী বস্তীতেও তার প্রতিধ্বনি। রবার্টসনের সঙ্গে পরামর্শ করে লালিয়াই এ ব্যবস্থা করেছিল।

সাহেব নবজাত কন্যার নাম রাখলে সুজাতা।

রবার্টসন বললে,—জানলে সর্বেশ্বর! সুজাতা কেন এর নাম রাখলাম? তোমাদের লর্ড বুদ্ধকে সুজাতা পায়েস খাইয়ে ছিল। এ মেয়ের হাতে পায়েস খেয়ে আমিও সংসার ছেড়ে পালাব।

হায়! সুজাতার হাতে পায়েস খাওয়া হয় নি রবার্টসনের, তার আগেই তাঁকে সংসার ছেড়ে পালাতে হয়েছে।

এমনি উল্লাসে ও স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটে।

লালিয়ার মধ্যে আসে এক অপরূপ পরিবর্তন। সকলের মাঝে থেকেও সে যেন নিতান্ত একা। আনমনে গান গায়, কখনও বা চোখে জল ঝরে। কখনও বা আপন মনে হাসে। সাহেব সত্যই বলেছে এ যে কি জাতের মেয়ে তা চেনা কঠিন। চোখ দুটো কটা! চুলেও আছে পিঙ্গল আভা। কাপড় পরায়ও আছে যাযাবরী ঢঙ্। কিন্তু পাগল হল কেন? কানে ভেসে আসে লালিয়ার গান—

সোনার কালিয়া আমার ফুলে ফুলে
আকাশে হেরি গো তারে দেখি যে বাতাসে।
আমার অঙ্গে সে গো, আমারি ছায়ায়
কেমনে ভুলিব তারে বল গো আমায়॥

কি বলতে চায় লালিয়া? নিশ্চয়ই এর জীবনে ব্যর্থতার কোন আঘাত আছে। নিঃসঙ্গ জীবনে বৃন্তচ্যুত পাগলী লালিয়া হয়তো বা নিজের অতীতকে স্মরণ করে!

উদ্ভিন্নযৌবনা লালিয়া। তার মূর্তি, তার সহজ সরল স্পর্শও সর্বেশ্বরের অন্তরে আলোড়ন জাগায়। তবু দৃঢ়সংযমী সর্বেশ্বর; বিপ্লবীদলে তাঁর কঠোর শিক্ষা। সাবধান হয়ে চলেন সর্বেশ্বর। কিন্তু রবার্টসনের রসিকতা থেমে যায় নি। হঠাৎ বলে,—মাই মিশন ইজ সাকসেসফুল। আই ওয়াণ্ট এ সন্-ইন্-ল সর্বেশ্বর। এখন নিশ্চয়ই তোমার মত হবে।

সর্বেশ্বর উত্তর দিতে পারেন না। নিজের বংশমর্যাদা, নিজের অতীত তাঁকে সচেতন করে তোলে। তবে কি তাঁর অতীতের সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যতের কোন যোগসূত্রই থাকবে না? লালিয়াকে বিবাহ করতে হবে! কি পরিচয় আছে তার?

সাহেব যেন সর্বেশ্বরের মনের কথা বুঝতে পারে। মৃদু মৃদু হাসি খেলে সাহেবের মুখে।

—কি ভাবছ সর্বেশ্বর? তোমার বংশের কথা? তোমার জাতের কথা?

সর্বেশ্বর ভাবেন,—সাহেব কি সর্বজ্ঞ? মনের কথা সে জানলে কি করে?

রবার্টসন বলে,—নেভার মাইণ্ড মাই বয়! লালিয়া নারী,—লালিয়া মানুষেরই মেয়ে। তার অতীত নেই। সবই ভুলে গেছে। তুমিও তোমার অতীতকে ভুলে যাও। আর তোমার অতীতের সঙ্গে তোমার আর কি কোন সম্পর্ক আছে সর্বেশ্বর? ইউ আর এ গ্রাজুয়েট অব দি ইউনিভার্সিটি—সে পরিচয় দিয়ে কি আর তোমার সমাজে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে? না কখনই পারবে না। তা হলে এত ভয় কেন? শুধু এটুকু জানতে চাই ডু ইউ লভ্ লালিয়া?

সর্বেশ্বর মাথা নত করেন।

রবার্টসন সাহেব হো হো করে হেসে উঠে বলে,—জানি তুমি রাজী হবে সর্বেশ্বর! আই শ্যাল বি এ ফাদার-ইন্-ল। খাঁটি হিন্দুমতে বিবাহ। অল্ রাইট্।

রবার্টসন্ সাহেব লালিয়ার বিবাহ দেবে। কিন্তু একটা দুঃসংবাদে সবই বিপর্যস্ত হতে বসল। সর্বত্রই উৎকণ্ঠার ছায়া। লুসাইরা বিদ্রোহী হয়েছে; তারা যে কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ইংরেজ কিংবা বাঙালী কারও নিস্তার নেই। কুড়াং নদীর বাঁকের সেই সুন্দর চা বাগান তারা হঠাৎ সেদিন লুট করে গেছে। সাহেবদেরই তারা আক্রমণ করেছিল, কিন্তু বাবুরা সাহেবদের বাঁচাতে গিয়েই তাদের শত্রু হয়ে উঠেছে। নির্বিকারে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তারা।

রবার্টসন বলে,—কেন তারা আমাদের মারবে? কখনও তা হতে পারে

না। আই লভ্ দিজ মেন। আই লভ্ দিস কাণ্ট্রি। এরা তো এত বর্বর নয়, নিশ্চয়ই এর কোন কারণ রয়েছে। কেউ এদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছে।

রবার্টসন আশেপাশের পাহাড়ীদের ডেকে জিজ্ঞেস করলে,—সত্যি তোমরা আমাদের হত্যা করবে? কেন? কি করেছি আমরা?

এরা কোন উত্তর দিতে পারে না। ছচুং সর্দার বলে, কয়দিন আগে কয়েক জন বাঙালীবাবু এসে আমাদের বলছিল,—সাহেবদের মেরে তাড়িয়ে দে। এ সব তোদেরই হয়ে যাবে। আমরা তাদের কথা বুঝতে পারলাম না সাহেব!

দুর্দান্ত যুবক মিরাঙ্ বললে,—ভয় নেই সাহেব! আমরা আছি। আমরা তোদের রক্ষা করব। তবে কি জানিস—তোদের ওই স্কুল আর এই কারবার পাহাড়ী সর্দারদের সহ্য হচ্ছে না। পাদরী সাহেবও ওদের কি বুঝিয়েছে। তারা বলছে, তোরা সব বিগড়ে দিচ্ছিস।

আর এক বুড়ো সর্দার বলে,—ফাদার উইলি রাগ করেছে সাহেব! কেউ আর ক্রুশ নিয়ে যীশুর ভজনা করতে যায় না। ফাদার বলে গেছে,—যীশু রাগ করেছে; তার শাস্তি তুই পাবি।

রবার্টসন এদের কথা শুনে হো হো করে হেসে ওঠে।

—যীশু! যীশু রাগ করেছেন? কোথায় যীশু! সাহেব মেরে নির্মূল করবে? বেশ, বেশ,—কি বল সর্বেশ্বর! তোমার সেই বিপ্লবী বন্ধুরা নিশ্চয়ই। কুছ পরোয়া নেই। আই এম রবার্টসন,—এ ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া; আমার রক্ত দিলে যদি এদেশ স্বাধীন হয়, আমি এক্ষুনি দিতে রাজি আছি।

সর্বেশ্বরের মনে সংশয় জাগে। দু বছর আগেকার সেই নির্মম বিদায়ের দৃশ্য মনে পড়ে। হ্যাঁ, বিজয়! বিজয়ই প্রতিজ্ঞা করেছিল, বিপ্লবের পথ সে পরিত্যাগ করবে না। চা-বাগানে তার কাজ সুরু করবে। হত্যা করবে ইংরেজদের!

তা হলে নিশ্চয়ই এতদিনে বিজয় দত্ত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বাঙালীবাবুরা আনাগোনা করছে পাহাড়ে পাহাড়ে! আবার কি বিপ্লবীদল সারা ভারতে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে? বিচ্ছিন্ন সর্বেশ্বর। কোন খবরই তিনি রাখেন না। কোন খবরই থাকে না সংবাদপত্রে।

মিলিটারী আর রিজার্ভ পুলিশ চা-বাগানে টহল দিতে এসেছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লয়েড সাহেব নিজে থেকে একদল আর্মড্ পুলিশ পাঠিয়েছেন এখানে। রবার্টসন্ বললে,—না, না, আমি কারও সাহায্য চাই নে। তারা আমায় মারবে না।

ডায়েরীর পাতা উলটে যান সর্বেশ্বর। ডায়েরী নয়, স্মৃতির পাতা।

লালিয়া আর সর্বেশ্বরের বিবাহ। দিন স্থির করেছেন রবার্টসন্। তিনিই কন্যা-সম্প্রদান করবেন,—কি তাঁর আনন্দ।

রবার্টসন বললেন,—ঠিক থেকো সর্বেশ্বর। পুরুত লাগবে না; বৈদিক মন্ত্র জানি আমি। অগ্নি সাক্ষী করে সম্প্রদান করব। আমি সব শিখে নিয়েছি।

এদিকে নানা গুজব ছড়াতে থাকে। সন্ধ্যা হলেই আতঙ্কে কুলীবস্তীগুলি নিঝুম হয়ে যায়। বাঙালীবাবুদের কেউ কেউ স্ত্রীপুত্রপরিবার দূরে শহরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কেউ বা লম্বা ছুটি নিয়েছেন। লুসাইরা ক্ষেপে উঠেছে। কখন যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, তার ঠিক-ঠিকানা নাই।

রবার্টসনের পাঠশালার কাজ ঠিকই চলে। সর্বেশ্বরের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে শিউরে ওঠেন তিনি। বিপ্লবীদের কার্যকলাপ স্মরণ করলে বুকটা কেঁপে ওঠে। বিজয় দত্তের জিঘাংসার মূর্তি তাঁর মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি মারে।

লালিয়ার লজ্জারুণ মূর্তি আজ তাঁর সামনে। তাঁদের ভাবী সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছেন সর্বেশ্বর; স্বীকার করেছে লালিয়া। উভয়েই এক পথের যাত্রী,—মানবতার ধর্মে দীক্ষা তাঁদের। রবার্টসনই দিয়েছেন সে দীক্ষা।

আজ সে শুভদিন। কুলী-বস্তী নিঝুম হলেও রবার্টসনের বাংলো আজ আনন্দ-মুখর। কুলীরমণীরা শাঁখ বাজাচ্ছে। মিসেস্ রবার্টসন তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। রবার্টসন্ গরদের জোড় পরেছেন। দেবদারু আর চন্দন কাঠে জ্বলছে হোমের আগুন।

সর্বেশ্বর মন্ত্র উচ্চারণ করছেন—"মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু।"

সর্বেশ্বরের হাতের মুঠির্ মধ্যে লালিয়ার হাত ; ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

এমন সময় হল্লা উঠল। পাহাড়ীরা চা-বাগান আক্রমণ করেছে। হৈ-হৈ রৈ-রৈ বীভৎস আওয়াজ। আকুল কণ্ঠে চীৎকার করছে কুলীকামিনরা। আর চীৎকার করছে আশেপাশের শান্ত পাহাড়ীরা। বন্দুক, পিস্তল ও বোমার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে।

কুলীবস্তীতে আগুন লেগেছে। চায়ের গুদোমেও আগুন। আগুনের লেলিহান জিহ্বা যেন আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে।

থরথর কাঁপছে লালিয়া। মিসেস্ রবার্টসন ছুটে এসে কচি মেয়েটিকে কোলে দিয়ে বললেন,—সুজাতাকে ধর। আমি দেখে আসি।

হাতে বন্দুক নিয়ে ছুটে চললেন মিসেস্ রবার্টসন,—মিঃ রবার্টসনের প্রিয়তমা মলি,—মল্লিকা। স্তম্ভিত হলেন মিস্টার রবার্টসন্।

মুহূর্তের মধ্যে রবার্টসন্ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তিনিও বন্দুক নিয়ে ছুটে চললেন। গরদের জোড় তাঁর পরনে। রবার্টসন্ বললেন,—তোমরা অপেক্ষা কর সর্বেশ্বর। আমি আসছি।

গুড়ুম্-গুড়ুম্-গুম্—অসংখ্য আওয়াজ। ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে আর্মড্ পুলিস। মশাল আর বল্লম হাতে অসংখ্য পাহাড়ী, মার মার চীৎকার তাদের মুখে। তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মিসেস্ রবার্টসন। বন্দুকের গুলি ফুরিয়ে গেছে। তবু এগিয়ে চলেছেন তিনি। মুখে তাঁর পাহাড়ী বুলি,—কি যে বলছেন বোঝাই যাচ্ছে না।

হঠাৎ পড়ে গেলেন মিসেস্ রবার্টসন্। অনুগত পাহাড়ীরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল।

রবার্টসন্ ছুটে গেলেন। তাঁরও বন্দুকের গুলি ফুরিয়েছে। বুক দিয়ে রক্ত ঝরছে। তিনি জড়িয়ে ধরলেন মিসেস্ রবার্টসনকে—ওঃ মাই ডার্লিং, মাই ডার্লিং! পারলে না, পারলে না। ক্যাণ্ট ইউ কিল দীজ অসুরস্ লাইক গডেস্ দুর্গা ?

অচৈতন্য মিসেস্ রবার্টসন। কথা সরছে না আর রবার্টসন্ সাহেবের মুখে। পুলিস এগিয়ে এল। সর্বেশ্বর আর লালিয়া এসে দাঁড়ালেন তাঁদের মাঝে।

বিবাহের নিমন্ত্রণ রাখতে শেষ মুহূর্তে এসে উপস্থিত হয়েছেন মিঃ লয়েড,—মিঃ রবার্টসনের বন্ধু।

সর্বেশ্বর মুষড়ে পড়লেন। মিসেস্ রবার্টসনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল লালিয়া,—মা, মা, মাই মাদার!

লালিয়ার হাত ধরে অতি কষ্টে সর্বেশ্বরের হাতে তুলে দিলেন মিঃ রবার্টসন। মিসেস্ রবার্টসনের মুখে মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে এলেও মশালের আলোয় দেখা গেল তাঁর মুখে যেন তৃপ্তির হাসি।

শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন রবার্টসন্। শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন মিসেস্ রবার্টসন্।

সর্বেশ্বরের বুকে হাহাকার,—সত্যই ভারতবর্ষ তার এক পরম বন্ধুকে হারাল। দ্বিতীয় বার যেন পিতৃহীন হলেন সর্বেশ্বর।

আজও সর্বেশ্বরের কানে ঝঙ্কার দেয় সে কণ্ঠস্বর,—আই এম রবার্টসন,—এ ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া।

রবার্টসন সাহেবের স্মৃতি-বিজড়িত সে ভূমি সর্বেশ্বরকে ছাড়তে হল। মিঃ লয়েড বললেন,—এখানে থাকা তোমার উচিত হবে না সর্বেশ্বর।

—কিন্তু সুজাতা?—রবার্টসনের কন্যা।

মিঃ লয়েড বললেন,—রবার্টসনের কন্যা?

—হ্যাঁ মাত্র তিন মাসের শিশু।

মিঃ লয়েড বললেন,—তোমাদের কাছেই থাক সর্বেশ্বর। পরে যা হয়, ভেবে চিন্তে করব। রবার্টসন তো বিশেষ কিছুই রেখে যায় নি; সবই নিজের খেয়ালে উড়িয়েছে।

লালিয়া সুজাতাকে আঁকড়ে রইল। আর রইল আয়া বাতাসীমনি। তাদের শহরে নিয়ে এসে রেখে সর্বেশ্বর এখানে সেখানে ঘুরতে লাগলেন। মিঃ লয়েড তাঁকে অনেক সাহায্যও করেছিলেন।

তার পর ঘুরে ঘুরে কাঞ্চনগড়ে এসে আশ্রম খুললেন সর্বেশ্বর। বছর তিনেক কেটে গেল। লালিয়া, সুজাতা আর বাতাসীমনি শহরেই থাকে।

সুজাতা আজ লালিয়ারই মেয়ে! তার পর সত্যই সে মা হয়ে বসল। সুরথের জন্ম হল। সুরথের জন্মের পর লালিয়া কেমন যেন হয়ে গেল; তার মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা দিল। দু-তিন বছর আরও কাটল। লালিয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন সর্বেশ্বর।

তার পর একদিন লালিয়াও মারা গেল। বাতাসীমনি ছেলে আর মেয়েকে আগলায়।

মিঃ লয়েড অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি দেশে যাবার উদ্যোগ করে সর্বেশ্বরকে বললেন,—কোন চিন্তা কর না সর্বেশ্বর! সুজাতার একটা ব্যবস্থা আমি করবই। মিঃ লয়েড সর্বেশ্বরকে কিছু টাকা দিয়ে গেলেন। আর বলে গেলেন, দেশে গিয়ে মিঃ রবার্টসনের ব্যক্তিগত কিছু গচ্ছিত থাকলে, সুজাতা যাতে তা পায় তার ব্যবস্থা করবেন।

সর্বেশ্বর নিরুপায় হয়ে শেষকালে সুরথ, সুজাতা আর বাতাসীমনিকে আরও কয়েক বৎসর শহরে রাখলেন। তার পর সকলকে নিয়ে বাসা বাঁধলেন কাঞ্চনগড়ে।

নির্মম, নিষ্ঠুর সে অতীত!

এখানেই সর্বেশ্বরের স্মৃতির পাতা বন্ধ। মাঝে মাঝে মিঃ লয়েডের চিঠিও পেয়েছেন তিনি। মিঃ লয়েড আশার কথাও কিছু শুনিয়েছেন। তার পর সব চুপচাপ।

বার্ধক্যের দ্বারে পৌঁছে হিসাব-নিকাশের সময় এসেছে; যারা তাঁর কুটিরে অতিথি হয়ে এসেছিল, যাদের আপন বলে মেনে নিয়েছিলেন, আজ তারা সকলেই চলে গেছে একে একে।

শুধু সুজাতা রয়ে গেছে!—সুজাতা কেউ নয় তাঁর। অথচ তাঁর বড় আপন সুজাতা। সুজাতা নিজের পরিচয় জানে না। সুজাতা যদি জানে সে খাঁটি ইংরেজের মেয়ে! আর,—মিঃ লয়েড যদি কোন ব্যবস্থা করতে পারেন, তা হলে? খাঁটি ইংরেজের মেয়েকে যদি ইংরেজ দাবি করে! সুজাতার সমস্যায় বিহ্বল হয়ে ওঠেন সর্বেশ্বর। শেষে সুজাতাকেও ছাড়তে হবে?

নাঃ, মণীশকে সমঝে দিতে হবে। এরকম অরণ্যজীবনে কোন সমাধানই হবে না। কি করবেন সর্বেশ্বর ?

সুজাতা আর মণীশ হাত ধরাধরি কবে চলেছে। হয়তো হাত ধরাধরি করে সারা জীবনটাই কাটিয়ে দেবে। কিন্তু তার পরিণাম কি ? রবার্টসন্-দুহিতা কি বাঙালী ঘরের বধূ হয়ে থাকবে চিরকাল ?

আর মণীশ কি করবে ?—তার সমাজ, তার সংসার, তার পরিবেশ ? সুজাতাকে হাত ধরে নেবার মত সাহস হবে কি তার ? সমাজ ও স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন কাটানো কি সম্ভব ?

সর্বেশ্বরের মনে ব্যর্থতার হাহাকার ওঠে। নিজের জীবনের শূন্যতা পূরণ হয় নি। এদের জীবন কি ব্যর্থ করে দেবেন তিনি ?

চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ল।

হাসিমুখে সুজাতা এসে সামনে দাঁড়াল ; তার পিছু পিছু মণীশও এল। হঠাৎ শূন্যতা যেন ভরে ওঠে পরিপূর্ণতায় ; চোখ দুটি তৃপ্ত হয়ে যায়।

সুজাতা বলে,—জান বাবা ! মণীশদা কি ভীতু !

সর্বেশ্বর হেসে হেসে প্রশ্ন করেন,—কেন কি হল রে ?

সুজাতা জবাব দেয়,—ওই পোড়ারাজার টিলা দেখতে গিয়েছিলাম। ওখানে কিছুতেই যেতে চায় না মণীশদা। দু-এক দিন তার কাছ বরাবর গিয়ে ফিরে এসেছে। আজ কিন্তু আমি ছাড়ি নি।

—কেন ? ভয় কিসের ?

—ভয় ?—বাঘ-ভালুকের।

হাসলেন সর্বেশ্বর,—ঠিকই তো, এ সব জায়গায় কি মিছামিছি যেতে আছে ?

মণীশ এবার কথা বলে,—হ্যাঁ মাষ্টারমশাই ! মিছামিছি সময় নষ্ট।

সুজাতা বলে,—কিন্তু কেমন জব্দ হয়েছ বল তো ?

মণীশ বলে,—জব্দ ?

সুজাতা বলে,—হ্যাঁ গো মশাই ! শান্তশীলের গল্প শুনে তোমার চোখে জল আসে নি ?

মণীশ বলে,—এমন করুণ কথা শুনলে কার না মন খারাপ হয় ?

সুজাতা বলে,—জান বাবা! এ গল্প তো এখানকার সবাই জানে। শান্তশীল, কলাবতী আর ইন্দ্রাণীর কথা কে না জানে ? কিন্তু কেউ কি চোখের জল ফেলে ?

সর্বেশ্বর বলে,—কষ্ট হয় বৈ কি।

মণীশ বলে,—বাঃ, নিজের কথা ভুলে গেলে কেন ? কলাবতীর কথা শুনে তোমার কি হয়েছিল ? বার বার বন্ধুকে তার কথা জিজ্ঞেস করেছিলে না ?

সুজাতা উত্তর দেয়,—বেশ করেছি। আচ্ছা বাবা! আগেকার রাজারা এত নিষ্ঠুর ছিল কেন ?

সর্বেশ্বর বললেন,—এখনও কি মানুষ কম নিষ্ঠুর মা ? আগে মানুষ নিজের বংশের কথা বৃথা আভিজাত্যের গর্বে বড় করে দেখত, তাই তো এমন হত।

সুজাতা বলে,—কলাবতীর তো কোন দোষ ছিল না ; তার সঙ্গে শান্তশীলের বিয়ে দিলেই পারত রাজা।

সর্বেশ্বর বলেন,—পারত। আমি যদি রাজা হতাম, তা হলে তাই দিতাম।

হো হো করে হাসেন সর্বেশ্বর। মণীশের মুখমণ্ডল আরক্তিম হয়ে ওঠে। সুজাতার সর্বেশ্বরের কথা শুনে কেমন যেন লজ্জা বোধ করে।

সর্বেশ্বর বলেন,—সুন্দর কাহিনী। এ রকম কত কাহিনী ছড়িয়ে আছে এ দেশের প্রতি ধ্বংসস্তূপে।

সুজাতা বলে,—এগুলো কি সত্যি বাবা ?

সর্বেশ্বর বলেন,—মিথ্যা বলব কি করে ? শান্তশীল আর কলাবতী যে আজ মানুষের মনে সত্য হয়ে উঠেছে। তাদের ভালবাসাটা তো মিথ্যে নয়।

সুজাতা বলে,—নিষ্ঠুর রাজা। এ রকম পুড়িয়ে না মেরে তাদের রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেই পারত।

মণীশ বলে,—কিন্তু রাজবাড়িসুদ্ধ সবাই পুড়ে মরল, এটা বিশ্বাস করা যায় না।

সর্বেশ্বর বলেন,—কেন বিশ্বাস করা যাবে না মণীশ ! একমাত্র সন্তানের শোকে বিহ্বল রাজরাণী আত্মরক্ষার কোন চেষ্টাও করেন নি। আগুন নিশ্চয়ই সমস্ত বাড়িটায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

সুজাতা বলে,—তা হতে পারে। কিন্তু এখনও যে ধোঁয়া দেখা যায় মাঝে মাঝে তার কারণ কি বাবা?

সর্বেশ্বর বলেন,—পাহাড়ের নীচে নিশ্চয়ই আগ্নেয়গিরি লুকিয়ে রয়েছে; তার ধোঁয়াও হতে পারে।

মণীশ বলে,—আমারও তাই মনে হয়।

সর্বেশ্বর বলেন,—বিচিত্র এ দেশের মাটি মণীশ! এ দেশের লোক কথা ও কাহিনী দিয়ে ভরে রেখেছে প্রতি ধূলিকণাকে। আর সত্যই এর প্রতি ধূলিকণা কত যুগের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সুজাতা বলে,—হিন্দুর দেশ ভারতবর্ষ! এ দেশের সন্তান আমরা। এ দেশের মানুষের আদর্শ অন্য দেশের মানুষের আদর্শের চেয়ে অনেক মহান্। বিদেশীরা তা বুঝতে পারে না। তাই নির্মম হয়ে পুলিস লাঠি চালায়, গুলি ছোঁড়ে। অহিংস-মন্ত্রের এরা বুঝবে কি বাবা?

সর্বেশ্বর হাসিমুখে উত্তর দেন,—বিদেশীরা এখন তা বুঝতে পারবে না মা! কিন্তু একদিন তারাও এ আদর্শ বুঝবে। হিংসার বদলে হিংসায় জগৎ টিকতে পারে না। সবাইকে একদিন এ মন্ত্র নিতে হবে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সর্বেশ্বর বলেন,—কিন্তু একটা কথা ভাবছি সুজাতা! এখানকার লেখাপড়া তো শেষ হয়েছে। তোমায় এবার বাইরে পাঠাব মনে করছি।

—কোথায় বাবা?

—কলকাতায় কোন স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করা তোমার দরকার।

—কেন বাবা? তোমার কাছে তো আমি সবই শিখেছি। ইংরেজী, বাংলা কোন বইই আমার পড়তে আটকায় না। সংস্কৃতও কিছু কিছু জানি। এর বেশি দরকার কি বাবা!

—দরকার আছে রে পাগলী! বিদ্যার কি আর শেষ আছে? জ্ঞানে-বিদ্যায় বড় হয়ে উঠবি; কলকাতায় সাহেবদের স্কুলে তোকে পাঠাব।

—সাহেবদের স্কুলে?

—হ্যাঁ। আমার এক বন্ধুকে লিখেছি টরেন্টোতে তোর জন্য চেষ্টা করতে।

—সাহেবদের আদর্শ আর আমাদের আদর্শে তফাৎ আছে বাবা! তুমিই আমাকে এ কথা বলেছ।

—আদর্শের তফাৎ থাকলেও জ্ঞান-সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে কোন তফাৎ থাকতে পারে না মা।

—কিন্তু কেন? কি দরকার? আমি যা জানি, এতেই তো বেশ চলবে বাবা? কই, এ দেশের মেয়েরা তো বিশেষ কোন লেখাপড়াই জানে না; তারা তো বেশ সুন্দর জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে।

হাসিমুখে সর্বেশ্বর বলেন,—এ দেশের মেয়েরাও লেখাপড়া শিখছে সুজাতা! শহরে গেলে, কলকাতায় গেলে দেখতে পাবে। দেখতে পাবে,—মেয়েরাও বড় বড় কাজ করছে; চাকরি করছে, কলেজে অধ্যাপনা করছে।

সুজাতা অনুযোগের সুরে বলে,—তুমি কি চাও বাবা, আমি চাকরি করি? ওসব আমাব ভাল লাগবে না। আমার আর লেখাপড়া ভাল লাগে না বাবা! আমি এ দেশে, এই পাহাড়ের দেশেই বেশ থাকতে পারব।

সর্বেশ্বর বললেন,—পারবে?

সুজাতা বলে,—কেন পারব না? তুমি রয়েছ; এরা সবাই রয়েছে। আমি পারব না? আর আমি চলে গেলে এখানকার কাজ কে করবে বাবা? এই পাহাড়ীদের মানুষ করার কাজ কে দেখবে?

সর্বেশ্বর উত্তর দেন,—এদের মানুষ করার লোকের অভাব হবে না মা! আর আমিই বা কদিন আছি। তার পর কি হবে?

কি হবে?—সুজাতা গম্ভীর হয়ে যায়। তার মুখে অভিমানের ছায়া। মণীশ সর্বেশ্বরের প্রস্তাব শুনে একটুখানি বিচলিত হয়ে উঠেছিল। সে বার বার সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সর্বেশ্বর বললেন,—মণীশ! তোমারও উচিত বাবা, আরও ভাল করে এগিয়ে যাওয়া। তুমি তো সুযোগ পেয়েছ; সে সুযোগ নষ্ট কোরো না।

মণীশ উত্তর দিতে পারে না। সর্বেশ্বর সস্নেহে আবার বলেন,—তোমরা

মানুষ হয়ে ওঠ মণীশ। আমি অনেক ভেবে দেখেছি ;—তোমরা জ্ঞানের আলোক নিয়ে এসে দেশের অন্ধকার দূর করবে,—এই তো চাই। শক্তি অর্জন কর আগে ; নতুবা সকল শক্তি যে ফুরিয়ে যাবে বাবা!

সুজাতা বলে,—তুমি যা-ই বল বাবা! মণীশদার ইচ্ছা হয় যেখানে খুশি যাক্, আমায় কিন্তু এ সব কথা বলতে পারবে না। আমি তোমায় ছেড়ে যেতে পারব না, পারব না, পারব না।

ছুটে পালিয়ে যায় সুজাতা। সর্বেশ্বরের চোখে অশ্রুধারা। মণীশ বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে পড়ে।

মণীশের পিসীমা এদিকে দশ জনের কথায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠেন। তাঁদের বংশে কালিমা পড়বে! মণীশ কি না শেষে খিরিস্তান হয়ে যাবে!

গোকুল বলেন,—ছিঃ ছিঃ! আমি আগেই বলেছিলাম দিদি, মণীশের বিয়ে দিয়ে দাও।

পিসীমা বলেন,—কি জানি ভাই, তোদের কথা আমি বুঝতে পারি নে। আমি তো ঠিকই করে ফেলেছিলাম।

গোকুল বলেন—তা তুমি কি করবে দিদি! কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে? সমস্ত গ্রহ একজোট হলেও কিছু করতে পারে না, যা আছে অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাবে বল। এখন ঠেলা বোঝ, এদিকে জমিদার তো রেগে অগ্নিশর্মা। প্রসন্ন তর্করত্ন রাতদিন তাঁকে তাতাচ্ছে, সমাজ গেল, ধর্ম গেল।

পিসীমা বলেন,—যাই বল গোকুল, সে তো সত্যি কথা। তোমার এই স্বদেশী কাণ্ডকারখানা আমার বরদাস্ত হয় না।

গোকুল বলেন,—বরদাস্ত না করে উপায় কি বড়দি? তোমার ওই প্রসন্ন ঠাকুরটি কিন্তু যত নষ্টের গোড়া।

পিসীমা বলেন,—বুড়ো মানুষ ; এসব অনাচার কি তিনি সহ্য করতে পারেন? নিজের মেয়ে সন্ধ্যা কি না শেষে বিগড়ে গেল।

গোকুল বলেন,—চরকায় সুতো কেটে কেটে ওর মাথা বিগড়ে গিয়েছে বড়দি!

পিসীমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন,—অত-শত ভাবি নি গোকুল, এখন সব দোষই মণীশের ঘাড়ে পড়ছে। সন্ধ্যাকে সে-ই লেখাপড়া শিখিয়েছে; সন্ধ্যার মা দিয়েছেন প্রশ্রয়। এখন তিনিই নানা কথা বলছেন।

—বলবেন না? যত দোষ, নন্দ ঘোষ,—মণীশের মাথার উপর কেউ নেই কিনা?—গোকুল যেন রাগে গর্‌গর্‌ করতে লাগলেন।

আবার বললেন গোকুল,—ষোল-সতেরো বছরের বিধবা মেয়েকে বাড়িতে পুষে রেখে দিয়েছে; মণীশের দোষ কি? সেই ছোঁড়া শম্ভুই যত নষ্টের গোড়া। আচ্ছা বড়দি, হয়েছে কি বল তো!

পিসীমা বলেন—কি আর হবে? সন্ধ্যার মতিগতি নাকি ভাল নয়।

—ওঃ, এই কথা?—একটু এদিক্‌-সেদিক্‌ হলে দোষই বা কি?

—ছিঃ গোকুল, এবকম কি বলতে আছে?

—বেশ আছে। পাঠিয়ে দিক্‌ না মেমসাহেবদের স্কুলে। সারা জীবন কি বসে বসে মেয়েকে আগলাবে। বিধবাদের তো বিয়ে হচ্ছে; বিদ্যাসাগর মশাই ব্যবস্থা দিয়েছেন।

—বেশ করেছেন গোকুল! আমাদের পাড়াগাঁয়ে এসব চলবে না।

গোকুল বললেন,—বুঝলে বড়দি, আমাদের শাস্ত্রে আছে "সপ্তমে তু শুভাশুভৈঃ।" সপ্তমে শুভাশুভ গ্রহ থাকলে পুনর্ভূ যোগ হয়, অর্থাৎ আবার বিবাহ। তাই যদি শাস্ত্রেই থাকে তা হলে বিবাহে আপত্তি কি? যখন মহামুনি পরাশরই বলে গেছেন।

পিসীমা বলেন,—চুপ কর গোকুল! কেউ শুনতে পেলে ফ্যাসাদ হবে।

গোকুল বলেন,—শাস্ত্রের কথা বলছি। তাতে কার কি?

পিসীমা বললেন,—শাস্ত্রে অনেক কথাই আছে গোকুল, এখন কাজের কথা দেখ। আচ্ছা, আমি মনে করছি ওই সুনন্দার সঙ্গেই—। কৃষ্ণপ্রসাদও সেকথা বলছেন।

গোকুল উৎসাহের সুরে বলেন,—নিশ্চয়ই, মণীশের সঙ্গে খুব মানাবে বড়দি! কিন্তু সুরুচিটা ছিল ভাল।

পিসীমা বললেন,—তার যে বিয়ে হয়ে গেল গোকুল! আমার তো সেই ইচ্ছেই ছিল।

গোকুল বলেন,—সুনন্দার বাবা রাজী তো?

পিসীমা বলেন—রাজী তো ছিলেন। মনে করছি কথাটা পাড়ব।

গোকুল হঠাৎ বলে ওঠেন,—দেখ দিদি! ভিন্ দেশের মেয়ে হলে ভাল হত। একই গাঁয়ে পাশাপাশি বাড়ি,—ছোট বেলা থেকে জানাশোনা,—এতে কোন রস-কষ নেই।

পিসীমা হাসতে লাগলেন।

গোকুল বললেন,—দূরে ভিন্ গাঁয়ে থাকবে শ্বশুরবাড়ি। কেমন চতুর্দোলে বর যাবে। সঙ্গে যাবে বরযাত্রী; অচেনা জায়গায় কত আদর, কত আপ্যায়ন। একই গাঁয়ে হলে তেমন গ্রাহ্যি করে না বড়দি।

পিসীমা বললেন,—সে আর হচ্ছে কই?

গোকুল বলতে লাগলেন,—তা বটে! বউয়ের রাগ হল, ছুট করে পালিয়ে গেল বাপের বাড়ি। বউয়ের ঠাক্‌মা ঠক্ ঠক্ করে লাঠি হাতে এসে শাসিয়ে যাবে বরকে। ছিঃ ছিঃ! এ আমার ভাল লাগে না। মণীশের বিয়ে হোক্ অনেক দূরে! ট্রেনে, ইস্টিমারে, পাল্কিতে, চতুর্দোলে যাবে মণীশ দূর-দূরান্তের পথ।

পিসীমা সহাস্যে বলেন,—বেশ তো তাই দেখ।

গোকুল বলেন,—দেখব কি বড়দি? কপালে থাকলে তাই হবে। কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে? এখন তো তোমার কৃষ্ণপ্রসাদকে ঠেকাতে হবে। আর বলে দিচ্ছি পিসীমা, তোমাদের ওই শম্ভুনাথকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হচ্ছে না।

পিসীমা বলেন,—তা বুঝি গোকুল। কিন্তু কি করব বল?

পিসীমার যে কিছুই করবার নেই গোকুল তা বোঝেন। এমন কি জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদের যত দাপটই থাক, শম্ভুনাথকে ঘাঁটাঘাঁটি করতে তিনিও সাহস করেন না।

গোকুল বলেন,—নিজেরা ঠিক থাকলেই হল বড়দি, আমি কাউকে ভয় করি না।

এদিকে আর এক সমস্যা দেখা দিল।

সর্বেশ্বর আগেই পাহাড়ীদের সাবধান করে দিয়েছিলেন। তাঁর কথা তারা শোনে নি। জমিদারেরও এবার টনক নড়েছে। বর্ষা নেমেছে। বর্ষার মাঠ; জলময়-মাঠে আগাছার শ্যামল-শ্রী আহ্বান করে চাষী কিষানদের।

মাঠে লাঙল দেবার লোক নেই। দু-চার জন বুড়ো আর ছেলে-ছোকরা বেরিয়েছে বটে, কিন্তু মাঠ-ভরা সে উচ্ছ্বাস নেই। ভদ্রপাড়ায় সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। কিষান মেলা ভার; ভাগে চাষ করবারও লোক নেই।

মজুরির লোভে পাহাড়ীরা আগেই তেলের খনিতে কাজ করতে লেগে গেছে। এবার চাষীরাও দলে দলে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ঝির ঝির বৃষ্টির সঙ্গে যেন হা-হুতাশ উতলা হাওয়ায় চাপা কান্না কাঁদছে।

উপায় নেই। অভাব হয়েছে কিষান-মজুরের।

পাহাড়ের গায়ে একটার পর একটা চিমনি উঠে যেন সমস্ত পাহাড়টাকে ছেয়ে ফেলেছে। এপারে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করেন জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদ! তাঁর ইচ্ছে হয়, ভেঙ্গেচুরে চুরমার করে নদীর জলে ফেলে দেন ওই রাক্ষুসে চিমনিগুলোকে। সাহেবদের উপরেও রাগ হয়। কোথাকার আপদ এসে জুটেছে সব! এত তেল দিয়ে কি হবে?—কেরোসিন তেল? এত তুলছে, তবু দর তো কমছে না।

বুড়ো লক্ষ্মণ মালী লাঠি ঠক ঠক করে এসে দাঁড়াল কৃষ্ণপ্রসাদের সম্মুখে। সে যা নিবেদন করলে তাতে মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন তিনি,—কি সর্বনাশ! স্বদেশীরা সাহেবদের তাড়িয়ে দিলেই ভাল হত!

গর্জন করে উঠলেন কৃষ্ণপ্রসাদ,—কি এত বড় আস্পর্ধা? আমার জমিদারিতে বাস করে আমার কথা শুনবে না?

লক্ষ্মণ বলে,—কি বলব হুজুর? জোয়ান ছোকরাগুলো কথাই শোনে না। তাদের ভাবনা কি বলুন? গা-গতর খাটিয়ে দু পয়সা ঘরে আনছে; কিন্তুক্ আমার মত বুড়ো হাবড়াদের উপায় নেই। মাঠে ধান না ফললে যে সর্বনাশ হবে।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—হ্যাঁ সর্বনাশই হবে। তোমাদের সর্বনাশই করব। কাল এক শ লাঙল পড়বে মাঠে। বাগদীপাড়া, পাটনিপাড়া আর মালীপাড়ার

এক শ কিষান আমার চাই। জুতো মেরে ব্যাটাদের মাঠে নামাব। দেখি তাদের কোন্ বাবা রক্ষা করে!

লক্ষ্মণ কাঁপতে কাঁপতে বলে,—তারা যে তেল-কলে চাক্‌রি নিয়েছে হুজুর। সাহেবরা ছাড়বে কেন?

ভ্রূকুটি করলেন কৃষ্ণপ্রসাদ,—চাকরি করছে। যাক্ না তাদের কাছে। আমার জমিদারি থেকে বাস ওঠাতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় আগুন ধরিয়ে দেব; হাতি দিয়ে ভেঙ্গে তছনছ করে দেব। যাও না তোমরা তেলকলেই উঠে যাও।

লক্ষ্মণ বলে,—হুজুর, এ ভয় তারা করেই না। শুধু বাপ-ঠাকুর্দার ভিটের মায়া ছাড়তে পারছে না।

কৃষ্ণপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে বললেন,—ভয় করে না? তাদের এত বড় বুকের পাটা?

লক্ষ্মণ বললে,—হুজুর! সাহেবরা তো থাকবার ঘর দিচ্ছে; দু-চার জন গেছেও। এই লবাই মাঝি, লাবড় মালী, সোনা পাটনি—ওরা তো চলেই গেছে।

কৃষ্ণপ্রসাদের স্বরে ক্ষোভ ফুটে উঠল,—চলে গেছে? চলে গেছে তারা? জন্মের মত কুলী বন্‌তে চলে গেছে সব হারামীর বাচ্ছারা?

লক্ষ্মণ কৃষ্ণপ্রসাদের কথায় আঁতকে ওঠে,—কি বলছেন হুজুর? কুলী?—কুলী বনে যাচ্ছে সব?

কৃষ্ণপ্রসাদ বিদ্রূপ-কণ্ঠে বললেন,—হ্যাঁ, কুলী বনে যাচ্ছে সব। তোমরা তো সাঁওতাল নও; পাহাড়ী নও। বাঙালীর ছেলে কুলী হয়ে যাচ্ছে, কি লজ্জার কথা!

লক্ষ্মণ বলে,—কি বলব হুজুর! অতশত বুঝি নে। কিন্তুক ওরা বেশ আরামেই আছে। রোজ তিন টাকা করে মজুরি; হপ্তায় হপ্তায় টাকা দেয়। চাষবাস করে তো দুক্ষু ঘুচছে না হুজুর!

কৃষ্ণপ্রসাদ বলেন,—দুক্ষু ঘুচবে ঠিকই। ভিটেমাটি ছাড়া করব ব্যাটাদের। কুলী হবি তো থাক গে সাহেবদের কুলী-বস্তিতে। জাতধর্ম খুইয়ে সব কুলী হবি, আমার এখানে তোদের ঠাঁই হবে না।

কৃষ্ণপ্রসাদের সঙ্গে লক্ষ্মণ মালীর যখন এই আলোচনা চলছে, তখন প্রসন্ন তর্করত্ন এসে উপস্থিত হলেন।

প্রসন্ন তর্করত্ন বললেন,—জান কৃষ্ণপ্রসাদ! তুমি তো কোন দিকে চোখ দাও না। আমাদের মান ইজ্জৎ আর থাকবে না। ছেলেরা পাড়ায় পাড়ায় এখন মেয়েদের নিয়ে বেরিয়েছে।

কৃষ্ণপ্রসাদ ভ্রূকুটি করলেন। তর্করত্ন বললেন,—ধাড়ী মেয়েদের নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বেরিয়েছে ছেলেরা।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—সে আবার কি? কে বেরিয়েছে?

তর্করত্ন বলেন,—তোমার সেই নদের দুলাল মণীশ। মালীপাড়া, ডোমপাড়া মুছলমান পাড়া,—কোথায় না যাচ্ছে বল?

কৃষ্ণপ্রসাদ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—যাচ্ছে, বেশ করছে। কিন্তু কাদের বাড়ির কোন্ মেয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে?

তর্করত্ন বলেন,—কি জানি বাবা! কে তাদের চেনে? তবে শুনেছি সর্বেশ্বর মাষ্টারের মেয়েটা রয়েছে। আমাদের পাড়ায়ও নাকি আসছে মেয়েটা।

লক্ষ্মণ মালী এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এখন সে মুখ খোলে, বলে,—ঠিকই বলেছেন কর্তাঠাকুর! কি সুন্দর মা লক্ষ্মী! কি সুন্দর তাঁর কথাবার্তা! শুনলে মন জুড়িয়ে যায়। কত ভাল ভাল কথা বলেন তিনি। ঘরদোর কি করে গুছিয়ে রাখতে হবে, ময়লা নোংরা কোথায় কি করে ফেলতে হবে, সবই বুঝিয়ে দিয়ে যান। নিজের হাতে ঝাঁটা নিয়ে আঁস্তাকুড় সাফ করে দিচ্ছেন। কি করে ছেলেদের মানুষ করতে হবে বলে যাচ্ছেন। এইটুকু মেয়ে! এত কথা শিখলেই বা কোথা থেকে। মা সরস্বতী যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন।

তর্করত্ন ঘৃণাভরে বলে উঠেন,—ছিঃ ছিঃ! কি ঘেন্নার কথা। মা সরস্বতী না মেনকা রম্ভা? ডেঁপো মেয়ে! সমাজটা উচ্ছন্নে যাবে।

লক্ষ্মণ বলে,—এ কি বলছেন কর্তাঠাকুর! এঁরা তো ভাল কাজই করছেন। একবার আমাদের বাড়িঘরে পায়ের ধুলো দিয়ে দেখবেন, পাড়ার চেহারা পালটে গেছে।

কৃষ্ণপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে বললেন,—পালটে যাবে লক্ষ্মণ, সবই পালটে যাবে। তোমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক, সেটা আমরাও চাই। কিন্তু তোমরা কি তোমাদের স্বভাব পালটাতে পারবে?

লক্ষ্মণ বললে,—হুজুর যা বলেছেন। উনারা এসে হাতে কলমে সব দেখিয়ে দিয়ে আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিচ্ছেন হুজুর! আগে তো অতশত বুঝি নি।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—এখন তো বুঝলে! কিন্তু আমারই বোঝার ভুল হয়ে গেছে লক্ষ্মণ! আমারই ভুল হয়ে গেছে।

তর্করত্ন বলেন,—কিসের ভুল কৃষ্ণপ্রসাদ? ওদের শায়েস্তা না করলে সমাজ-ধর্ম সব জাহান্নমে যাবে।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—না, যাবে না। মণীশের পিসীমা মণীশের বিয়ে দেবার কি করলে?

তর্করত্ন হেসে হেসে উত্তর দেন,—কি আর করবে? এমন রত্নের হাতে কে মেয়ে দেবে?

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—কেন? যজ্ঞেশ্বর তো দিতে চায়?

তর্করত্ন বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বললেন,—যজ্ঞেশ্বর?—হ্যাঁ, তার মত ছিল বটে। কিন্তু এখন এসব কাণ্ড-কারখানা দেখে মত পালটেছে।

কৃষ্ণপ্রসাদ যেন রূঢ় হয়ে উঠলেন,—মত পালটেছে? কি কাণ্ড-কারখানা দেখেছে সে?

তর্করত্ন বললেন,—ওই সব খ্রীষ্টানী কাণ্ড!

কৃষ্ণপ্রসাদ বল্লেন,—না, তা নয়। আপনার মেয়ে সন্ধ্যার খবর রাখেন কি?

তর্করত্ন বললেন,—কেন?

কৃষ্ণপ্রসাদ বল্লেন,—নিজের মেয়ে কি করছে না করছে তার খবর রাখা আপনার দরকার। আমার মনে হয়, কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়ে গেছে।

লক্ষ্মণ বলে উঠল,—হ্যাঁ কর্তা ঠাকুর! সেদিন সন্ধ্যা দিদিমণিও গেছলেন আমাদের পাড়ায়।

তর্করত্ন আঁতকে উঠলেন,—কি বলছিস লক্ষ্মণ! সন্ধ্যাও গিয়েছিল?

লক্ষ্মণ বলে,—হ্যাঁ, শম্ভুনাথও ছিলেন তাঁদের সঙ্গে।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন—বুঝলেন তো! হাওয়া কোন্ দিকে বইছে? এদিকে মাঠে লাঙল পড়ছে না, চাষীরা তেলখনিতে কাজ করতে ছুটেছে। বাড়ির মেয়েরা পাড়ায় বেরিয়েছে। এবার তারাই লাঙল ধরবে।

তর্করত্ন বললেন,—এই মণীশ আর শম্ভুই যত নষ্টের গোড়া কৃষ্ণপ্রসাদ! সন্ধ্যাও শেষে বিগড়ে গেল; এ যে বিশ্বাস করতে পারছি না।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—কালের হাওয়া কি করবেন বলুন? আমি বলছি কি মেয়েকে সাবধান করুন, না হয় শহরের খ্রীষ্টানী স্কুলে ভর্তি করে দিন। আর আপনি আগলে রাখতে পারবেন না।

তর্করত্ন বললেন,—তুমি এ কি বলছ কৃষ্ণপ্রসাদ?

কৃষ্ণপ্রসাদ ভ্রূকুটি করে বললেন,—ঠিকই বলছি আমি। আপদ বিদেয় করতে হবে। আমার এখানে এসব চলবে না। মণীশের বিয়ে দেব আমি ওই যজ্ঞেশ্বরের মেয়ের সঙ্গে।

লক্ষ্মণ বললে,—ঠিক কথা বলছেন হুজুর! বেশ মানাবে, আমাদের মণীশ দা-ঠাকুর বেশ ভাল ছেলে। শম্ভুবাবুকে কেউ পছন্দ করে না; মণীশ দাঠাকুর না থাকলে কেউ ওদের পাড়ায় ঢুকতেই দিত না।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—শম্ভুনাথেরও ব্যবস্থা করছি আমি। আর মনে রাখিস লক্ষ্মণ, এক দিন সময় দিচ্ছি, পরশু এক শ লাঙল মাঠে নামাব। ভুল যেন না হয়, ওরা যদি না শোনে তাদের মেয়েদের দিয়ে আমি লাঙল ধরাব।

গম্ভীরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন কৃষ্ণপ্রসাদ। তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন; তর্করত্ন চুপচাপ রয়ে গেলেন। ওপারে পাহাড়ের গায়ে হাজার বাতি জলে উঠল। তেলের খনি, পাহাড়ের বুকে ধকধক করছে হাজার হাজার আলো! বিদ্রূপ করছে,—এপারের জমিদারকে বিদ্রূপ করছে যন্ত্রদানব। আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কৃষ্ণপ্রসাদ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন,—এক শ লাঙল চাই, এক শ লাঙল।

মালীপাড়া, ডোমপাড়া আর পাটনিপাড়ায় হুলস্থুল পড়ে গেল।

লক্ষ্মণ মালী জমিদারের হুকুম জানিয়ে দিয়েছে। রাত্রে তেলের খনি থেকে ফিরে এ সংবাদ পেয়ে সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠল।—না, জমিদারের হুকুম তারা মানবে না। কি করবে জমিদার তাদের ?

গাঁয়ের মাতব্বর আর ছেলে-বুড়োদের জমায়েত।

নবীন মাঝি বললে,—বুঝলে লক্ষ্মণভাই ! জমিদারের এ জবরদস্তি আমরা মানব না। চাষ-বাস করে কারও পেট ভরে না, জমির মালিক ওই জমিদার। দু-চার বিঘে করে জমি দিয়েছেন, না আমাদের মাথা কিনে রেখেছেন ! আমার ছেলেদের আমি জমিদারের কাছে পাঠাব না।

লক্ষ্মণ বলে,—সবই বুঝি ভায়া ! কিন্তুক্ ভিটেমাটি ছাড়া করবে জমিদার।

নবীন বললে,—করুক। আমরা সাহেবদের ওখানে গিয়ে থাকব। ভিটে-মাটির মায়া ছাড়তে হবে ভাই ! তা না হলে এখানে শুকিয়ে মরতে হবে।

লক্ষ্মণ বললে,—বাপ পিতামোর ভিটে, মায়া কি ছাড়া যায় ভায়া ?

মায়া কাটাতে হবে লক্ষ্মণ ভাই ! আজ না হয় বুড়ো হয়ে গেছি, কিন্তু কি না করেছি ওই জমিদারের জন্যে। এক হাতে লাঠি চালিয়ে এক শ লাঠিয়ালকে ঠেকিয়ে রেখেছি। তা না হলে গোবিন্দপুরের চরটার দখল পেত কি ওই কেষ্ট-প্রসাদবাবুর বাবা ?

লক্ষ্মণ বলে,—সবই জানি ভায়া ! পূজাপার্বণে জমিদার খাটিয়ে নেয়; চাষের সময় হপ্তায় দু দিন করে লাঙল দিতে হবে। ধানকাটার সময় ধান তুলে ঝেড়ে মড়াই বেঁধে দিতে হবে। তার বদলে তিন বিঘে করে ঘরপিছু জমি। তা তোমার জমি পড়ে থাকুক কিংবা পুড়ে যাক্ তার দিকে খেয়াল নেই। খাজনা তো দিতেই হবে। এর উপর বিনি-পয়সায় খাটতে হবে চাষের সময়।

নবীন বলে,—এ আর সহ্য হয় না লক্ষ্মণ ভাই ! সেদিন সর্বেশ্বর মাষ্টারের আশ্রমে গিয়েছিলাম, কি সুন্দর মানুষ ! তিনি বললেন, এসব অন্যায় জমিদারের। তোমরা এসব মানবে না।

লক্ষ্মণ বললে,—হ্যাঁ, তাঁরই বেটি এসেছিল সেদিন আমাদের পাড়ায়। ঠিক

যেন মা সরস্বতী। আমার মনে হয় এ কোন সাহেবের মেয়ে। কই, তিনি তো আমাদের ঘেন্না করলেন না; আমাদের ঘরদোর তন্নতন্ন করে দেখলেন; বউঝিকে কত ভাল ভাল কথা বলে গেলেন।

নবীন বলে,—হ্যাঁ, তাঁকেও দেখেছি, আমারও তাই সন্দেহ ভায়া! পাহাড়ীদের দেখেছ তো? তাদের কেমন ভদ্দর করে তুলেছেন সর্বেশ্বর মাষ্টার। কেউ আগে তাঁর আশ্রমে যেত না; এখন ইতর ভদ্দর সবাই যাচ্ছে। স্বদেশী গণ্ডগোল হবার পর থেকেই যেন সব বদলে গেছে। মাষ্টারের ছেলেটা পুলিশের গুলির সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রাণটা দিলে। কি বুকের পাটা ভায়া! বুড়ো হয়ে গেছি ভায়া! তা না হলে দেখিয়ে দিতাম খেলাটা।

লক্ষ্মণ বলে,—আমাগোর মণীশ দাদাঠাকুর তো ওদের সঙ্গে ভিড়ে গেছে।

নবীন বললে,—হবে না? ছেলেটা বড় ভাল লক্ষ্মণ ভায়া! অকালে বাপ মারা গেল। তাই না বিপাকে পড়েছিল। আমাদের কব্‌রেজ ঠাকুর বলতেন,— দেখিস নবীন! আমার মণীশকে আমি ডাক্তার বানিয়ে আনব। আর তোদের ডাক্তারের জন্যে সদরে ছুটতে হবে না। কি মানুষ ছিলেন তিনি!

লক্ষ্মণ বলে,—ওই তর্করত্ন ঠাকুরটি কিন্তু কম নয়! রাতদিন জমিদাবের মোসাহেবি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তুক ভায়া, তাঁর মেয়েটি তো ওরকম নয়! সেও দিব্বি সেদিন আমাদের পাড়ায় বেরিয়েছিল।

নবীন বললে,—হ্যাঁ ভায়া! দিন পালটে যাচ্ছে। আমি বলছি—খেটে খেতে হবে ওই জমিদারকে। নাতিটি যা হয়েছেন তা আর বলবার নয়। রাতদিন পড়ে থাকে ওই ডোমপাড়ায়।

লক্ষ্মণ বলে,—ছিঃ ছিঃ! ছেলেটা একেবারে বিগড়ে গেছে। এখন তো জুটেছে কালা সাহেবদের সঙ্গে।

নবীন বলে,—আরও ভাল করে বিগড়ে দেব। সেদিন দেখি কিনা নন্দার পিছু পিছু ঘুর্‌ঘুর্‌ করছে।

লক্ষ্মণ বলে—নন্দাকে একটু সাবধান করে দিয়ো ভায়া!

নবীন উত্তেজিত হয়ে বলে,—নন্দার বাবাই যত নষ্টের গোড়া লক্ষ্মণভাই!

কাকে সাবধান করব। এখন শুনছি নাকি ওপাড়ার মেয়েগুলো সন্ধ্যাবেলা নদী পার হয়ে ওই রাক্ষুসে খনির বাবু আর সাহেবদের মন যোগাতে যায়।

লক্ষ্মণ উত্তর দেয়,—সবই সত্যি নবীন ভায়া! তাই তো বলছিলাম মাটি আঁকড়ে থেকে আমরা ভালই ছিলাম, খনির মজুরির লালসা আমাগোর সর্বনাশ করবে।

নবীন হঠাৎ গর্জন করে উঠল,—কেন করবে? আমরা কি মানুষ নই? এখনও নবীন মাঝির হাত অবশ হয়ে যায় নি লক্ষ্মণভাই! পাড়ার মেয়েদের সাবধান করে দিয়ো।

লক্ষ্মণ ধীর ভাবে বলে,—কালের ধর্ম ভায়া, কালের ধর্ম! আর সত্যি কথা বলতে কি আমাগোর মান-ইজ্জৎ কোন্ যুগে জমিদার আর ভদ্দর লোকেরাই মেরে দিয়েছে। কার দোষ দেবে বল।

নবীন উত্তর দেয়,—ঠিক কথা বলেছ ভায়া! কিন্তু আর এসব চলবে না।

লক্ষ্মণ বললে,—সবই বুঝলাম কিন্তু পরশু যে এক শ লাঙল চাই।

না, না, না—গর্জন করে ওঠে নবীন মাঝি। কুঁজো লোলচর্ম সেই বুড়ো যেন চল্লিশ বছর আগের যুগে ফিরে গেছে। সোজা, হয়ে উঠেছে তার দেহটা, লোলচর্ম যেন টান হয়ে উঠেছে। নবীন মাঝি গর্জন করে উঠল,—না, না, না, হবে না। পাড়ায় বলে দাও গে, সবাই যার যার কাজে বেরোবে। জমিদারের ভয়ে যেন পেছপা না হয়। আমি একাই এক শ লাঙল চালাব।

লক্ষ্মণ বলে,—কি তুমি করতে চাও নবীনভায়া? শেষে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাবে?

নবীন উত্তর দেয়,—ভয় নেই। আমি একাই সামলাব জমিদার কেষ্টপ্রসাদকে।

সমবেত জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠল। কে এক জন তাদের মধ্য থেকে বললে,—কিন্তুক্ তুমি একলা কি করে ঠেকাবে জেঠা?

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল নবীন মাঝি। তার পর বললে,—তোরা জানবি কি বল? আমার লক্ষ্মণ ভায়া জানে। গোবিন্দপুরের চরে একা ঠেকিয়ে রেখে-ছিলাম এক শ লাঠিয়ালকে। বাজারের দাঙ্গার সময় হুঁচোট খেয়ে পড়ে গিয়ে

মাথা ফেটে গেলেও উঠে গিয়ে ওসমান মিয়ার হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে ঠেঙিয়ে তাড়িয়েছিলাম পঞ্চাশ জনকে। তার পর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছলাম। ততক্ষণে আমাগোর লোকজন এসে পড়েছে।

লক্ষ্মণ বললে,—তুমি কি আবার লাঠি নিয়ে দাঁড়াবে জমিদারের সামনে?

নবীন বললে,—তাই করব ভায়া! মনে করছি তুমি আর আমি দুই বুড়োতে মিলে খেলা দেখিয়ে দেব।

জমায়েতের মাঝখান থেকে নটবর পাটনি বলে উঠল,—তা হয় না জেঠা! চল আমরা সকলে মিলে জমিদারের সঙ্গে একটা রফা করে আসি। এখানে থাকতে না দেয়, চলে যাব আমরা।

নবীন বললে,—কেনে চলে যাবে? এখানেই থাকব। জমিদারের ন্যায্য যা পাওনা তাই দেব। তোমরা কাজে বেরিয়ে যাবে, আমিই রফা করব জমিদারের সঙ্গে। তোদের কোন ভয় নেই।

লক্ষ্মণ বললে,—কিন্তুক্ জমিদার বড় রেগে গেছে ভায়া!

নবীন বললে,—ভয় নেই ভায়া! সে আমি বুঝব।

নবীনের কথার উপর কথা বলে এমন সাহস কারও ছিল না। কেউ আর প্রতিবাদও করতে সাহস করলে না। কিন্তু সকলেই বুঝল, কাল সত্যই একটা রফা হবে জমিদারের সঙ্গে। হয়তো ভিটে মাটি ছাড়তে হবে।

মণীশের কানেও উঠেছে সে কথা। কৃষ্ণপ্রসাদ সেদিন সন্ধ্যায় মণীশের পিসীমা মঙ্গলা দেবীকে বলে পাঠিয়েছেন, মণীশ যেন কাল বাড়িতে উপস্থিত থাকে। কিন্তু মণীশ সেদিন রাত্রে ফেরে নি। এখন প্রায় রাত্রেই সে বাড়ি ফেরে না, হয় সর্বেশ্বরের আশ্রমে না হয় সুধীরের বাসায় রাত্রিটা কাটিয়ে দেয়।

সুধীর কাঞ্চনগড় ছেড়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে সে তার কাকা বংশীধরবাবুর বাসায় ছুটিতে আসে। সুধীর কাঞ্চনগড়ে এলে মণীশকে সহজে ছাড়ে না।

সর্বেশ্বরের আশ্রমে সুধীরও যায়। সুজাতা ও সুধীরের মধ্যেও বেশ ভাব জমেছে। পাহাড়ের কোলে তারা তিন জন ঘুরে বেড়ায়। শম্ভুনাথও আসে মাঝে মাঝে। সর্বেশ্বরের আশ্রমেই চরকা-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

চরকা-সঙ্ঘে সুতো-কাটা শেখানো হয়। পাঁচখানা তাঁতে কাপড় বোনারও ব্যবস্থা হয়েছে। পাহাড়ী মেয়ে ময়না, ডোমেদের মেয়ে সাবী আর রহমন দারোগার মেয়ে সাকিনা তাঁতে কাপড় বুনতে শিখেছে। শহর থেকে দু জন তাঁতে কাপড় বোনা শেখাতে এসেছিলেন; কিন্তু যোগীদের বুড়ো মহেন্দ্রনাথ আর তার ছেলে জলধরকে পাওয়ায় সর্বেশ্বর শহরের লোককে বিদেয় দিয়েছেন। সুজাতা এখন সব সময়ই ব্যস্ত থাকে। এরই মধ্যে সে তাঁতে কাপড় বোনাও শিখে নিয়েছে। রহমন দারোগা নিজেই একখানা তাঁত চালান।

কাঞ্চনগড় পাহাড়ের নিচে গঙ্গাপুর। গঙ্গাপুরেই রহমন দারোগার বাস। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই তিনি সর্বেশ্বরের আশ্রমে কাটান। দারোগাগিরির সঙ্গে তাঁর দাপটও গেছে; তবু এই লোকটাকে দেখলে ভয়ই পায় লোকে। বিরাট চেহারা, চওড়া বুক আর শাবলের মত হাত, লম্বা দাড়ি আর গোঁফ। রহমন দারোগা এখনও চোর-ডাকাতদের আতঙ্ক।

জোর ধমক আর জোর গলা শুনলে লোকে রহমন দারোগার কথাই ভাবত। এখন তার বদলে হাঃ-হাঃ-হাঃ প্রবল হাসি; কথায় কথায় হাসেন রহমন দারোগা।

স্টেথিস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে আর বগলে হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স নিয়ে এ-পাড়া ও-পাড়ায় সকাল-বিকাল রহমন দারোগা টহল দিয়ে আসেন। বয়স হয়েছে রহমন দারোগার। আর নাসিরকে হারিয়ে বেশ মুষড়েও গেছেন। সোজা হয়ে হাঁটতে কষ্ট হয় যেন। হাতে থাকে প্রকাণ্ড লাঠি। আশ্রমের সকলেরই তিনি চাচা। সুজাতা চাচাজীর কোলে সময় সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে রহমন দারোগার চোখ দিয়ে কখনও কখনও ধারা বয়ে যায়।

রহমন সুজাতাকে ডাকেন—পাগলী মেয়ে! সাকিনারও হাবভাবে পরিবর্তন এসেছে। একা সুজাতাই মেয়েদের মধ্যে শহুরে আবহাওয়ার ভদ্র শ্রী এনে দিয়েছে। সর্বেশ্বর এ পরিবর্তন দেখে তৃপ্তি পান; কিন্তু সুজাতার ভবিষ্যৎ তাঁকে ভাবিয়ে তোলে।

সর্বেশ্বর আজ পর্যন্ত সুজাতার রহস্য কাউকে খুলে বলেন নি। বাতাসীমনি ছাড়া সে রহস্য আর কেউ জানে না। অথচ সুজাতা বড় হয়ে উঠেছে; এখান-

কার সামাজিক আবহাওয়া তার পক্ষে অনুকূল নয়।

এদিকে আর এক চিন্তা। সর্বেশ্বরের নিষেধ সত্ত্বেও পাহাড়ীরা তেলের খনিতে কাজ করতে লেগেছে। ধীরে ধীরে আশে-পাশের চাষীরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বর্ষা নেমেছে; এখন জমি আবাদের লোক নেই। জমিদারের যত আক্রোশ পড়েছে সর্বেশ্বরের ওপর। সত্যই চাষীরা ভুল করেছে। চাষ আবাদ না হলে জটিল সমস্যা দেখা দেবে। অবশ্য খনিতে যারা মজুরি করছে, তাদের এখন বিশেষ কোন ভাবনার কারণ নেই। কিন্তু ভবিষ্যতের চিন্তা তারা করছে না।

কেরোসিনের উৎস আজ হোক আর দশ বছর পরে হোক শুকিয়ে যাবে। তখন ভিটেমাটি-ছাড়া এ কুলী-দলের কি হবে? গাঁয়ের তথাকথিত ভদ্রসমাজ যে এ কয় বছরে লোপাট হতে বসেবে। বামুন কায়েতের ছেলেরা তো মজুরি করবে না, নিজের হাতে লাঙলও ধরবে না। লাঙল ধরলে নাকি জাত যায়! পরিতাপের ম্লান হাসি খেলে সর্বেশ্বরের মুখে!

ভদ্রলোক?—ব্রাহ্মণ আর কায়স্থ! বাপ-পিতামহের ভিটায় বসে প্রাচুর্যের মোহে-বিলাসে সহজে দিন কাটাচ্ছে। লেখাপড়া কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা নেই। হাজার হাজার বছরের সংস্কারের বোঝা আজ তাদের ঘাড়ে ভূত হয়ে চেপে বসেছে। মিথ্যা আভিজাত্যের মোহে অন্ধ এরা। এরাই এ অঞ্চলের ভদ্রলোক! অথচ যাদের এরা নীচু ভাবে, তারাই কেমন এগিয়ে যাচ্ছে! আর এই চাষী আর পাহাড়ীরা? তারাও এদের আর মানবে না।

সর্বেশ্বর আকুল হয়ে ওঠেন। মানুষের সেবা করতে এসে এক দল মানুষকে ডুবে যেতে দেখছেন তিনি। অথচ তাদের উদ্ধার করবার কোন শক্তিই তাঁর নেই। সুধীর, মণীশ কিংবা সন্দীপের মত দু-চারটে ছেলে তাদের মধ্যে থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে, চাকরি করবে, গাঁয়ের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। শহরে সমাজে মিশে যাবে তারা। শহর বাড়বে, আর গ্রাম শুকোবে। কিন্তু গ্রাম শুকোলে যে শহর ভেঙে পড়বে!

মাঠের দিকে তাকিয়ে অস্থির হয়ে ওঠেন সর্বেশ্বর। বৃষ্টির জল জমা হয়েছে।

কোথাও বা আলগুলো ডুবে গেছে ; কোথাও বা আগাছার শ্যামল-শ্রী। থই থই করছে মাঠ ; ব্যাঙ ডাকছে—ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ্!

কাছাড়ের মাঠ। পাহাড়ে-ঘেরা উপত্যকার ওপর ধান্য-দূর্বার শ্যামল-শ্রী তাঁর চোখে ভেসে ওঠে। ঋতুর পর ঋতু একের পর এক চমক লাগায়। কত রঙের কত ধানের শীষ—কত জাতের শালি ধান—কৃত্তিকা, কস্তুরী, কালজিরা, হরিনারাণ মধুমালতী ও সাহেব শাইল,—কত কি!

চাঁপা, নাগেশ্বর, শাল আর সেগুনে ভরা জঙ্গল। পাহাড়ের গায়ে গায়ে শিমুল, পলাশ আর দেবকাঞ্চনের ছড়াছড়ি। বৈতসকুঞ্জ পাহাড়ী-পথে ; সোনা-লতা আর মাধবীলতা খেলা করে পথের দু ধারে ; ফোঁস ফোঁস করে বয়ে যায় অজস্র পাহাড়ী ছড়া।

চুপ করে বসে আছেন সর্বেশ্বর। এমন সময় সুজাতা এসে তাঁর কাছে দাঁড়াল। উৎকণ্ঠা তার চোখে-মুখে।

সুজাতা বললে,—জান বাবা! কৃষ্ণপ্রসাদবাবু হুকুম দিয়েছেন, কাল ভোরে এক শ লাঙল নামবে মাঠে।

সর্বেশ্বর বললেন,—এক শ লাঙল?

সুজাতা বললে,—হ্যাঁ। লক্ষ্মণ মালী আর নবীন মাঝিকে ডেকে তিনি শাসিয়েছেন।

সর্বেশ্বর বললেন,—তারা কি বললে?

সুজাতা উত্তর দেয়,—কি আর বলবে তারা? জমিদারের হুকুম তারা মানবে না।

সর্বেশ্বর বললেন,—বেশ তো, ওদের যা খুশি করুক। আমরা কি করতে পারি?

সুজাতা বলে,—জমিদারের এ রকম হুকুম না মানাই উচিত। কিন্তু বাবা! সত্যি কি চাষ-আবাদ বন্ধ করবে ওরা? মজুরির লোভে যে চাষীরা সর্বনাশ করছে!

সর্বেশ্বরের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি বললেন,—আমিও তাই ভাবছিলাম মা! কিন্তু কোন উপায় নেই। জমিদারের অত্যাচার কত আর

সহ্য করবে এরা! চাষ-আবাদ করে ষোল আনার এক আনাও যে চাষীদের ভোগে লাগে না। তাই তারা নিজেদের সর্বনাশ বুঝেও এ পথে চলেছে।

সুজাতা বললে,—কেন বাবা, ভদ্রলোকের ছেলেরা তো লাঙল ধরতে পারে।

সর্বেশ্বর বললেন,—জাত যাবে, জাত যাবে। বামুন-কায়েতের ছেলে হয়ে যে লাঙল ধরতে নেই রে পাগলী!

সুজাতা প্রশ্ন করে,—লাঙল ধরলে জাত যায়?

—হ্যাঁ, জাত যায়! এ দেশের বামুন-কায়েতরা তাই ভাবে। তাই তো বলি, তোমরা বিলেতে গিয়ে তাদের উন্নতির উৎসটা দেখে এসো; সেখানে কাজ দিয়ে জাতের বিচার নেই।

—কি আশ্চর্য?

সর্বেশ্বর হেসে হেসে উত্তর দেন,—আশ্চর্য হবার অনেক কিছু আছে রে, অনেক কিছু আছে। মানুষকে ছুঁলে মানুষের জাত যায় এ দেশে।

সুজাতা উত্তেজিত হয়ে বলে,—না বাবা! আমরা এ সব মানব না। চল আমরাই কাল মাঠে লাঙল নিয়ে নামি।

সর্বেশ্বর বললেন,—নামতে হবে বৈ কি রে, আমাদের সকলকেই নামতে হবে। কিন্তু আমরা দু জনে নামলেই তো এ সমস্যার সুরাহা হবে না। এক শ নয়, হাজার হাজার লাঙল চাই। মাঠের ক্ষুধা মেটাতে হবে। দেশের ক্ষুধা মেটাতে হবে।

সুজাতা বললে,—তা হলে উপায় কি হবে বাবা?

সর্বেশ্বর বললেন,—উপায় তো দেখি না। এই বামুন-কায়েতরা নিজেদের উপায় নিজেরা যেদিন না করবে, ততদিন রক্ষে নেই। বৃথা দম্ভে দেশটা গেল, ইউরোপে ঠিক তার বিপরীত, নিজের কাজ নিজে করাই গৌরব। কাজ দিয়ে জাত-বিচার হয় না সেখানে।

সুজাতা বললে,—আমরাই নামি না কেন বাবা?

সর্বেশ্বর বললেন,—নামব বৈ কি? কিন্তু এত বড় মাঠ,—তার ক্ষুধা মেটাবে কে? আরও বিপদ আছে।—

সুজাতা জিজ্ঞাসা করে—কি বিপদ বাবা?

সর্বেশ্বর হাসি-মুখে বলেন,—কার মাঠে নামব আমরা? কারও মাঠে নামতে গেলে সে যে মাথা ফাটাতে ছুটে আসবে।

সুজাতা বলে,—কেন? তার তো উপকারই হবে।

সর্বেশ্বর উত্তর দেন,—সে কথা ভাবছে কে? দেখছ না, বসন্তবাড়ির চারপাশে বন-জঙ্গল, আঁস্তাকুড়; রোগে-ভোগে মরছে। বুঝিয়ে দিলেও পরিষ্কার করবে না। মজা ডোবা আর পানাপুকুর সাফ করতে গিয়ে পাল-পাড়ায় কী না নাজেহাল হতে হল। কৃষ্ণপ্রসাদবাবুর চক্রান্তে নটবর পাল তো ফৌজদারী মামলা দায়ের করে দিয়েছিল।

সুজাতা বলে,—তা হলে ওরা মরুক বাবা! চল আমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাই। আমাদের পাহাড়ীরাই ভাল।

সর্বেশ্বর বললেন,—পাহাড়ীরাও জাগছে মা! তারা জাগছে প্রতিশোধ নিতে। ভদ্রজীবনের মোহ তাদেরও পেয়ে বসবে। দেখছিস না, এখানের পাহাড়ীরা কি করছে!

সর্বেশ্বর ও সুজাতার মধ্যে যখন এরকম কথাবার্তা হচ্ছে, তখন মণীশ আর সুধীর এসে সামনে দাঁড়াল।

সর্বেশ্বর বললেন,—এই যে তোমরা দু জনে এসেছ। ভালই হয়েছে; শুনলাম তোমরা গাঁয়ের লোকের এসব হামলায় জড়িয়ে পড়তে চাও। কিন্তু মণীশ, আমি ভেবে দেখলাম, এসব ঝামেলা থেকে তোমাদের সরে দাঁড়ানোই ভাল।

মণীশ বলেন,—এ কি বলছেন মাষ্টারমশাই? আমরা তো কোন ঝামেলায়ই যাব না। আমরা কয়েক জন মিলে নিজের হাতে মাঠে লাঙল চালাব। নিজেদের জমি নিজেরা আবাদ করব।

সর্বেশ্বর বললেন,—ভাল কথা। কিন্তু তাতে কি দেশের সমস্যা মিটবে?

মণীশ উত্তর দেয়,—নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা তো করতে হবে মাষ্টারমশাই!

সুজাতা বলে,—নিশ্চয়ই। আমরা দেশের লোকের সামনে একটা আদর্শ

খাড়া করব।

সুধীর বলে,—আমার মনে হয়, এতে কোন উপকারই হবে না। মিছামিছি একটা ঝামেলা।

মণীশ উত্তর দেয়,—ঝামেলাই বটে! বিলিতী কাপড় পোড়ানো বা বয়কট করাও একটা ঝামেলা।

সুজাতা বলে,—দেশের লোকের চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে।

সর্বেশ্বর সহাস্যে বলেন,—তোমাদের আমি বাধা দেব না মণীশ; কিন্তু তোমার বাড়িঘর, তোমার পিসীমা, তোমার সমাজ রয়েছে। তুমি কি তা ছাড়তে পারবে?

মণীশ বললে,—এসব ছাড়ার তো কোন কথাই ওঠে না মাষ্টারমশাই।

সর্বেশ্বর বলেন,—নিশ্চয়ই ওঠে। তুমি একা কি করতে পার, তোমার পাশে কেউ দাঁড়াবে না। সমাজের মোহ, চাকরির মোহ এখনও লোকের মনে রয়ে গেছে।

যার আছে, তার থাকুক বাবা! আমরা তা ভেঙে দেব। সুজাতার কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

সর্বেশ্বর হাসেন। সুধীর বলে,—বেশ আমিও রাজী আছি। কিন্তু দু দিনের জন্যই আমি এসেছি। এখানকার সমাজ কিংবা লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্কই বা কি?

সর্বেশ্বর বলেন,—তাই তো বলছিলাম সুধীর! মণীশের পাশে কেউ দাঁড়াবে না।

মণীশ বললে,—আমি সুজাতাকে নিয়ে সমস্ত গাঁখানা ঘুরে এসেছি মাষ্টারমশাই! অনেকেই আমাদের কথায় রাজী হয়েছে। পাল-পাড়া ও দত্ত-পাড়ার সব ছেলেই নামবে আমাদের সঙ্গে। মালী-পাড়া ও ডোম-পাড়ার মেয়েরাও নামবে।

সর্বেশ্বর বলেন,—তা হলে ভালই হল। কিন্তু এটা একদিনের জন্য ছেলেখেলা নয় মণীশ! সাধ করে মজা দেখবার জন্য হয়তো সবাই রাজী হয়েছে। কিন্তু এটা একটা গুরুতর কাজ। পুলিশের গুলির সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেয়েও কঠিন

কাজ এটা। বহু যুগের সংস্কারের বেড়াজাল ছিঁড়ে ফেলা সহজ নয়।

সর্বেশ্বর উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। তাঁর মুখমণ্ডল গম্ভীর ও দৃষ্টি স্থির। কেউ আর কোন কথা বলতে সাহস করছে না। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন,—বেশ, তাই কর তোমরা। আমি তোমাদের বাধা দিতে চাই না। এই করেই বেড়াজাল ছিঁড়তে হবে। আজ না হোক, দু দিন পরে সকলের চোখ ফুটবে।

মণীশ বললে—চল সুধীর, আমাকে এক্ষুনি ফুলছড়ি ফিরে যেতে হবে। সুধীরের হাত ধরে মণীশ বেরিয়ে যেতে যেতে বললে,—আমি রাত্রেই ফিরে আসব সুজাতা, তুমি তোমার পাহাড়ীদের তৈরী করে নিয়ো।

সুধীর, মণীশ আর সন্দীপ চলেছে বড় রাস্তা ধরে।

মণীশের অতখানি ইচ্ছে বা সাহস ছিল না। সুজাতাই তাকে উত্তেজিত করেছে। মণীশের মধ্যে এসেছে বিরাট পরিবর্তন। সুধীর তাকে বিদ্রূপ করে।

সন্দীপ বলে,—ছাখ মণীশ, আমার মনে হয়, সুজাতার জন্যই আমরা বিপদে পড়ব। এসব ঝামেলায় গিয়ে আমাদের কোন লাভ নাই।

মণীশ উত্তর দেয়,—কিন্তু সুজাতার কথা মিথ্যে নয় সন্দীপ! এটাও দেশের কাজ।

সন্দীপ বলে,—তাও মানছি। কিন্তু এখনও তার সময় আসে নি।

সুধীর বলে—দেশ স্বাধীন হবে কি না জানি না, কিন্তু ধীরে ধীরে এসব বাছবিচার আর থাকবে না।

সন্দীপ বলে,—হ্যাঁ, ঠিক কথা। শেষকালে বাধ্য হয়েই লোকে করবে। তার জন্য এখন সবাইকে ক্ষেপিয়ে কোন লাভ নেই।

মণীশ বলে,—লাভালাভ বুঝি নে ভাই! কিন্তু এটা আমাদের কর্তব্য, তাই বুঝি। তা না করলে উপায় নেই।

সুধীর হেসে উত্তর দেয়,—সুজাতার মাথার ছিট আছে মণীশ। আর সর্বেশ্বরবাবুরও তাই। তা না হলে এই পাহাড়ে-জঙ্গলে পড়ে আছেন!

সন্দীপ বলে,—ঠিক কথা বলেছিস সুধীর! যত সব হুজুগ! দেখলি না,

নন্-কো-অপারেশনের সেই ঢেউটা কেমন মিলিয়ে গেল। মিছামিছি কয়েকটা লোক মার খেলে আর জেলে গেল। এখন হুজুগ লাগিয়েছে সমাজের সংস্কার করতে হবে।

সুধীর বললে,—ছ্যাঃ, লেখাপড়া কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে এখন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বস্তি সাফ কর আর মাঠে গিয়ে লাঙল ধর। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছেড়ে দাও।

মণীশ বলে,—তোদের কথা মানতে পারলাম না সুধীর!

সুধীর উত্তর দেয়,—দু দিন পরে মানতে বাধ্য হবে। তুমি কি চাও যে সবাই এসে মাঠে লাঙল ধরুক। আর চাষীরা লাঙল ফেলে কলকারখানার মজুরি করুক।

মণীশ হেসে হেসে উত্তর দেয়,—তাই বলছি না কি? যারা বেকার তারাই করুক মজুরি, চাষীরা নয়।

সন্দীপ উত্তেজিত হয়ে বলে,—চাষের মজুরিতে পেট ভরে না, তাই তো তারা কলকারখানায় ছুটে যাচ্ছে মণীশ!

মণীশ বলে,—তা হলে এ সমস্যার মীমাংসা হবে না।

কথা বলতে বলতে তিন জনে এগিয়ে চলেছে; দূরে হ্যারিকেনের আলো এগিয়ে আসছে দেখা গেল। মণীশ বললে,—মালী-পাড়ার লোকেরা সন্ধ্যার আগে খবর দেবে বলেছিল। কিন্তু এতক্ষণ আসে নি, তারাই হয়তো আসছে।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, নবীন মাঝি এগিয়ে আসছে; তার পেছনে আরও কয়েক জন রয়েছে।

নবীন বললে,—কি গো দাদাঠাকুর, আমরা ঠিকই আছি। খবরটা দিতে দেরি হয়ে গেল।

মণীশ বললে,—বেশ তা হলে আমার আর গিয়ে কাজ নেই। আমরা ফিরে যাই।

নবীন বললে,—একটা কথা দাদাঠাকুর! সুজাতাদিদি বলে এসেছেন, জমিদারের জমিতেও নামতে হবে। সে কিন্তু আমরা পারব না বাপু!

সন্দীপ বললে,—ঠিক কথাই বলেছে।

মণীশ বললে,—কেন নামবে না?

নবীন বললে,—পেট ভরে না দাদাঠাকুর! জমিদারের জমি চষে যদি পেট ভরত, তা হলে কি মান-ইজ্জত খুইয়ে সব তেলগাত্তায় কাজ করতে যেত?

মণীশ বললে,—ক্ষেপে যাবেন জমিদার!

নবীন বললে,—ভয় কি দাদাঠাকুর! কি করবেন তিনি? কেউ তাঁর হয়ে দাঁড়াবে না।

মণীশ বললে,—দেখ নবীনদা! আমরা তো শুধু নিজেদের জন্যই এ কাজে নামছি না। দেশের কাজ এটা, সবাই যদি চাষ-আবাদ বন্ধ করে দেয়, তা হলে চলবে কি করে? জমিদারের সঙ্গে একটা রফা করে নাও না কেন?

নবীন বললে,—সে হয় না দাদাঠাকুর! জমিদার একটি নয়, দেশ জুড়ে কত জমিদার রয়েছে। তাঁরাই জমির মালিক, একথা তাঁরা ভুলতে না পারলে কোন রফাই হয় না।

সন্দীপ বলে,—বেশ তো, একবার দেখাই যাক না।

নবীন বললে,—আমার এত বয়স হল দাদাঠাকুর, কত দেখলাম। দেশের হালচাল সব বদলে যাচ্ছে। বেঁচে থাকলে আরও কত কি দেখতে পাব। আমার মনে হয়, ইংরেজ যেমন টিকবে না, তেমনি জমিদারিও টিকবে না। জাত, সমাজ, ধর্ম কোন কিছুই টিকবে না দাদাঠাকুর!

নবীন মাঝির দেহ সোজা হয়ে উঠল; সেই অন্ধকারের মধ্যে লণ্ঠনের মৃদু আলোয় যেন কালপুরুষ দাঁড়িয়ে আছে,—হাতে ধনুর্বাণ, কোমরে কোমরবন্ধ। মণীশ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে।

হ্যাঁ, এই শিক্ষাদীক্ষাহীন প্রবীণ নবীন মাঝির কথাগুলোর মধ্যে যেন কালের প্রতিধ্বনি শুনতে পায় মণীশ। নিশ্চয়ই, কিছুই টিকবে না। সুজাতা বলেছে এ কথা।

নবীন মাঝির দল বিদায় হয়ে গেল। মণীশ, সন্দীপ আর সুধীর ফিরে চলল কাঞ্চনগড়ের দিকে।

পরের দিন সকাল বেলা।

ভোর হতে না হতেই মাঠে মাঠে অভূতপূর্ব দৃশ্য।

কেউ কোনদিন ভাবে নি যে এরা মাঠে নেমে লাঙল ধরতে পারে। পালেদের অজয়, দত্তদের প্রবীর, বামুনপাড়ার নিবারণ চক্রবর্তী তারাও লাঙল ধরেছে। পাটনি-পাড়া, মালী-পাড়া আর ডোম-পাড়ার কিশোর ছেলেরাও নেমেছে তাদের সঙ্গে।

জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদ তাঁর কাছারী বাড়ির সামনের পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখছেন। দুলালচাঁদ ও আরও পাঁচ-সাত জন দাঁড়িয়ে আছে তাঁর কাছে।

নবীন মাঝি এসে নিবেদন করলে,—হুজুর! আপনার হুকুমই তামিল হয়েছে। মাঠে নেমেছে সবাই।

জমিদার ভ্রূকুটি করে বললেন,—হ্যাঁ! কিন্তু চাষীরা গেল কোথায়? আমার জমিতে লাঙল দেবে কে?

নবীন মাঝি বললে,—আপনার লোক দেবে কর্তাবাবু! আপনার নিজের লোককে হুকুম করুন। কি গো দুলালভায়া! নেমে পড়ুন না।

দুলাল বললে,—দরকার পড়লে নামব বৈ কি মাঝি! কিন্তু তোমরা আছ কি করতে?

নবীন বললে,—আমরা আর নেই ভায়া! বাপ-পিতামোর আমল থেকে চৌধুরী হুজুরদের হুকুম তামিল করে এসেছি, তাই টিকে আছে এ চত্বর, এ মাঠ আর এ বাড়ি। আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে, ছেলে নেই পুলে নেই তাগোর হাতে এ লাঠি দিয়ে যাব; লাঠি ধরবার পালা শেষ হয়ে গেছে; এখন এই নবীন বুড়ো শুধু দেখবে।

নবীনের কথা শুনে কৃষ্ণপ্রসাদ চঞ্চল হয়ে ওঠেন। হঠাৎ গম্ভীর ভাবে তিনি প্রশ্ন করেন,—কি বলছ নবীন, তোমার কথা যে বুঝতে পারছি না?

নবীন বললে,—বুঝতে পারবেন হুজুর! দেখছেন না, আপনার হুকুম তামিল করবার জন্যেই এসে দাঁড়িয়েছি। এখন দেখে শুধু চোখ দুটোকে সার্থক করব।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—এরা সব মাঠে নেমেছে। কিন্তু ছাগল দিয়ে কি গোরু-

ঘোষের কাজ চলে নবীন ? এদের এরকম পরামর্শ দিয়েছে কে ? বামুন-কায়েতের ছেলেরাও লাঙল ধরেছে। হ্যাঁ, যখন ধরেছে, তখন সারাজীবনই লাঙল ধরে থাকতে হবে।

এমন সময় সুজাতার দল এগিয়ে এল। সুজাতাকে এর আগে কৃষ্ণপ্রসাদ কোন দিন দেখেন নি। তার সঙ্গে এসেছে অনেক পাহাড়ী মেয়ে। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তাদের অনেককেই ভদ্র ঘরের মেয়ে বলেই ভুল হয়।

কৃষ্ণপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন,—এরা কারা ?

দুলালচাঁদ উত্তর দেয়,—হুজুর এই তো আমাগোর সর্বেশ্বর মাষ্টারের মেয়ে।

কৃষ্ণপ্রসাদ হকচকিয়ে উঠলেন। দীপ্ত শিখার এগিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল সুজাতা।

কৃষ্ণপ্রসাদ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলেন।

সুজাতা বললে,—আপনার কাছেই এলাম জেঠামশাই !

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—তুমি ?

সুজাতা উত্তর দেয়,—আমি সুজাতা। আমি সর্বেশ্বর বাবুর মেয়ে। আমাদের সাহায্য করতে হবে।

কৃষ্ণপ্রসাদ বিস্মিত হয়ে বলেন,—সাহায্য ? কি সাহায্য বল ?

সুজাতা বলে,—আপনি আমাদের সহায় হয়ে পেছনে দাঁড়ান জেঠামশাই, আপনি জমিদার, আপনার শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে। আপনি সমাজের মাথা, আপনি পেছনে দাঁড়ালে আমাদের কাজ সহজ হবে।

কৃষ্ণপ্রসাদ উত্তর দেন,—তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না মা। তোমরা কি করতে চাও ?

সুজাতা বলে,—দেশের কাজ। সমাজকে আমরা গড়ে তুলব ; দেশের মানুষকে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার মত শক্তিমান করে তুলব।

হা হা করে হেসে উঠলেন কৃষ্ণপ্রসাদ। তার পর বললেন, তাই বুঝি তোমার বাবার এরা সব লাঙল নিয়ে মাঠে নেমেছে। আমাকে জব্দ করতে জড়ো হয়েছে।

সুজাতা বললে,—না। আমার বাবা এতে নেই।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—নেই ?

সুজাতা বললে,—না। চাষী-কিষানরা কলকারখানার মজুরির লোভে চাষ-আবাদ ছেড়ে দিচ্ছে, এত বড় সর্বনাশ দেশের আর কিছুতেই হতে পারে না। তাই ভেবে আমরাই এ উদ্যোগ করেছি।

কৃষ্ণপ্রসাদ পায়চারি করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন,—তুমি আমায় একথা বিশ্বাস করতে বল মা ?

সুজাতা বলে,—হ্যাঁ। মনে রাখবেন, আমরা আপনাকেই চাই। আপনি আমাদের হয়ে দাঁড়ালে এ সর্বনাশ আমরা বন্ধ করতে পারব।

তুমি পারবে ? পারবে তুমি ?—এই সব হারামীর বাচ্ছাদের দাঁত ভেঙে দিতে পারবে তুমি ?—উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন কৃষ্ণপ্রসাদ।

তার পর বলেন,—এদের আমি দূর করে দেব। আমার জমিদারি থেকে দূর করব যত জঞ্জাল। ভিটেমাটি এক করে দেব এদের। যাক না, যাক ওই তেলের খনির নরককুণ্ডে।

সুজাতা শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়,—আপনার কথা মানতে পারলাম না জেঠা-মশাই! এরা যদি ভুল করে থাকে, তাদের ভুল শুধরে দিতে হবে। এরা যে আপনার আশ্রিত। আপনি যে জমিদার, ভূস্বামী, এরা যে আপনার প্রজা।

কৃষ্ণপ্রসাদ বিস্মিত হন সুজাতার কথায়।—কেমন মেয়ে! কতই বা বয়স হবে। কি সুন্দর কথা বলে! সর্বেশ্বরের মেয়ে? সোনালী আভা তার চুলে, পিঙ্গল চোখ। গায়ের রঙে সংশয় জাগে।

কৃষ্ণপ্রসাদ বলেন,—কিন্তু তোমরা যে মাঠে লাঙল নামিয়েছ, এই সব ছেলে-ছোকরা কি চাষ-আবাদের কাজ করতে পারবে ? না, শুধু বিদ্রূপ করবার জন্যই এ আয়োজন ?

সুজাতা উত্তর দেয়,—বিদ্রূপ নয় জেঠামশাই।

কৃষ্ণপ্রসাদ বলেন,—আমার জমি কে চাষ করবে ? আমাকেও কি লাঙল ধরতে হবে ?

সুজাতা বললে,—আপনার অংশীদার আপনার উত্তরাধিকারী আপনার

সন্তানেরা,—আপনার প্রজারা। তাদের সে অধিকার দিতে হবে।

কৃষ্ণপ্রসাদ বলেন,—অধিকার? কিসের অধিকার?

—সন্তানের অধিকার। বলতে হবে, আমারই উত্তরাধিকারী তোমরা। তোমরা আমারই সন্তান।

—বলতে হবে?

—হ্যাঁ। তা না হলে সর্বনাশ হবে জেঠামশাই! ওরাও মরবে, আর আমাদের সমাজ, অস্তিত্ব সব লোপ পেয়ে যাবে।

—সব লোপ পেয়ে যাবে!—বিস্ময় ও উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে কৃষ্ণপ্রসাদের কণ্ঠে।

সুজাতা জবাব দেয়,—নিজের কাজ নিজে করতে হবে আমাদের। তা ছাড়া কোন উপায় নেই জেঠামশাই। পরকে দিয়ে কাজ করানোর যুগ কেটে যাচ্ছে। মজুরি বেড়ে যাচ্ছে, মজুরের দাবি মেটাতে গেলে জমিদারির আরাম চলবে না, তাই মালিকানাকেও ছোট করে আনতে হবে।

কৃষ্ণপ্রসাদ হঠাৎ মন্ত্রমুগ্ধের মত বলে উঠলেন,—সুজাতা!

একটি মেয়ের কাছে এমন সব কথা শুনবেন, কৃষ্ণপ্রসাদ তা কল্পনাও করেন নি। এই সুজাতা সম্বন্ধে তিনি অনেক কথাই শুনেছেন। মণীশ আর সুজাতা সম্পর্কে অনেক কিছুই লোকে বলেছে। কিন্তু আজ চোখের সামনে সুজাতাকে দেখে তাঁর চিন্তাধারা বদলে গেল। মন্ত্রমুগ্ধ কৃষ্ণপ্রসাদ, কিন্তু তাঁর আভিজাত্য, তাঁর বনেদী স্বভাব, তাঁর বংশগত সহজাত দম্ভ সংশয়দোলায় তাঁর মনকে দোলাতে লাগল।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—চল মা! বাড়ির ভেতরে যাই। মাঠের কথা এখন নয়, তোমার কথা আমায় শুনতে হবে।

তার পর নবীন মাঝির দিকে ফিরে বললেন, তোমরা যা ভাল বোঝ কর নবীন। আমি চললাম, মাঠ তোমাদের। তোমাদের সর্বনাশ তোমরাই করবে। আমার নিজের জন্যে আমি ভাবি না।

কৃষ্ণপ্রসাদের সঙ্গে সুজাতা আর তার সঙ্গী মেয়েরা এগিয়ে চলল। দুলালচাঁদের দল তাদের অনুসরণ করতে গেলে কৃষ্ণপ্রসাদ তাদের বারণ করলেন।

সর্বেশ্বর মহা সমস্যায় পড়লেন।

সুজাতা সেদিন কৃষ্ণপ্রসাদের বাড়ি থেকে ফিরে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লেগে গেল। পল্লী-সংগঠনে মেতে উঠল সুজাতা। সর্বেশ্বর ভাবেন, এ মেয়ের আসল পরিচয় পেলে কৃষ্ণপ্রসাদ কেন, এ অঞ্চলের সকলেই সর্বেশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। আদিম সমাজের আদিম বর্বরতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।

ভিন্‌জাতের মেয়েকে সমাজে চালানোর অপরাধে অপরাধী হবেন সর্বেশ্বর। আর সুজাতার ভবিষ্যৎও এতে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কৃষ্ণপ্রসাদের মত দুর্দান্ত প্রকৃতির জমিদার আজ নিজের স্বার্থের জন্যই সুজাতাকে সহ্য করছে।

এ দেশ, এ সমাজ এমনি যে নিজের মেয়েও যদি সমাজের বাইরে এক পা এদিক-ওদিক করে তার ক্ষমা নেই। প্রকাশ্য বিদ্রোহের কোন ক্ষমা নেই এ সমাজে। অথচ এদের নৈতিক বল মোটেই নেই।

যে জাতের বড়াই করে এরা, যে নিয়ম-কানুনের বেড়াজালে সমাজকে বেঁধে রেখেছে বলে গর্ব করে, নিজেই মত্ততার ঘোরে তা লঙ্ঘন করে। হাড়ি-ডোম সমাজে অস্পৃশ্য অথচ লোকচক্ষুর অন্তরালে তাদের ঘরেই ভদ্রলোকেরা নিজেদের পাশবিক মত্ততা চরিতার্থ করতে যায়। চিন্তায় ডুবে যান সর্বেশ্বর।

কিছুক্ষণ পর যেন আশার আলো দেখতে পান সর্বেশ্বর। নবাগত ডেভিডের ছবি তাঁর চোখের সামনে ভাসে। তেলের খনির নূতন ইঞ্জিনীয়ার ডেভিড।

সুজাতা নিজের পরিচয় জানে না। সে জানে এদেশের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগসূত্র রয়েছে। সর্বেশ্বরেরই কন্যা সে। সর্বেশ্বরের জীবনের মহান আদর্শ তাকে অনুপ্রাণিত করেছে; যত বয়স বাড়ছে, ততই পিতৃগৌরবে নিজেকে ধন্যই মনে করছে। কিন্তু এ গৌরব সত্যই তাঁর প্রাপ্য নয়। রবার্টসনের আদর্শই এ গৌরবের দাবি রাখে। একথা জানেন সর্বেশ্বর।

সুজাতা জানে,—এই হীনতা এই নীচতার মধ্যেও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার বাবা। তার বাবা সর্বেশ্বর একক, তাঁর দোসর নেই। সর্বেশ্বরের কাছে ভেদাভেদ নেই, মুসলমান, পাহাড়ী কিংবা খ্রীষ্টান সকলকেই সর্বেশ্বর মনুষ্যত্বের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে যান।

সেই শিক্ষা, সেই দীক্ষাই পেয়েছে সুজাতা।

মণীশের সম্পর্কেও ভাবে সুজাতা।

সরলতার দীপ্তি রয়েছে মণীশের মুখে। অথচ নিজের ব্যক্তিত্বে মহীয়ান মণীশ। সন্দীপ, সুধীর কিংবা শম্ভুনাথ,—তাদের সঙ্গে মনে মনে তুলনা করে সুজাতা। অথচ মণীশ সকলের চেয়ে গরীব; নিঃস্ব বললেও চলে। কিন্তু মনের দিক্ থেকে মণীশই সকলের চেয়ে বিত্তবান।

আবার ভাবে সুজাতা। তার ভাবনার অন্ত নেই। বাবা বলেছেন, এখানে আর তাকে রাখবেন না। তার ভবিষ্যৎ আছে; কলকাতায় সাহেবদের স্কুলে তাকে পাঠাবেন। কিন্তু কেন?—কেন?

এখানেই বেশ কাটাতে পারবে সুজাতা! পল্লীর ক্রোড়ে কুটির বেঁধে সুন্দর জীবন। গ্রাম্য বধূদের ছবি ফুটে ওঠে তার চোখের সামনে। কোলে শিশু, নূতন মা হয়ে বসে আছে কত মেয়ে!

লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে সুজাতার মুখ! না, না, চায় না সে এ জীবন। দেশের সেবায় সে জীবন কাটিয়ে দেবে। কেন পারবে না? হিন্দু-ঘরের বিধবারা যেমন সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। না, সে বিলেতে যাবে; সে দেশের কর্মশক্তি আর এ দেশের ভাব-শক্তি এক করতে পারলে জগতের সব সমস্যা মিটে যাবে। এ কথা বলেছেন তার বাবা।

সন্ধ্যার কথাও ভাবে সুজাতা। হ্যাঁ সন্ধ্যা—কিন্তু সত্যই কি সন্ধ্যা মানুষের মত জীবন কাটাতে পারছে। তার কি কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই? বালবিধবা সন্ধ্যা!

শিউরে ওঠে সুজাতা।

তার নিজের সঙ্গে সন্ধ্যার তুলনা করে শিউরে ওঠে সুজাতা। বালবিধবার জীবন! না, না, এ রীতিমত অত্যাচার! সমাজের শাসন নয়, রীতিমত অত্যাচার!

আবার ভাবে সুজাতা।

ডেভিড এসেছে। কেরোসিন তেলের খনিতে এসেছে নূতন ইঞ্জিনীয়ার।

খনিজ-বিদ্যায় সুদক্ষ সে। এ দেশে ঠিক চাকুরি করতে আসে নি; সে এসেছে এ দেশের মাটি দেখতে। এরই মধ্যে বেশ রপ্ত করে নিয়েছে এদেশের ভাষা।

সোনার দেশ ভারতবর্ষ। ডেভিড বলেছে,—সত্যি এ কথা। এ দেশের মাটিতে সোনা রয়েছে; এ দেশের প্রত্যেকটি ধূলিকণার মধ্যে আছে সোনার সম্পদ। ডেভিডের দেশে এমন হয় না; সেখানে মানুষকে রীতিমত খেটে খেতে হয়। এ দেশের মাটিতে বীজ ছড়িয়ে দিলেই ফসল হয়, সোনা ফলে; সে দেশে প্রাণপাত করে জমি তৈরি করলে তবে ফসল হয়। সত্যি এ দেশ সুজলা সুফলা। ডেভিড ঠিকই বলেছে।

ডেভিডকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে সুজাতা। সুজাতার ভাল লাগে আত্মভোলা ডেভিডকে। নিশ্চয়ই ডেভিডের মাথায় ছিট আছে। কত দূরে তার নিজের দেশ; তবু অদম্য উৎসাহ। জানবার আগ্রহ তার অদম্য।

যুবক ডেভিড। নিজের দেশের কথা ভাবে না। এ দেশে এসে যা দেখছে, তাতেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ দেশের পাহাড়-জঙ্গল, নদী-নালা, জন্তু-জানোয়ার তার কাছে সবই সুন্দর।

সর্বেশ্বরের আশ্রমে এসেছিল ডেভিড। নিতান্ত কৌতূহলের বশেই এসেছিল সে। ওপারের ঐ বাংলোর সামনের টিলায় দাঁড়িয়ে এপারের এ শোভা দেখতে দেখতে কৌতূহল নিবারণ করবার জন্যই এসে দাঁড়িয়েছিল এখানে।

তার পর, সর্বেশ্বরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আর তাঁর কার্যকলাপের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেছে ডেভিড। এখন সে প্রায়ই আসে। মণীশ আর সুজাতা এখন তার নিত্য সঙ্গী। সারাদিন হৈ-হুল্লোড়ে, বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে দিন কেটে যায়।

সুজাতা ভাবে,—কোথায় তার দেশ, আর কোথায় চলে এসেছে ডেভিড! কি জন্য চলে এসেছে সে? দেখবে, জানবে, নানা দেশ, নানা জাতির পরিচয় নিতে এসেছে। ভিন্ দেশের মাটি পরখ করতে এসেছে ডেভিড।

সুজাতার চোখের সামনে ইতিহাসের পাতার পর পাতা ভেসে ওঠে জীবন্ত হয়ে, কত জাতের কত মানুষ এসেছে এ দেশে,—মধ্য এশিয়া থেকে দুর্বার স্রোতে

মরুপথ, দুর্ভেদ্য গিরি, দুর্গম অরণ্য ভেদ করে এসেছিল আর্যেরা; তার পর শক, হূণ, পাঠান, মোগল—কত এসেছে; সে স্রোত এখনও ক্ষান্ত হয় নি। বৈরাগীর গান কানে ভেসে আসে—

মন-মাঝি রে, ও তোর যাত্রা অইল সুরু।
কোন্ দেশের কোন্ গহন বনে
বইস্যা আছে গুরু।
দেশের পরে দেশ রইয়্যাছে,
ওরে তারার উপর তারা।
ওরে চাঁদ সুরয কত না আছে
নাই রে কূল-কিনারা।

এমনি কত গান, এ দেশের আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়ায়। বৈরাগী আর বাউল কোথায় পেল এ গান? সুজাতা ভাবে,—তবু এ দেশের মানুষ এমন কেন? এ দেশের সমাজ এমন জগদ্দল পাথরের মত মানুষকে চেপে রেখেছে কেন?

আষাঢ়ের বিকাল। আকাশের এখানে ওখানে কালো কালো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে; পশ্চিম পাটে হেলে পড়েছে সূর্য। সুজাতা তাদের আশ্রমের সামনে টিলার উপর দাঁড়িয়ে ওপারের সিদ্ধিনাথের মন্দিরের চূড়া লক্ষ্য করছে। ওপারের তেলের খনির চিমনিগুলোও দেখা যাচ্ছে।

এমন সময় মণীশ এসে চুপি চুপি সুজাতার পেছনে দাঁড়াল। সুজাতা বুঝতেই পারে নি। এমনি আনমনা হয়ে ভাবছে সে।

মণীশ সুজাতাকে চমকে দেবার জন্য পেছন থেকে এক মুঠো বেলফুল তার তার মাথার উপর ধীরে ধীরে রেখে দিলে। ফুলগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তেই সুজাতা হকচকিয়ে উঠল। ফিরে দেখে মণীশ হাসছে।

—একি মণীশদা! তুমি কখন এলে?

—এসেছি অনেকক্ষণ। কিন্তু তুমি আনমনা হয়ে কি যে ভাবছ বুঝতে পারছি না। কোনদিন তো তোমাকে এত ভাব-বিহ্বল দেখি নি।

—কোথায় আবার আমাকে ভাব-বিহ্বল দেখলে তুমি ?

হেসে হেসে মণীশ উত্তর দেয়,—কোথায় আবার দেখব ? এই তো এখনই দেখছি। দূর থেকে দেখে আসছি, তুমি একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছ এদিকে। পাহাড়ের চূড়ায় পার্বতীর মত বড় সুন্দর লাগছিল তোমায়।

সুজাতা হেসে বলে,—তাই বুঝি ফুলের অর্ঘ্য দিলে পার্বতীকে ?

মণীশ বলে,—হাঁ। অর্ঘ্যই দিলাম। হয়তো এ অর্ঘ্যই শেষ অর্ঘ্য।

সুজাতা বলে,—কেন ?

মণীশ জবাব দেয়,—কেন আবার ? তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ সুজাতা !

সুজাতা বলে,—কে তোমায় এ খবর দিলে মণীশদা !

মণীশ বলে,—তুমি তো কলকাতায় সাহেবদের স্কুলে পড়তে যাচ্ছ। হয়তো ডেভিডই তোমায় নিয়ে যাবে।

সুজাতা উত্তর দেয়,—হ্যাঁ বাবার তাই ইচ্ছা বটে। কিন্তু সাহেবদের স্কুলে পড়ে আমার কি হবে ? এদেশের মেয়ে আমি, এদেশের মেয়েদের কোন শিক্ষার দরকার হয় না মণীশদা।

মণীশ বললে,—আজ নূতন কথা শোনালে সুজাতা ! তুমিই বলেছ, এদেশের মেয়েদের শিক্ষা নেই দীক্ষা নেই। মানুষের অধিকার তাদের নেই। তাদের গড়ে তুলতে হলে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে। তাই বোধ হয় মাষ্টারমশাই তোমায় সেই শিক্ষা দিতেই সংকল্প করেছেন। এখানে তো তা হবার নয়।

সুজাতা বললে,—আমার কোন দরকার নেই মণীশদা ! বোঝা বাড়িয়ে আর কোন লাভ নেই।

মণীশ বলে,—তোমার সুর যে বদলে গেল সুজাতা !

সুজাতা উত্তর দেয়,—সুর বদলায় নি মণীশদা ! আমার যা কাজ, আমি তা করব।

মণীশ বলে,—এই অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকবে ?

সুজাতা বলে,—এসব পাড়াগাঁ যদি শহর হয়ে পড়ে মণীশদা, এ দেশ যে

বাঁচবে না।

মণীশ বলে,—বাঁচবে না? কেন বাঁচবে না?

সুজাতা উত্তর দেয়,—সে কথাই তো সেদিন হয়ে গেল মণীশদা! চাষীরা চাষ-আবাদ ছেড়ে দিলে তোমার শহর দাঁড়াবে কোথায়? আর একটা কথা,—আমি ভেবে দেখেছি, শুধু পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে পারে না এ দেশের লোক; আর সবই ঠিক আছে।

মণীশ বলে,—আমাদের সমাজ আমাদের সংস্কার এগুলো সবই ঠিক আছে তোমার মতে।

সুজাতা বলে,—না। তার সংশোধন চাই। তার জন্য আমার বিদেশে যাবার কোন প্রয়োজন দেখি না। মেয়েদের পক্ষে মা হওয়াই আদর্শ। এ দেশের প্রত্যেকটি মেয়ের নাড়িতে সে আদর্শ রয়েছে। এদেশের পুরনো ধ্বংসস্তূপগুলো তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। পোড়া-রাজার স্তূপটা তারই সাক্ষ্য দেয় মণীশদা! কলাবতী আর ইন্দ্রাণী মিথ্যা নয়।

মণীশ বলে,—কলাবতী আর ইন্দ্রাণীর কথা বলছ কেন?

সুজাতা বলে,—কলাবতীর প্রেম অমর হয়ে রয়েছে মণীশদা! এ দেশের মেয়েদের কাছে অনেক কিছু শেখবার আছে। এমন সহনশীলা মা বোন আমাদের; তাদের ছেড়ে সাহেবদের কাছে কী শিখতে যাব? হ্যাঁ, জ্ঞানবিজ্ঞানের পিপাসা মেটাতে আধুনিক যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে তাদের শরণ নিতে হবে বৈ কি! কিন্তু সে কাজ পুরুষদের—মেয়েদের নয়।

মণীশ উত্তর দেয়,—সবই বুঝি সুজাতা! কিন্তু কোন উপায় নেই। এ সমাজে এসব লোকের মধ্যে থেকে এদের সংশোধন করা যাবে না।

সুজাতা বলে,—একদিনে তা হবে না মণীশদা, আর তা হবারও নয়। ইন্দ্রাণীর মত মা, ইন্দ্রাণী আর কলাবতীর মত মেয়ে যে দেশে জন্মায়, যে দেশের বন-জঙ্গল তাদের স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, সে দেশের নারীর জন্য ভাবতে হয় না।

সুজাতার গলা ভারী হয়ে আসে; করুণার্দ্র তার চোখমুখে মণীশ নূতন ভাষা খুঁজে পায়। সুজাতা বলে,—কলাবতীর কাহিনী তোমার কেমন লাগে মণীশদা!

মণীশ উত্তর দেয়—ভালই লাগে। কিন্তু বিশ্বাস হয় না।

সুজাতা বলে,—তোমার বিশ্বাস হয় না! সীতা সাবিত্রী আর বেহুলার দেশে যে এরকম ঘটতে পারে তুমি বিশ্বাস কর না?

মণীশ বলে,—সে কথা হচ্ছে না সুজাতা! আমি বলছি, ওই রাজার কাণ্ড।

সুজাতা বলে,—এদেশে সবই সম্ভব মণীশদা! রাজ-রাজড়াদের কাণ্ড তুমি জান না। বৃথা দম্ভ আর মর্যাদাবোধ এদের সর্বনাশ করেছে। ওরা বিবেক-বুদ্ধিহীন হয়ে পড়ে। নিজের ছেলেমেয়েকেও ক্ষমা করে না।

মণীশ বলে,—জানি সুজাতা।

সুজাতা বলে,—কি সুন্দর মৃত্যু! কলাবতীর মত মৃত্যু সব নারীই চায়। ইন্দ্রাণীর মাঝে জেগে উঠেছিল ঘুমন্ত মা। কি সুন্দর এ কাহিনী। শান্তশীল আর কলাবতীর কাহিনীর মত কাহিনী জগতে দুর্লভ মণীশদা!

মণীশ বললে,—যাক্ এসব কাহিনী মনে হলে কষ্টই হয় সুজাতা! এযুগে এরকম কিছু ঘটবে না, আর এরকম মেয়েও কেউ জন্মাবে না।

সুজাতা বললে,—এরকম কিছু না ঘটতে পারে মণীশদা! কিন্তু আমি দেখছি এদেশের ঘরে ঘরে এরকম মেয়ে অজস্র জন্মায়।

মণীশ বললে,—তা ঠিক। কিন্তু তারা তাদের উপযুক্ত মর্যাদা পায় না সুজাতা। কলাবতীর মত, ইন্দ্রাণীর মতই তাদের পুড়ে মরতে হয়।

সুজাতা আর্দ্র কণ্ঠে বললে,—এরকম মরায়ও সুখ আছে মণীশদা!

মণীশ হেসে হেসে উত্তর দেয়,—সুখ আছে বলতে চাও? তুমি বড় সেণ্টি-মেণ্টাল সুজাতা!

সুজাতা উত্তর দেয়,—সেণ্টিমেণ্টাল কে নয় মণীশদা? সেণ্টিমেণ্টই মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেণ্টিমেণ্ট না থাকলে মানুষ নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে উঠত।

মণীশ বলে,—তাও ঠিক। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও বুঝতে পারছি না।

সুজাতা উত্তর দেয়,—তোমায় বোঝাতে পারব না মণীশদা! আমি দেখছি মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই; দুর্বার কৌতূহলই মানুষকে দুর্বার গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর শেষ কোথাও নেই। এ কৌতূহলকে দমন না করলে সংহত না

করলে শান্তি নেই।

মণীশ বলে,—এখনও ঠিক তোমার কথা বুঝতে পারি নি সুজাতা।

সুজাতা বলে,—না, তুমি বুঝবে না। আমি চাই শান্ত পরিবেশে তৃপ্তি। সুখের নীড় বাঁধে পাখি। আকাশে উড়ে বেড়ালেও নিজের নীড়েই ফিরে আসে সে। অনন্ত আকাশে উধাও হয়ে যায় না।

মণীশ গম্ভীর ভাবে বলে—হুঁ!

সুজাতা হঠাৎ মণীশের হাত চেপে ধরে; তার চোখ দুটি ছলছল করে ওঠে। সুজাতার চোখে মণীশ কি যে ভাষার আভাস পায়, নিজেই তা ঠিক ধরতে পারে না। তবু সম্পূর্ণ নূতন ধরনের অনাস্বাদিত এক অনুভূতি জাগে মণীশের মনে।

মণীশ বলে,—এ কি সুজাতা?

সুজাতা উত্তর দেয় না, শুধু তার চোখে ধারা নামে। মণীশ কি যে বলবে ভেবে পায় না। শুধু সুজাতার মাথাটা বুকে চেপে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

ডেভিড মনে মনে ভাবে, সে যাকে খুঁজতে এসেছে তাকে পেয়ে গেছে; তার বাবা লয়েড এই মেয়েরই কথা বলে গেছেন, কিন্তু সংশয় জাগে; নথিপত্র হারিয়েছে সে। আর মায়া লাগে,—এ ফুল বৃন্তচ্যুত করতে মমতা এসে দ্বিধা জাগায় মনে।

কয়েকদিন পর।

ডেভিড আর সুজাতার মধ্যে কথা হচ্ছে। পাহাড়ী পথে চলেছে দু জনে। অদূরে পোড়ারাজার টিলাটা দেখা যাচ্ছে; অল্প ধোঁয়া উড়ছে সে টিলার মাথা থেকে।

ডেভিড বললে,—ইট ইজ এ লাই সুজাতা! এটা একদম মিথ্যে কথা।

সুজাতা উত্তেজিত হয়ে বলে—কক্ষনো নয়। তুমি বিদেশী; কি করে এদেশের মর্মকথা বুঝবে।

ডেভিড বলে—এ ভড়্‌কানো। নিশ্চয়ই এখানে লুক্কায়িত আগ্নেয়গিরি রয়েছে!

সুজাতা বলে,—ভল্‌কানো ? একটা আগ্নেয় পর্বত ?

ডেভিড বলে,—ভূতত্ত্ব-বিদ্যায় তাই বলে।

সুজাতা উত্তর দেয়,—কিন্তু দস্তুরমত পাকাবাড়ির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, তাও কি মিথ্যে ?

ডেভিড হেসে উত্তর দেয়,—তা কি আমি মিথ্যে বলছি ! দেয়ার মাইট বি এ প্যালেস্‌,—একটা রাজবাড়ি হয়তো ছিল। আগ্নেয় পর্বত তা নষ্ট করে দিয়েছে।

সুজাতা বলে,—তা হলেও কাহিনীটা সত্য। ইট ইজ ট্রু।

ডেভিড বলে,—নো, নো। প্যালেসের রুইন্‌স্‌ আছে বলেই যে গল্পটা সত্যি তা হতে পারে না।

সুজাতা উত্তেজিত স্বরে বলে,—তা হলে তোমার রোমিও আর জুলিয়েটের কাহিনীও মিথ্যা।

ডেভিড উত্তর দেয়,—হ্যাঁ, মিথ্যা বলতে পার কিন্তু তার মধ্যে যে সত্যটা রয়েছে, সেটা মিথ্যা নয়।

সুজাতা বলে,—কি সত্য রয়েছে তার মাঝে ?

ডেভিড হাসিমুখে বলে—ভালবাসা।

সুজাতা বলে,—তা হলে শান্তশীল আর কলাবতীর কথাও সত্য। তুমি কি বলতে চাও যে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে না ?

ডেভিড বলে,—হ্যাঁ, ঘটতে পারে। কবি বা সাহিত্যিক যা জগতে ঘটে না, তা কল্পনা করতে পারে না। এটাও এক রকমের কাব্য।

সুজাতা বলে,—এটা কাল্পনিক কাব্য নয় ডেভিড ! তার সাক্ষ্য রয়েছে।

ডেভিড বলে,—এ দেশ বড় অদ্ভুত দেশ সুজাতা ! এদেশের লোক কাব্যকে ধরে রাখে প্রকৃতির মধ্যে—বন, জঙ্গল, শিলাস্তূপ, পুরনো দিঘি, নদীর ঘাট, পোড়ো-বাড়ি ; সবই এমনি কাব্য-কাহিনী দিয়ে ঘিরে রেখেছে এদেশের মানুষ। কবি কিংবা সাহিত্যিক কয়জন হয় সুজাতা ? যারা বই লিখে নাম করেছে, তারা কয়জন ? তার চেয়ে তোমাদের এ দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে কবিমন ছড়িয়ে রয়েছে। তারাই এসব কাহিনী সামান্য সূত্র ধরে রচনা করেছে ; অলিখিত

তাদের কাব্যকাহিনী এরকম ধ্বংসস্তূপে লেখা রয়েছে অদৃশ্য লিপিতে; সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফেরে তাদের গাথা কাহিনী।

সুজাতা ডেভিডের কথা শুনে বিস্মিত হয়; এ যে সম্পূর্ণ নূতন কথা। বিদেশী যুবক এসে এদেশের মানুষকে যে এভাবে দেখেছে, তাতে আশ্চর্য হতে হয়। কই এদেশের কেউ তো এমন ভাবে কোনদিন বলে নি! সুজাতার গতি মন্থর হয়ে আসে।

সুজাতা বলে,—তোমার কথা হয়তো সত্যি ডেভিড! কিন্তু আমি ভাবছি যে দেশের আকাশে-বাতাসে এমন কাহিনীর ছড়াছড়ি, সে দেশের মানুষ এমন ছন্নছাড়া হতচ্ছাড়া কেন? কুসংস্কারে ভরে আছে তাদের দেহমন। তারা কি কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে?

ডেভিড উত্তর দেয়,—সে ভাবনা তোমার আমার নয় সুজাতা! আপনা-আপনিই তারা মাথা তুলে দাঁড়াবে। আমি দেখছি, আমাদের দেশ আর সমাজের চাইতে এক হিসাবে তোমরা অনেক সুখী।

সুজাতা বিস্ময়ের সুরে বলে,—আমরা সুখী?

ডেভিড বলে,—হ্যাঁ সুখী। তুমি জান না সুজাতা, আমাদের ইউরোপের সমাজে নির্ভর করে দাঁড়াবার মত কোন ভিত নেই; স্বামী-স্ত্রীতে ঘর বাঁধবে, তাতেও নির্ভরতা নেই। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। দু দিনের বিশ্বাস, গভীর ভালবাসা দু দিনেই ভেঙে যেতে পারে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থাকতেও বাপ আর মায়ের মধ্যে ডাইভোর্স হয়ে যায়। এ প্রেমের কি মূল্য আছে বলতে পার? আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় উন্নতি করছি, নিত্য নূতন আবিষ্কার করছি। কিন্তু শান্তি কোথায়? তার শেষ কোথায়?

সুজাতা বলে,—তুমি কি বলতে চাও এ দেশের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুখ আছে, শান্তি আছে।

ডেভিড বলে,—আর কিছু না থাক, অন্তত এক জন আর এক জনের উপর নির্ভর করতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যতই মতভেদ হোক্, যতই অত্যাচার করুক স্বামী, স্ত্রী জানে এ মানুষটিই তার পরম নির্ভর! তার ছেলেমেয়েরা একে

আশ্রয় করেই মানুষ হবে। কিন্তু আমাদের ইউরোপের সমাজে তা নেই।

সুজাতা বলে,—তা হলে ইউরোপ এগিয়ে চলেছে কিসের জোরে ?

ডেভিড বলে,—অতৃপ্তির আগুন জ্বলছে তার বুকে; পৃথিবীটাকে, এমন কি সূর্য চন্দ্র আকাশকেও নিঙড়ে তারা ভোগের খোরাক জুগিয়ে তৃপ্তি পেতে চায়। ঘরে যার তৃপ্তি নেই, বাইরেই সে তা খুঁজে বেড়ায়।

সুজাতা বলে,—নূতন কথা শোনালে ডেভিড! তা হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় কোন লাভ নেই বলতে চাও ?

ডেভিড উত্তর দেয়—হ্যাঁ, এদেশের গ্রাম্য জীবন তার চেয়ে ঢের ভাল। ভাবো দেখি, কত রাজা, কত রাজ্যপাট ধ্বংস হয়ে গেল, কিন্তু এদেশের মানুষগুলি ঠিকই আছে। তারা রাজনীতির ধার ধারে না; পলিটিক্স তাদের মাথা গুলিয়ে দেয় নি। কিন্তু আজ পলিটিক্সও তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইছে এক দল লোক। তাতে সে শান্তি নষ্ট হয়ে যাবে। মানুষ শান্তি চায় সুজাতা! সুখ-শান্তির নীড় বাঁধতে চায় মানুষ।

সুজাতা বলে,—সত্যি বলছ ডেভিড! তোমাদের ওই পলিটিক্সের আঘাত এদেশের সনাতন সমাজকে আঘাত করছে। আমার মনে হয়, তাতে করে এ শান্তির নীড়গুলোও ভেঙ্গে পড়বে। সেগুলোকে বাঁচাতে হবে।

হো-হো করে হেসে উঠল ডেভিড। তার পর বললে, চেষ্টা করলেও বাঁচাতে পারবে না সুজাতা! যদি বাঁচে আপনিই বেঁচে থাকবে। এদেশের জীবনে এনে দিতে হবে পরিচ্ছন্ন ধারা! আমার মনে হয়, তোমার বাবাই ঠিক কাজ করছেন।

সুজাতা বলে, তোমাদের দেশ আমাদের কাছে একটা বিস্ময় ডেভিড! তোমার কথা মেনে নিলেও সে দেশ দেখবার সাধ হয়। তোমাদের দেশ যদি এদেশের ভাব-ধারা মেনে নেয়, তা হলে তোমাদেরই জিত হবে।

ডেভিড বললে,—সে হবে না সুজাতা! জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি কেউ রোধ করতে পারে না। আর যতই তা এগিয়ে চলবে, ততই মানুষের অতৃপ্তি বেড়ে যাবে।

তার পর হেসে হেসে বললে, এই দেখ না—আমি কেন এসেছি ? আমার

দেশ আমাকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। আমার দেশের কুমারীদের আমি বিশ্বাস করতে পারি নি। ডালিয়াকে বিশ্বাস করতাম, ভালবাসতাম। শেষে দেখলাম সবই মিথ্যা। কাউকে নির্ভর করতে, বিশ্বাস করতে পারি নি সুজাতা! আমার বাবা, আমার মা তাঁরাও পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। দু জন দু দিকে চলে গেছেন। আর এ জগতে নেইও দু জনে। বল দেখি আমি দাঁড়াব কোথা? তার উপর বাবা দিয়ে গেলেন এমন একটা কাজ, যার জন্য এদেশে এসেছি। শাপে বর হয়ে গেল, মনে হচ্ছে সত্যিকার ডালিয়াকে খুঁজে পেয়েছি এদেশে।

সুজাতা বলে,—ডেভিড! তুমি ভুল করেছ, এদেশ তোমায় নেবে না।

ডেভিড উত্তর দেয়,—নেবে না? এদেশের ইতিহাস তো তা বলে না।

সুজাতা বলে,—সে শক্তি এদেশ হারিয়েছে ডেভিড। নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে এরা, তাই তো এ দুর্গতি।

ডেভিড বলে—এদেশের কোথাও কি বিদেশীর কোন আশ্রয় নেই সুজাতা!

সুজাতা যেন বেদনার স্বরে বলে,—না তুমি চিরকালই বিদেশী থেকে যাবে।

ডেভিড বলে,—এ সংস্কার ভেঙ্গে দিতে হবে; এর প্রাণশক্তির উৎস খুলে দিতে হবে। এমন পুরুষ কিংবা নারী কি কেউ নেই এদেশে?

সুজাতা বলে,—যারা এপথে পা বাড়াবে তারা না এদেশী, না বিদেশী কিন্তু তকিমাকার কিছু গড়ে তুলবে ডেভিড!

ডেভিড সুজাতার কথায় বিস্মিত হয়। যে দেশের নারী এমন শিক্ষাধারার সঙ্গে পরিচিত, সে দেশ যে অবহেলার নয় তা বুঝতে পারে। সুজাতার প্রতি তার শ্রদ্ধা বাড়ে। এ কয়দিনে সর্বেশ্বর বাবুর যে পরিচয় সে পেয়েছে, তাতে সুজাতা যে পরিপূর্ণ ভাবে তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত তা বুঝতে পারে। তাদের দেশের এ বয়সের মেয়েরা এমন ভাব- এবং তত্ত্বপূর্ণ কথা বুঝবেই না।

তবু ডেভিডের মনে হয়, সুজাতা যেন এদেশের মধ্যে একটা ব্যতিক্রম। এদেশের শহরে, নগরে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে অনেক মেয়ে দেখেছে, তাদের মধ্যে তো সুজাতার মত কাউকে পায় নি! তারা বরং এদেশকে ভুলে থাকতে চায়! এ দেশের কোন কিছুর সত্যিকার পরিচয় দিতে যেন সংকোচ বোধ করে।

তারা ডেভিডের দেশকেই কল্পনালোকের আদর্শ করে রেখেছে।

চুপ করে থাকে ডেভিড। দু জনে নীরবে সর্বেশ্বরের আশ্রমের দিকে ফিরছে। সুজাতার এলায়িত চুলের সোনালী আভার উপর প্রতিফলিত হচ্ছে অস্তমান সূর্যের রশ্মি; সাদা তার গায়ের রঙ। চোখ দুটোতে পিঙ্গল আভা। সুডৌল হাতে আমার সবুজ বর্ডারগুলো যেন তার শোভা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। সুজাতার পরনে খদ্দরের লালপাড় শাড়ি; আঁচলটা মাঝে মাঝে এদিক-ওদিকে উড়ছে।

এমন করে সুজাতাকে আর কোন দিন দেখে নি ডেভিড। আজ হঠাৎ তার মনে হল তারই দেশের ডালিয়া কিংবা ডরোথি যেন ভারতীয় কুমারীর সাজে তারই সঙ্গে পা ফেলে চলছে।

বিস্মিত হতবাক্ ডেভিড হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে সুজাতার ডান হাত ধরে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার বিমুগ্ধ দৃষ্টি দেখে সুজাতাও হতবাক্ হয়।

সুজাতাই প্রথম কথা বলে, ডেভিড! কি হল তোমার?

ডেভিড অনুচ্চকণ্ঠে উত্তর দেয়,—ওঃ, সরি! আমি কেমন পাজল্‌ড্ হয়ে গেছলাম সুজাতা! মনে হচ্ছিল আমার দেশের ডরোথি ডালিয়ারা যদি তোমার মত হতে পারত।

ডেভিডের কথা শুনে খিল খিল হাসিতে সুজাতা যেন ভেঙ্গে পড়ে। তার পর বলে—ডরোথি কিংবা ডালিয়াকে একথা বলবার জন্যে আমি তোমার দেশে যেতে রাজী আছি ডেভিড!

এমন সময় মণীশ এসে তাদের কথায় বাধা জন্মাল। মণীশ বললে, তোমায় খুঁজে মরছি সুজাতা! আর তোমরা বেশ দিব্বি হৈ-হল্লা করে ঘুরে বেড়াচ্ছ।

সুজাতার হাসি থামে নি। সুজাতা বলে, জান মণীশদা, আমি ডেভিডের দেশে যাচ্ছি।

মণীশ বলে,—বেশ তো! নিশ্চয়ই ডেভিড তোমায় নিয়ে যাচ্ছেন।

সুজাতা উত্তর দেয়,—নিশ্চয়ই। ডেভিড রাজী না হলেও আমি নিজেই তাঁর পিছু পিছু ছুটব।

ডেভিড বলে,—পিছু পিছু ছুটতে হবে না সুজাতা। কিন্তু আমার দেশে

গেলে আমার দেশের লোক তোমাকে দেখলে বিস্মিতই হবে। সত্যি কথা বলতে কি তোমাকে ভারতীয় পোশাকে নিজের দেশের মেয়ে বলেই ভাববে।

মণীশের মধ্যে ভাবান্তর দেখা দেয়। ডেভিডের কথা যেন তার মনোজগতে আলোড়ন জাগায়। মাঝে মাঝে সর্বেশ্বরবাবুর কথাও হেঁয়ালির মত শোনাত। সুজাতা?—ভারতীয় পোশাকে ডেভিডের দেশের মেয়ে!—সংশয় জাগে মনে।

রক্তিমাভ সূর্যের স্নিগ্ধ রশ্মি পড়েছে সুজাতার চোখে-মুখে। নূতন দৃষ্টি আজ মণীশের চোখে। তবু মনটা দমে যায়। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে সুজাতা। কই? এত দিন তো এ রকম করে মণীশ ভাবে নি!

ডেভিড বলে, আমি বিস্মিত হচ্ছি মণীশ এ দেশ দেখে। তোমাদের এ দেশের বনবাদাড়, ঝোপ-ঝাপ, দিঘি, নদীর ঘাট—সবই স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। যাদের স্মৃতি এগুলো বহন করছে, তারা কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন, কোন কবি কিংবা সাহিত্যিক নন্। এ দেশের মাটিতে লেখা রয়েছে মানুষের মর্মকথা।

মণীশ বলে,—তাতে কোন লাভ হয় নি ডেভিড!

ডেভিড উত্তর দেয়,—কেন হবে না? কাব্যকাহিনী পাঠ না করেও এ দেশের মানুষ এসব স্মৃতি-ফলক থেকে মানবত্বের কাব্যকাহিনী পাঠ করে। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির দরকার হয় না; এমন কি স্কুল-কলেজের শিক্ষা না হলেও চলে।

মণীশ বলে,—তা হলে কি স্কুল-কলেজের শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই ডেভিড?

ডেভিড বলে,—আছে। কিন্তু সাধারণের পক্ষে সে শিক্ষা একেবারে অকেজো এদেশে। এদেশের লোক টেক্‌নিক্যাল এডুকেশন পেলেই আমাদের দেশকে ছাড়িয়ে যাবে। নৈতিক আদর্শের জন্য তাদের শেক্সপীয়র কিংবা মিল্টন পড়তে হবে না। এমন কি তোমাদের গীতা কিংবা উপনিষদ্ পড়ারও কোন প্রয়োজন দেখি না।

মণীশ বলে,—তোমার কথা হেঁয়ালির মতই ঠেকছে ডেভিড।

ডেভিড বলে,—তুমি যে আমার কথা বুঝতে পারছ না মণীশ, তার জন্য

আমি দুঃখিত। আচ্ছা বল দেখি, শেকৃসপীয়র, মিল্টন কিংবা তোমাদের রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যে আদর্শ বা যে কথা আছে, তা কি এই দেশের লোকসঙ্গীতের মধ্যে নেই? বৈরাগী ও বাউলদের গান আমি শুনেছি; তার মাঝে প্রচুর সম্পদ রয়েছে। তোমাদের দেশে তীর্থ ছড়ানো। এত তীর্থ কোন দেশে নেই। কলাবতীর কাহিনীর মত শত শত কাহিনী আমি শুনেছি; আত্মত্যাগ ও প্রেমের কাহিনী এ দেশের আকাশ-বাতাস ছেয়ে আছে। এদেশের মানুষের আত্মিক শিক্ষার জন্য ভিন্ন দেশে যেতে হবে না।

মণীশ বলে,—বর্তমান সভ্যতার যুগে যখন ভাবের ক্ষেত্রে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের আদান-প্রদান চলছে, তখন আমরা কি নিজেকে গুটিয়ে বসে থাকব?

ডেভিড উত্তর দেয়,—না। আমি সাধারণ মানুষের কথা বলছি মণীশ! সাধারণ মানুষের জন্য তোমাদের দেশে যে শিক্ষাধারা চলছে, তার কোন প্রয়োজন নেই। এ শুধু সময়ের অপচয়। আই থিঙ্ক ইট ইজ এ গ্রেট ব্লাণ্ডার! সর্বেশ্বর বাবুকেও আমি একথা বলেছি।

সুজাতা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল; তারা প্রায় আশ্রমের কাছে এসে গেছে। সুজাতা বললে,—ডেভিড! আমি দেখছি, এদেশে এসে তোমার যে ভাবান্তর হয়েছে, তাতে তোমার চাকরি করা সম্ভব হবে না।

ডেভিড হাসিমুখে বললে,—ঠিক বলেছ সুজাতা। কিন্তু আমি তো ঠিক্ চাকরি করতে আসি নি। এদেশকে দেখতে এসেছি। তুমি জান না এদেশে আমার বাবা জীবন কাটিয়ে গেছেন তাঁরই মুখে এদেশের কথা শুনেছি। তাই লোভ হয়েছিল; দেখছি তাতে লাভই হয়েছে। অবশ্য আমার একটা কাজও আছে, বুঝলে, একটা মিশন, একটা উদ্দেশ্যও আছে। এদেশ দেখে সে মিশনের কথা ভুলেই গেছলাম। কিন্তু তোমায় দেখে সে কথা মাঝে মাঝে মনে উঁকি-ঝুঁকি মারে।

সুজাতা জিজ্ঞাসা করে—কি সে মিশন জানতে পারি কি?

ডেভিড উত্তর দেয়—বাধা অবশ্য নেই। আর সে নিয়ে আর মাথা ঘামাবার আমার প্রয়োজনও এখন নেই। অবশ্য আমার বাবার শেষ অনুরোধ। কিন্তু আমার

মনে হয় আমার সে মিশন ব্যর্থ হবে।

মণীশ বলে,—বল না ডেভিড! দেখি আমরা কোন সাহায্য করতে পারি কি না!

ডেভিড বলে,—সময় হলে বলব মণীশ! এখন নয়। চল, সর্বেশ্বর বাবুর প্রার্থনা-সভায় আজ আমি যোগ দেব।

সুজাতা বলে,—চল, বাবাও তাই বলছিলেন।

সন্ধ্যার ছায়া নামছে। ওপারে জ্বলে উঠছে অজস্র আলো; এপারে মিট মিট করে জ্বলে উঠল প্রদীপ। শঙ্খধ্বনি শোনা যায় ঘরে ঘরে; তার সঙ্গে ওঠে উলুধ্বনি —উ-ড়্-উ-ড়্-উ-উ।

•

জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদ সুজাতার কথাবার্তায় মুগ্ধ হলেও তাঁর আসল উদ্দেশ্য তিনি ভুলে যান নি। তিনি বুঝলেন, এ সব ছেলেমেয়েদের হাতে রেখে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। চাষীদের তিনি আশ্বাস ও ভরসা দিলেন; মাঠে লাঙলও কিছু কিছু পড়তে লাগল।

কৃষ্ণপ্রসাদ বুঝলেন,—চোখ রাঙিয়ে কাজ হাঁসিল করা যাবে না। আর কল-কারখানা যতই বাড়বে, চাষ-আবাদের অসুবিধাও ততই বেড়ে যাবে। নিজের কাজ নিজের হাতে করবার দিন এগিয়ে আসছে।

প্রমাদ গণলেন কৃষ্ণপ্রসাদ!

পুরনো সমাজ ভেঙে পড়ছে; নূতন স্রোত এসেছে দেশে। এটা ভাল কি মন্দ তা বিচার করে লাভ নাই। ওই সুজাতার মধ্যেই তিনি ভবিষ্যতের মেয়েদের দেখতে পেয়েছেন; খড়ম পায়ে বিক্ষুব্ধচিত্তে বৈঠকখানার সামনের উঠোনে পায়চারি করেন কৃষ্ণপ্রসাদ। তাঁর মনে হল,—ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে যাক্ আর নাই যাক্,—নূতন স্রোতে পুরনো ভিত্ ধ্বসে পড়বে।

স্বদেশী মন্ত্র,—বন্দেমাতরম্, আল্লাহ্-আকবর!

এ মন্ত্রে শুধু বিদেশীরা দূর হবে না। এ মন্ত্রে কাঁপন ধরিয়েছে তাঁর জমিদারির ভিতে। মানুষ জাগছে, এ যে ঘুম-ভাঙানো মন্ত্র। যেন দিব্য চক্ষে দেখতে পান

কৃষ্ণপ্রসাদ—মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে অজস্র মানুষ; হাতে কাস্তে আর লাঙল নিয়ে দাঁড়িয়েছে কিষান; মজুরের মত বাঁচবার দাবি নিয়ে তারা এগিয়ে আসছে।

আজ কলকারখানায় মজুরির লোভে তারা চাষ-আবাদ ছেড়ে দিচ্ছে; জমিদারের হুকুম মানছে না; দু দিন পরে মজুরিতে ফাঁকি ধরতে পেরে কারখানার দ্বারও রোধ করে দাঁড়াবে তারা।

আপন মনে হেসে ওঠেন কৃষ্ণপ্রসাদ,—হাঃ হাঃ হাঃ!

একটা নিতান্ত বালিকা জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেল। প্রসন্ন তর্করত্নের তর্কশাস্ত্রে এ তত্ত্ব নেই; গীতা, চণ্ডী কিংবা ভাগবতে এ সত্যের সন্ধান মেলে না। কোথা থেকে এল এ স্রোত?

জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদ কদিন ধরেই ভাবছেন। কোন কূল-কিনারাই তিনি করতে পারছেন না। তবু,—তবু শেষ চেষ্টা দেখতে হবে। নিজেকে খাটো করবেন না কৃষ্ণপ্রসাদ।

হ্যাঁ, সর্বেশ্বর মাষ্টারের এই মেয়ে! এই সুজাতা এসে সামনে দাঁড়ালে সবই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। এত কথা শিখলে কোথা থেকে? কে এই সর্বেশ্বর?

মণীশের বিয়ে দিতে হবে। যজ্ঞেশ্বরের মেয়ের সঙ্গে মণীশের বিয়ে দেব আমি। মণীশ, অনাদি কবরেজের ছেলে মণীশ আমার বংশকে ডিঙিয়ে যাবে, এ আমি হতে দেব না।

খটাখট খড়মের আওয়াজ হচ্ছে—পায়চারি করছেন কৃষ্ণপ্রসাদ। হঠাৎ বলে উঠলেন,—কই, এখনও তো গোকুল এল না। না, আসবে কেন? আমার হুকুম এরা আর মানবে কেন? নিজের নাতি অজয়! ছিঃ ছিঃ! অধঃপাতে গেছে। কোথায় পড়ে থাকে কে জানে? আমার ছেলে মারা গেছে; তার এই ছেলেটা মারা গেলে আমি বাঁচতাম! জমিদারের নাতি!—জমিদারের ছেলে!

কথাগুলো একটু জোরেই উচ্চারণ করলেন কৃষ্ণপ্রসাদ। এমন সময় মণীশের গোকুলকাকা এসে হাজির হলেন। গোকুলকে দেখে কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—কি গো গোকুল ঠাকুর! কি হল বল তো?

গোকুল জবাব দেন,—কিসের কি কর্তাবাবু! কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে? যৌটক

তো মিলেই গিয়েছিল। কিন্তু—।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—আর কিন্তু কেন? অনাদি কবরেজ আমার নিজের ভায়ের মত ছিলেন। তাঁর ছেলের একটা মঙ্গলামঙ্গল আমায় দেখতে হবে তো?

গোকুল বললেন,—নিশ্চয়, নিশ্চয়! কর্তাবাবু, কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে; যখন আপনি অনুকূল, তখন আর কিন্তু কেন?

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—তা হলে তর্করত্ন আর যজ্ঞেশ্বরকে ডেকে পাঁজিপুঁথি দেখে একটা দিন স্থির করে ফেল।

গোকুল বললেন,—তার আর চিন্তা কি কর্তাবাবু! কিন্তু যজ্ঞেশ্বর এখন বেঁকে দাঁড়িয়েছে।

কৃষ্ণপ্রসাদ রাগত স্বরে বললেন,—বেঁকে দাঁড়িয়েছে? কেন?

গোকুল বললেন,—জানি নে কর্তাবাবু! এতদিন তো সাধাসাধিই করছিল। কিন্তু এখন কি যে হল বুঝতে পারছি নে।

ইতিমধ্যে প্রসন্ন তর্করত্নও এসে হাজির হলেন।

কৃষ্ণপ্রসাদ তর্করত্নকে বললেন,—আপনি কি বলতে পারেন, যজ্ঞেশ্বর রাজী হচ্ছে না কেন?

তর্করত্ন বললেন,—কি বলব বাবা! কানাঘুষো কত কি রটেছে। এ বুড়ো বয়সে আমাকেও কাশীবাসী হতে হবে। যত সব ম্লেচ্ছাচার। আর তুমিই কি না শেষকালে এই খ্রীষ্টান মেয়েটার কথায় সায় দিলে।

কৃষ্ণপ্রসাদ বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন,—আমি সায় দিয়েছি? হ্যাঁ, ভালই করেছি। এ দেশে এমন মেয়ে কটি আছে তর্করত্ন মশাই! কিন্তু এ মেয়ের সঙ্গে আপনার আমার সম্পর্ক কি? যজ্ঞেশ্বরের মেয়ের কথা বলুন।

তর্করত্ন উত্তর দেন,—ওঃ সুনন্দার কথা বলছ। যজ্ঞেশ্বরের এই একটি মাত্র মেয়ে। সে তাই একটু ভাবনায়ই পড়েছে। আজকালকার ছেলেদের মতিগতি দেখে গেরস্ত মানুষ ভয়ই পেয়ে গেছে। তার ওপর—।

কৃষ্ণপ্রসাদ বলেন,—তার ওপর কি? কি বলতে চান আপনি?

তর্করত্ন বলেন,—ওই মণীশই যত নষ্টের গোড়া। কি বলব বাবা! আমারই

সর্বনাশ হতে বসেছে।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,— কি সর্বনাশ ?

তর্করত্ন বললেন,—কুমারী মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলেই আপদ চুকে গেল। কিন্তু আমার এই বিধবা মেয়ে। কি-ই বা জানে, কি-ই বা বোঝে, তাকেও মণীশ ওই ব্যভিচারী মেয়েটার খপ্পরে তুলে দিয়েছে।

গর্জন করে ওঠেন কৃষ্ণপ্রসাদ—সাবধান তর্করত্ন কাকা! সাবধান! কে ব্যভিচারী ?

উত্তেজিত কৃষ্ণপ্রসাদের খড়মের খটাখট আঘাত পড়ল মাটির ওপর। তর্করত্ন এ রকম আশা করেন নি। কৃষ্ণপ্রসাদ কোনদিন তাঁকে অমান্য করেন নি, কিন্তু আজ একি হল? মেয়েটা নিশ্চয়ই জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে! কিন্তু উপায়ই বা কি ?

কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দেন তর্করত্ন,—তুমি বৃথা রাগ করছ বাবা! কি দুঃখে যে এ কথা বলছি, তুমি বুঝবে না। আমার যে সর্বনাশ হতে চলেছে।

গম্ভীর স্বরে কৃষ্ণপ্রসাদ বলে ওঠেন,—আপনি কাশীবাসী হোন তর্করত্ন কাকা! যদি পারেন, নিজের মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যান। কিন্তু আমার মনে হয়, পারবেন না।

তর্করত্ন বলেন,—না, বাবা! তাও বুঝি হয়ে উঠবে না। আমি কি করব বল ?

কৃষ্ণপ্রসাদ বলেন,—শুনুন তর্করত্ন কাকা! সর্বেশ্বর মাষ্টারের মেয়ে খ্রীষ্টান হোক আর হিন্দু হোক, তার দ্বারা আপনার মেয়ের কোন অনিষ্টই হবে না। এরা পরশ-পাথর জাতের মেয়ে। আমি জানি, এরা মানুষকে কুশিক্ষা দিতে পারে না। আমি বলছি,—মেয়েদের কোন ভয় নেই, ভয় শুধু ছেলেদের জন্যে। আগুনে ঝাঁপ দেবে শত শত পতঙ্গ; শুধু পুড়েই মরবে, শুধু পুড়েই মরবে তর্করত্ন কাকা!

গোকুল বলে ওঠেন,—কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে প্রসন্নদা! কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে? মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী! দেবতার দয়া না হলে কি মানুষ তাঁকে ধরতে পারে? এবার আসল কথা পাড়ুন।

তর্করত্ন বলেন,—দেখ বাবা কৃষ্ণপ্রসাদ! এ সব ব্যাপারে আমায় টেনে এন না। যজ্ঞেশ্বর রাজী হলে সব দিকই বজায় থাকে।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—আমি আর তাঁকে হুকুম দিতে পারি না তর্করত্ন কাকা! তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন; মেয়ের ভালমন্দ তিনিই ভাববেন। কিন্তু আমার মনে হয়, মণীশের সঙ্গে সুনন্দার বিয়ে হলে ভালই হবে। তাঁকে আপনি বুঝিয়ে বলুন। মণীশের মত ছেলে গাঁয়ে আর কটি আছে? এ রকম ছেলে কোথায় পাবে যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী?

গোকুল উত্তর দেন,—হ্যাঁ। যোটকও মিলেছিল, রাজযোটক। আর সুনন্দা মেয়েটিও মন্দ নয়, বেশ টানা-টানা চোখ। বুদ্ধিসুদ্ধিও শুনেছি ভাল। ছেলেবেলায় খেলাধূলাও করেছে একসঙ্গে; বেশ মানাত দুটিতে।

তর্করত্ন বললেন,—বয়সের তফাৎটা বড় কম, আর মেয়েটি বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে। আর পাত্রই বা পাবে কোথায়? কিন্তু আমার কথা শুনবে কেন বাবা?

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—বেশ, যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তীকে পাঠিয়ে দেবেন, আমিই সব ঠিক করব।

গোকুল বললেন,—তাই করুন কর্তাবাবু! আমাদের মতামত কিছুই নেই। মণীশের বিয়েটা দিলে আমার বড়দি রক্ষা পান। রাতদিন হাঁড়ি ঠেলা; সে কি সোজা কাজ? আর একটা দায়িত্বও রয়েছে।

তর্করত্ন বললেন,—হাঁ, আমরাও সোয়াস্তি পাই। কিন্তু বাবা কৃষ্ণপ্রসাদ! আমার সন্ধ্যার কি হবে?

কৃষ্ণপ্রসাদ উত্তর দেন,—তার জন্য ভাবতে হবে না তর্করত্ন কাকা! সন্ধ্যাকে সর্বেশ্বর মাষ্টারের আশ্রমে পাঠিয়ে দিন।

তর্করত্ন প্রায় হাউ মাউ করে বলে উঠলেন,—কি বলছ তুমি কৃষ্ণপ্রসাদ! মেয়েকে আমার ম্লেচ্ছ করে দেব! হিন্দুধর্ম কি লোপ পেয়ে গেছে! কাশী বৃন্দাবন আর নবদ্বীপ কি আর নেই। আর কিছু না পারি নবদ্বীপে নিয়ে গিয়ে মেয়েকে ভেকধারী বৈষ্ণবী করে দেব।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—তাই করবেন বৈ কি? ছিঃ, ছিঃ এতকাল ধরে আপনারা

সমাজের সর্বনাশই করে এসেছেন তর্করত্ন কাকা! বিধবা মেয়েকে ভেকধারী নেড়ানেড়ীর আখড়ায় জুটিয়ে দিয়ে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য বাড়াবেন, না হয় মুসলমানের ঘরে আশ্রয় নেবে—এ ছাড়া তো আপনারা কোন কিছুই ভাবতেই পারেন না।

তর্করত্ন বলেন,—উপায় আর কি আছে তুমিই বল?

কৃষ্ণপ্রসাদ উত্তর দেন,—উপায়? উপায় বলব আমি? শাস্ত্র নিয়ে বসে আছেন আপনারা? আপনাদের নির্দেশ মেনেই আসছি আমরা। আমরা শুধু হুকুম তামিল করতেই রয়েছি তর্করত্ন কাকা! শাস্ত্রের হুকুম তামিল করবার জন্যেই রাজা আর জমিদার। আজ রাজা নেই, আছে শুধু জমিদার। জমিদারের জমিদারী দাপটও যাচ্ছে, শাস্ত্র আর কেউ মানবে না। বামুন-কায়েতের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে এখন তারা, যাদের আমরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে পায়ের তলায় চেপে রেখেছি।

গোকুল বললেন,—ঠিক কথা কর্তাবাবু! মহর্ষি পরাশর বলেছেন,—সব একাকার হয়ে যাবে। কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে?

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—দেখ গোকুল ঠাকুর! তোমার এই কিং কুর্বন্তিটা এখন একটু থামাও তো। বেশ শিখেছিলে বাবা! দু ধারেই কাটে।

গোকুল উত্তর দেন,—ও কি বলছেন কর্তাবাবু! মহর্ষি পরাশরের বাক্য মিথ্যে হবার নয়। জানেন তো ত্রিকাল ঠাকুরের নাতি আমি।

কৃষ্ণপ্রসাদ বলেন,—হ্যাঁ, তোমরাই সেই ব্যাস, বাল্মিকি পরাশরের বংশ; সেই গৌরবেই এতদিন চলে আসছ। কিন্তু আর চলবে না ঠাকুর! মানুষকে আর চেপে রাখা চলবে না।

তর্করত্ন বলেন,—সমাজের শাসন আলগা হলেই বিপদ্ হবে বাবা কৃষ্ণপ্রসাদ! তোমরা যদি শক্ত না হও।

কৃষ্ণপ্রসাদ হেসে হেসে উত্তর দেন,—তা আর চলবে না কাকা! নূতন সমাজ গড়ে উঠবে। আপনি আমি সবাই ভেসে যাব।

তর্করত্ন বলেন,—কি করে তা বুঝলে বাবা?

কৃষ্ণপ্রসাদ উত্তর দেন,—বুঝেছি ওই সর্বেশ্বরকে দেখে। একা নিঃসম্বল এক

সর্বেশ্বর যদি এ অঞ্চলে এত পরিবর্তন আনতে পারে, তা হলে তার পরিণাম বুঝতে বাকি থাকে না। যুগের হাওয়া পালটে গেছে। আজ স্বদেশী আন্দোলন শুধু ইংরেজকে তাড়াবে না, পুরনো যা কিছু আছে সবই ভেঙ্গে-চুরে দেবে। মানুষের ঘুম-ভাঙানোর মন্ত্র পড়ছে সর্বেশ্বর মাষ্টার,—পাহাড়ী হিংস্র অমানুষ যারা তারাও মানুষ হয়ে উঠছে, দেখতে পাচ্ছেন না।

তর্করত্ন বললেন,—আমরা নিজেরাই নিজের সর্বনাশ করছি বাবা! বামুনের ছেলে জাত হারিয়ে নিজের জাতেরই সর্বনাশ করে। এই সব কালাপাহাড়দের জন্যই সর্বনাশ হবে। শুনেছি, সর্বেশ্বর নাকি বামুনের ছেলে ছিল।

হা হা করে হেসে উঠলেন কৃষ্ণপ্রসাদ।

ব্রাহ্মণের গলায় আর পৈতে দেখতে পাবেন না তর্করত্ন-কাকা! পৈতে ফেলে দিয়ে ব্রাহ্মণের ছেলেরাই পথ দেখিয়ে চলবে যত সব অব্রাহ্মণদের, নীচু জাতদের। অব্রাহ্মণরা পৈতে নিয়ে বলছে, আমরাও ব্রাহ্মণ, আমরাও ক্ষত্রিয়; আর ব্রাহ্মণ সন্তান বলছে,—পৈতে গলায় দিলেই বড় হওয়া যায় না, মানুষের মাঝে সত্যিকার মানুষ জাগলেই সে ব্রাহ্মণ হতে পারে।

গোকুল বললেন,—হ্যাঁ, তা একটা কথার কথা বটে। দাসীবান্দীর ছেলেরাও পুরাণে মহামুনি হয়ে রয়েছে।

তর্করত্ন বললেন,—তোমরা যাই বল কৃষ্ণপ্রসাদ! কাশীবাস ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই। এসব ম্লেচ্ছামি চোখে দেখতে পারব না।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—তাই হবে তর্করত্ন কাকা! আমরাও কি আর টিকে থাকতে পারব। হয় যেতে হবে, না হয় মাথা হেঁট করতে হবে।

তর্করত্ন বললেন,—তুমি জমিদার; তোমার ভাবনা কি বল? ছেলে নেই, মেয়ে নেই, শুধু এক নাতি।

কৃষ্ণপ্রসাদ গম্ভীর স্বরে বললেন,—হ্যাঁ, শুধু এক নাতি। বংশে বাতি দেবে এই নাতি!

কৃষ্ণপ্রসাদ আবার পায়চারি করতে লাগলেন। তাঁর কপালে কুঞ্চন দেখা গেল। তার পর বললেন,—যাক্ যজ্ঞেশ্বরকে পাঠিয়ে দেবেন। গোকুল ঠাকুর, তুমিও যাও,

মণাশের পিসীমাকে বল, কোন ভাবনা নেই।

গোকুল আর তর্করত্ন চলে গেলেন। পায়চারি করতে লাগলেন কৃষ্ণপ্রসাদ; বড় অস্থির হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁরই পিতৃপুরুষের মিছিল যেন চলেছে তাঁর সামনে। নদীতে ভেঙ্গে পড়ছে বিঘার পর বিঘা; নৌকোপূজো করেছিলেন তাঁর বাবা। নদীর ধারের সেই পূজোর ভিটেটাও গ্রাস করেছে নদী; দাঁড়িয়ে আছে সেই শিমুলগাছটা; কৃষ্ণপ্রসাদের পিতামহের নিজের হাতে লাগানো সেই শিমুল-গাছ,—চৌধুরী-বাড়ির ঘাটের নিশানা। সেও বুঝি যায়। বংশে বাতি দিতে হয়তো কেউ থাকবে না। অস্থিরভাবে পায়চারি করেন কৃষ্ণপ্রসাদ।

একই পাড়ার মেয়ে সুনন্দা। যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তীর একমাত্র কন্যা। ছিমছাম দোহারা গড়ন; গায়ের রঙ ফর্সা বলা চলে। চোখ দুটি টানাটানা। বাপমায়ের আদুরে মেয়ে; এই পাড়াগাঁয়ে লেখাপড়ার বিশেষ চর্চা করবার সুযোগ পায় নি। তবুও ছোটবেলায় কালী পণ্ডিতের পাঠশালায়ই দু-তিনখানা বইয়ের পাঠ শেষ করেছে। গলাও আছে বেশ। গান গাইতে পারে।

জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদের নাতনী মাধবী। মাধবীর কাছেই সুনন্দা গান শিখেছিল। মাধবী হার্মোনিয়ম বাজিয়ে গান করতে শিখেছিল। পাড়াগাঁয়ে হার্মোনিয়মই বা আর কজনের ছিল। শুধু জমিদার-বাড়িতেই একটা দেখছে সুনন্দা।

অবশ্য পূজোর সময় যাত্রাপার্টির আমদানি হত। জমিদার-বাড়িতে যাত্রাগান হত। যাত্রার দলেও হার্মোনিয়ম দেখেছে সুনন্দা। যাত্রার পালার দু-একটা গানও সে রপ্ত করে রেখেছে।

জমিদারের নাতনী মাধবী। সবাই বলত অপরূপ সুন্দরী; বিয়েও হয়েছিল শহরের কোন্ এক বড় উকিলের ছেলের সঙ্গে। কিন্তু মাধবী বিয়ের পর যে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল; তার পর এক বছর পর মাত্র একবার এসেছিল; সেই অপরূপ সুন্দরী মাধবীর দেহবল্লরী যেন শুকিয়ে গিয়েছিল। মাধবীর সেই গলা ও গান আর শোনে নি সুনন্দা।

কানাঘুষায় শুনেছিল,—মাধবী সুখী হয় নি। তার পর মাধবী চলে গিয়েছিল,

কিন্তু আর ফিরে আসে নি। মাধবী নাকি আত্মহত্যা করেছিল।

সেই থেকে সুনন্দার মনে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। বাবা ও মা তার বিয়ের কথাবার্তা বললে মনে মনে সে শিউরে উঠত।

সুনন্দা ভাবে, কোথায় কার ঘরে গিয়ে পড়ব! কি জানি কি অবস্থা হবে! আদুরে মেয়ে সুনন্দা, বড় অভিমানী; একটু কিছু হলেই তার চোখে জল ঝরে।

যজ্ঞেশ্বর মনে মনে ভেবে রেখেছেন,—দূরে কোথাও মেয়ের বিয়ে দেব না। কিন্তু আশে-পাশে যে সব ছেলে রয়েছে, তাদের মতিগতি দেখে ভরসাও হয় না। কিন্তু জমিদার বড় ফ্যাসাদে ফেলেছেন। একথা বললেন গৃহিণীকে।

যজ্ঞেশ্বর-গৃহিণী শোভা দেবী বলেন,—বাড়ির কাছেই সে তো ভালই, অবিশ্যি বয়সের তফাৎটা বড় কম। জমিদার আবার কি করলেন?

যজ্ঞেশ্বর বলেন,—তিনি বলছেন, এমাসেই বিয়ে দিতে হবে।

শোভা দেবী বলেন,—ভালই হবে, মণীশের মা আমাকে বেয়ান বলে কত রসিকতা করতেন। জান তো ছোটবেলায় দুটিতে কত ভাব ছিল।

শোভা দেবী মুখ টিপে হাসেন। তার পর আবার বলেন,—যাই বল না কেন? ছেলেটা ভাল। কিন্তু বাপ-মা দু জনেই গত হয়েছেন; আছে এক পিসীমা বুড়ী। মাথার ওপর কেউ নেই।

যজ্ঞেশ্বর বলেন,—আমিও তাই ভাবছি। কেউ না থাকলেও আমার এ বিষয়-আশয় রয়েছে, মেয়ে-জামাইর ভাবনা কিছুই থাকবে না। কিন্তু—।

যজ্ঞেশ্বর চুপ করে থাকেন, শোভা বলেন,—কিন্তু আবার কি?

যজ্ঞেশ্বর বলেন,—ওদিক থেকে তো তাগিদ আসছে। এমন কি জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদ পর্যন্ত উঠে পড়ে লেগেছেন।

শোভা দেবী বলেন,—দিতে আমাদের বাধা নেই। কিন্তু মণীশের মতিগতি যা দেখছি, তাতে ভরসা হয় না।

যজ্ঞেশ্বর বলেন,—হ্যাঁ, এই প্রসন্ন তর্করত্নই সেদিন চুপি চুপি আমায় বারণ করে গেছেন। কথাটা দু-তিন মাস আগেই পেড়েছেন কৃষ্ণপ্রসাদ। আমি তত গা করি নি। ভেবেছিলাম,—এটা একটা কথার কথা মাত্র। কিন্তু এখন দেখছি,

কোন উপায়ই আর নাই।

শোভা বলেন,—তর্করত্ন বুড়োর কথা ছেড়ে দাও। ধিঙ্গি বিধবা মেয়েকে লোকের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছেন। এখন আসছেন ভাঙচি দিতে। আমি বাপু এসব ভাল বুঝছি না।

যজ্ঞেশ্বর বলেন,—সন্ধ্যার কথা কি বলছ ?

শোভা দেবী বলেন,—কি বলব আমার মাথা আর মুণ্ডু! বেহায়া মেয়েটা রাতদিন মণীশের বাড়িই পড়ে থাকে। ঢং করে আবার লেখাপড়া শিখছেন। সেদিন নাকি ডোমপাড়া, মালীপাড়া ঘুরে এসেছেন ওই মাষ্টারের মেয়েটার সঙ্গে।

যজ্ঞেশ্বর বলেন,—ওঃ তাই নাকি ?

শোভা দেবী বলেন,—তোমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে কোন কিছুই দেখতে পাও না। মণীশের সঙ্গে সুনন্দার বিয়ে দিতে আমার কোন অমতই ছিল না; কিন্তু ওই সন্ধ্যাই বাদ সাধবে। শুনছি নাকি বিধবাদেরও বিয়ে হচ্ছে ভদ্রসমাজে।

যজ্ঞেশ্বর বলেন,—হবে না কেন ? সে সব শহুরে সমাজে কদাচিৎ দু-একটা হয়ে থাকে।

শোভা দেবী উত্তেজিত হয়ে বলেন,—তাই তো! ভাববার কথা। কোন দিন বা সন্ধ্যারও এমন ধারা বিয়ে-টিয়ে হয়ে যায়। তা না হলে তর্করত্ন বুড়োর এমন মাথাব্যথা কেন ?

যজ্ঞেশ্বর বলেন,—ছি, ছি, ওসব কথা মুখে আনতে নেই। গুরুজন পণ্ডিত; শাস্ত্র ছাড়া এক পা নড়েন না। তাঁর নামে এসব কথা বলা তোমার অন্যায়। আর সন্ধ্যা ?—আহা গো! সোনার প্রতিমা মেয়ে, তার কপালটা অকালে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

শোভা দেবী বলেন,—ছাই হয়ে গেল তো আমরা কি করব ? তুমিও কি চাও সন্ধ্যার বিয়ে হয়ে যাক্ ওই মণীশের সঙ্গে।

দাঁতে জিভ কাটেন যজ্ঞেশ্বর। তার পর বিচলিত স্বরে বলেন, ওকি বলছ তুমি ? এসব কথা উচ্চারণ করতে আছে ? ব্রাহ্মণের বিধবা মেয়ে। ছি ছি!

সুনন্দা পাশের ঘরে ছিল। বাবা ও মায়ের এ আলোচনা তার কানে যায়।

হ্যাঁ, তারও স্বপ্ন, তারও বাসনা গড়ে উঠেছে এই মণীশকে নিয়ে। ভাবতে গিয়ে লজ্জারুণ হয়ে ওঠে তার মুখ। সামনে বড় আরশিতে দৃষ্টি রেখে চুল বাঁধছিল সুনন্দা। উদ্ভিন্ন যৌবনের আভাস,—নিজের বুকটা নিজেই চেপে ধরে। পুলকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দেহমন। হ্যাঁ মণীশ, তার দোসর যে আর ফুলছড়ি গাঁয়ে নেই। ছোটবেলার খেলার সঙ্গী; মণীশের মায়ের সেই রসিকতার কথাও মনে পড়ে। চিবুকে এখনও মণীশের মায়ের স্পর্শ যেন লেগে রয়েছে।

সুনন্দা ভাবত,—এ কি সম্ভব?—বিয়ের ব্যাপারে কৌতূহল থাকলেও একটা আতঙ্ক ছিল তার। কোথায় কোন্ দেশে, কোন্ গাঁয়ে কার হাতে গিয়ে পড়বে? হয়তো মাধবীর মতই আত্মহত্যা করতে হবে!

হ্যাঁ মণীশ!—মনে মনে পুলকের হাসিও জাগে। ঠোঁট দুটিতে রক্তিম আভা ফুটে ওঠে সুনন্দার! নিজেই নিজের গাল দুটি বারবার ঘষে। চোখে-মুখে কি এক হাসি খেলে যায়। হ্যাঁ মণীশ! মণীশ কি তাকে চায়? কেনই বা চাইবে না? ছোটবেলার কথা কি মণীশ ভুলে গেছে?

বড্ড লাজুক ছিল মণীশ! কারও সঙ্গে বড় মিশতে চাইত না। সুনন্দাই গায়ে পড়ে তার সঙ্গে ভাব জমিয়েছিল। তবু, মণীশ কি যেন ভাবত! হাসি পায় সুনন্দার। মণীশের মা মারা গেলে বড় কষ্ট হয়েছিল সুনন্দার! আহা-হা বেচারীর মাও নেই, বাবাও নেই। আছেন বুড়ো পিসীমা, আর আধপাগলা গোকুলকাকা!

সুনন্দা ভাবে। বারবার চুলের গোছা হাতে তুলে সামনে ধরে সুনন্দা। মণীশকে তার ভালই লাগে। আবার লাল হয়ে ওঠে মুখ; মণীশকে নিয়ে একসঙ্গে সংসার করতে হবে; বছরের পর বছর এক সঙ্গে কাটাতে হবে। ভালই হবে। নিজের পাড়া ছেড়ে অপর দেশে অচেনা ঘরে যেতে হবে না। মণীশ একান্তই তার আপন হবে।

নাঃ। ওকি বলছে মা? বাবাও এ কি বলছেন? সন্ধ্যার কথা! হ্যাঁ মণীশের বাড়িতে বড্ড ঘুর ঘুর করে সন্ধ্যা। একটুও লজ্জা নেই। মণীশই বা

কেমন? হোক না দিদি! কিসের দিদি আবার? সন্ধ্যাও আবার বিশ্রী ঠাট্টা করে সুনন্দাকে।

আকাশ-পাতাল ভাবে সুনন্দা।

হ্যাঁ, সুরুচির কথা মনে পড়ে। সুরুচির সঙ্গে সুনন্দার ঝগড়া হত। সুরুচির একটু টান ছিল মণীশের দিকে। মণীশও কেমন একটু প্রশ্রয় দিত সুরুচিকে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়তে হাসিও পায়।

চলে গেছে সুরুচি। সুরুচির বিয়ে হয়ে গেছে। কত কেঁদেছিল সুরুচি। কোন্ সুদূরে দু দিনের পথ তার শ্বশুরবাড়ি। দোজবরের হাতে পড়েছে সুরুচি।

না, না। সুনন্দা তা হলে বিয়েই করবে না। আমরণ বাপ-মায়ের কাছেই থাকবে। হ্যাঁ, মণীশ নাকি কাঞ্চনগড়ে রাত কাটায়; স্বদেশী করে। সর্বেশ্বর মাষ্টারের মেয়ের সঙ্গে নাকি খুব ভাব! ছি, ছি মেয়েটা তো ভিন জাতের!

ধিঙ্গি মেয়ে! কোথাকার কে ঠিক-ঠিকানা নেই। ধব্ ধব্ করছে সারা গা। মেমসাহেবের মেয়ে যেন শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

না, না! এ হতে পারে না। ওই ধিঙ্গি মেয়ে কি মণীশকে চায়? না, না, না। উত্তেজিত হয়ে ওঠে সুনন্দা।

এমন সময় শোভা দেবী ঘরে ঢুকেন। তিনি বললেন, কি রে কার সঙ্গে কথা বলছিস।

সুনন্দা লজ্জা পায়। সে বললে,—কই, কার সঙ্গে আবার কথা বলব?

শোভা দেবী বললেন,—তোকে কত বলি আর একা একা পাড়ায় বের হবি না তা শুনিস কই?

সুনন্দা উত্তর দেয়,—না মা! কই একা তো আর বের হই না।

শোভা দেবী হেসে হেসে বললেন,—বেশ। এখন কত লোক আসবে, যাবে। বিয়ের কথা-বার্তা হচ্ছে কি না!

সুনন্দা গম্ভীর মুখে বলে,—তোমরা আমায় সুরুচির মত কোন দূর দেশে পাঠিয়ে দিতে চাও, তাই বল।

শোভা দেবী বলেন,—না রে না। তোকে দূর দেশে ঠেলে দিয়ে কি আমরা

বাঁচতে পারি। তোকে এখানে রাখবারই চেষ্টা করছি। মা মঙ্গলচণ্ডী ঘটালেই হয়।

সুনন্দা বলে,—আমি একবার সন্ধ্যাদির কাছে যাচ্ছি মা!

শোভা দেবী বলেন,—না, সন্ধ্যার কাছে যেয়ো না বাছা! ও মেয়ে ভাল নয়।

সুনন্দা বিস্মিত কণ্ঠে বলে,—ভাল নয়! কি যে বল মা!

শোভা দেবী বলেন,—এখন বুঝবি না মা! আমি বলছি, এখন তোমার এবাড়ি-ওবাড়ি ঘুরে বেড়ানো উচিত হবে না।

সুনন্দা বলে,—সন্ধ্যাদি একটা গান শিখিয়ে দেবে বলেছিল, তার কাছে না গেলে সেটা কি করে শিখব মা!

শোভা দেবী বলেন,—গান কিছু দিন বন্ধ থাক খুকী। আর শোন, মণীশের পিসীমা কিংবা গোকুলকাকা এলে একটু সামলে চলিস। তোরা তো আবার গোকুলের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করিস কি না!

সুনন্দা তার মায়ের মনের কথা জানে। তাই আর উচ্চবাচ্য কিছুই করলে না। শোভা দেবী বললেন, কি যে করিস, এখনও চুল বাঁধা হয় নি! আরশির সামনে দাঁড়িয়ে খেলা করছিস, আয় চুলটা বেঁধে দিই। কখন কে যে এসে পড়ে তার ঠিক নেই।

মা মেয়ের চুল বাঁধতে বসে পড়েন।—হ্যাঁ, চুল বটে সুনন্দার! মায়ের মন গর্বে ভরে ওঠে। এমন চোখ দুটি! এরকম সুন্দর চোখ পাড়ার কোন মেয়েরই নেই।

হাসি ফুটে ওঠে শোভা দেবীর মুখে। এমন সময় সন্ধ্যার গলা শোনা যায়,—সুনন্দা, সুনন্দা!

শোভা দেবীর মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। তিনিই উত্তর দেন, এই ঘরে বাছা!

সন্ধ্যা এসে ঘরে প্রবেশ করে।

মণীশ এই সব উদ্যোগ-আয়োজন দেখে চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার যাত্রাপথে ছেদ টেনে দেবার জন্যই যেন ষড়যন্ত্র চলছে। পিসীমাও ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদ মণীশের বিবাহের প্রধান উদ্যোগী।

সুনন্দার সঙ্গে মণীশের বিয়ে হবে। হ্যাঁ, সুনন্দা, এই সুনন্দা বড় অভিমানী মেয়ে। সুনন্দাকে ভয় করেই চলে মণীশ। ছোট বেলায় বড় উত্ত্যক্ত করত সুনন্দা। মণীশকে টেনে নিয়ে যেত মেয়েদের খেলাঘরে। লুকোচুরি খেলায় মণীশ বোকা বনে যেত। বারবার মণীশকেই চোর হতে হত। মণীশ বয়সে বড় হলেও সুনন্দা খেলাঘরে তার বিশেষ সম্মান দিত না।

"মণীশদা! এটা নিয়ে এস, এটা কর।"—এরকম করেই ফাই-ফরমাশ খাটাত সুনন্দা। দত্তদের কুলগাছে জোর করে মণীশকে তুলে দিয়ে সুনন্দা বলত, "উঠে পড়, আরও ওপরের ডালে ওঠ। ডালটায় নাড়া দাও।" ঝর্‌ঝর্‌ করে টপাটপ পাকা কুল পড়ত। কোঁচড় ভরে কুল কুড়োত সুনন্দা। তার পর হুকুম করত, "নেমে এস শীগগির। দত্তবুড়ো এদিকে আসছে।"

কুলগাছে উঠতে ভয় পেত মণীশ। প্রথম দিনের কথা আজও তার মনে পড়ে। সুনন্দা বলছে, "ওই নীচু ডালটা ধরে শীগ্‌গির উঠে পড়।" কিন্তু ডালটা নাগাল পায় না মণীশ। মণীশ বলে,—"আমি নাগাল পাচ্ছি না।" সুনন্দা বলে, "বেশ তো এই আমি হাঁটু গেড়ে বসছি, আমার কাঁধে দাঁড়িয়ে ডালটা ধরে ফেল।" ডালটায় ধরতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল মণীশ। সুনন্দার উপরই সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল; ঠোঁটটা কেটে গিয়েছিল তার। রেগে গিয়ে সুনন্দার হাত সে কামড়ে দিয়ে দাঁত ফুটিয়ে দিয়েছিল।

হাসি পায়, সে সব কথা মনে পড়লে। কতই বা তখন তার বয়স ছিল? আজও সেই দাগ সুনন্দার হাতে আছে। সেই সুনন্দাকে বিয়ে করতে হবে? ছোটবেলার সেই সুনন্দা এখন বড় হয়েছে। ক'বছর ধরেই দেখছে, সুনন্দা তাকে এড়িয়েই চলে। মণীশও সুনন্দাদের বয়সী মেয়েদের দেখলে কেমন যেন সংকোচ বোধ করে। তবু মাঝে মাঝে দেখা হয়, সুনন্দার মুখের দিকে মণীশ তেমন সহজ ভাবে তাকাতে পারে না। সেই ছোটবেলায় একদিন হেসে হেসে সুনন্দা বলেছিল,—"আমার কাঁধেই ভর করে তোমায় চলতে হবে মণীশদা।"

মণীশ ভাবে,—তা হলে সুনন্দার কথাই ঠিক হতে চলল। কিন্তু যা মেয়ে,

ওর মন যুগিয়ে চলাই ভার।

না, না, এ কি ভাবছে মণীশ। সে রাজী হতে পারে না; কি আছে তার? কেনই বা এখন বিয়ে করবে! চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই ছবি,—বিন্ধ্য পর্বত লঙ্ঘন করে চলেছেন অগস্ত্য। আর—আর দেখে—মণীশ আর সুজাতা হাত ধরাধরি করে তাঁর পিছু পিছু চলেছে। আরও, আরও অনেকে চলেছে,—অফুরন্ত মিছিল।

কোথায় সুনন্দা? এই পাড়াগাঁয়ের এক অবুঝ কিশোরী! সে তো তাদের সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারবে না! সুনন্দা আর সুজাতা,—মনে মনে তুলনা করে মণীশ। না, এ হতে পারে না। অফুরন্ত কাজ তার সামনে; বিপ্লবের যুগ, পুরাতনের উপর গড়ে তুলতে হবে নূতন প্রাসাদ। সুনন্দা অচল, সুনন্দার ঠাঁই নেই এ অভিযাত্রী-দলে।

পিসীমাকে স্পষ্টই বলে দিয়েছে মণীশ,—এ হতে পারে না। আর এত তাড়া-হুড়োই বা কেন? মণীশ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না! পিসীমা বলেছেন,—আর কতদিন তারা অপেক্ষা করবে মণীশ, তাদের মেয়ের বয়স হয়েছে।

হ্যাঁ, বয়স হয়েছে। তাদের গাঁয়ের এ-বয়সী প্রায় সব মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু মণীশ ছাড়া কি আর পাত্র নেই?—মণীশের মনে বিতর্ক ওঠে। এখনই আবার বিয়ে কি? সুনন্দার বিয়ে হোক্, কিন্তু মণীশের জন্যে তো আর আটকাচ্ছে না। কনকবাবুর তো এখনও বিয়ে হয় নি! মণীশের অনেক কাজ বাকি রয়েছে। এখন তার বিয়ে করা চলবে না।

সুজাতা হাসবে। হয়তো ডেভিড হাততালি দেবে। কনকবাবুদের সামনে সে দাঁড়াবে কি করে? ছি ছি, তার বয়সী ছেলের আবার বিয়ে? কই কলেজে তার সঙ্গে যারা পড়ে, তাদের কারও তো বিয়ে হয় নি। মনে মনে লজ্জিত হয় মণীশ। যত সব সেকেলে আইডিয়া!

সুজাতার কাছে সে কোন্ মুখে দাঁড়াবে?—মণীশ নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়ে ওঠে। হ্যাঁ সুজাতা!—সুজাতার মত মেয়ে কটাই বা আছে। সুজাতার মূর্তি চিন্তা করে অকস্মাৎ ভাবান্তর ঘটে মণীশের মনে।

সুজাতার আচরণ, তার হাবভাব, তার স্পর্শ, সেদিন সন্ধ্যায় সেই ভাবালু উচ্ছ্বাস, তার সেই ছল ছল চোখ দুটি মণীশের অন্তর্লোকে ফুটে ওঠে। সেদিনের সে আচরণের সূত্র খোঁজে মণীশ।

তবে কি সুজাতা তাকে ভালবাসে? কোন দিন তো এ ভাবে চিন্তা করে দেখে নি মণীশ। আজ হঠাৎ তার মন উতলা হয়ে উঠল। মনের মধ্যে শুধু প্রশ্ন জাগে—সুজাতা কি ভালবাসে? পুলকে মণীশের হৃদয় মন ভরে ওঠে।

আবার চিন্তা করে,—তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তা হলে এর পরিণাম কি হবে? সর্বেশ্বরের কথা ভাবতে গিয়ে মণীশের মন সংকোচে ভরে ওঠে। সর্বেশ্বর কি রাজী হবেন? আর রাজী হলেও মণীশের পিসীমা, মণীশের সমাজ কি তাকে ক্ষমা করবে? বাধা,—শত বাধা এ পথে।

আর সুজাতার কর্মচঞ্চল জীবন। সুজাতাকে গৃহবধূরূপে কল্পনা করতে কেমন বাধা বাধা ঠেকে মণীশের। সীমন্তে সিঁদুররেখা, ললাটে জ্বল জ্বল করছে সিঁদুর-বিন্দু, অর্ধাবগুণ্ঠনের মধ্যে চন্দ্রোপম মুখকান্তি, সুডৌল হাতে শাঁখা আর কঙ্কণ। গৃহলক্ষ্মীর সাজে কল্পনার চোখে সুজাতাকে দেখতে বিস্ময়ে পুলকে ভরে ওঠে মন। কিন্তু সুজাতার চরিত্রে মুক্ত বিহঙ্গীর আভাস পায় মণীশ। বড় সুন্দর এই সুজাতা।

সুজাতা কি তাকে ভালবাসে?

মণীশের মনে পড়ে সেই ভয়াবহ দিনের কথা। যেদিন রহমন দারোগার ইঙ্গিতে চেতনাহীন সুজাতার মাথা তার কোলে তুলে নিয়েছিল; সেদিন থেকে সুরু করে প্রতিটি দিনের দিনলিপি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মণীশ ধীরে ধীরে সুজাতার অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে উঠেছে। মণীশের জীবনে এসেছে পরি-বর্তন; লাজুক বিনম্র মণীশের মুখে ভাষা ফুটেছে! অপরূপা হয়ে দেখা দিয়েছে সুজাতা তার সামনে। কিন্তু কোনদিনই সুজাতাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাবার স্বপ্ন সে দেখে নি। কিন্তু আজ? বুকের ভেতরটা গুমরে ওঠে; সুনন্দার সঙ্গে মালা-বদলের সঙ্গে সঙ্গে সুজাতার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাবে মণীশ। মণীশ এ ব্যবধান কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না।

কি চায় সুজাতা? সুজাতা কি এমনি মুক্ত স্বাধীন কর্মতৎপরতার মাঝে জীবন কাটিয়ে দেবে?

না, না,—ডেভিড এসেছে। বিদেশী যুবক ডেভিড; শিক্ষায়-দীক্ষায় কিংবা যোগ্যতায় অতুলনীয় এই ডেভিড। ডেভিড কি চায়? কেন তার এই ঘনিষ্ঠতা? চিন্তা-স্রোতে ভেসে যায় মণীশ। তার চোখে-মুখে বিহ্বলতার ছায়া পড়ে। নিজের যোগ্যতার কথা ভাবে মণীশ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মণীশ নিজের পড়ার ঘরে টেবিলের সামনে বসে ভাবছে। ঘরে আলো জ্বালা হয় নি। পিসীমা পাড়ায় কার বাড়িতে বেরিয়েছেন; মণীশের বিয়ের স্বপ্ন দেখছেন তিনি।

মণীশের কোন খেয়ালই নেই; বসে বসে ভাবছে তো ভাবছেই। হঠাৎ সন্ধ্যা এসে পেছন থেকে তার কাঁধের উপর হাত রাখল। চমকে উঠল মণীশ। পেছন ফিরে আবছা অন্ধকারে সন্ধ্যার মুখখানি দেখতে পেয়ে সংকোচের সুরে বললে, এ কি সন্ধ্যাদি! তুমি যে এসময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে?

সন্ধ্যা উত্তর দেয়,—কেন? কি হয়েছে? আচ্ছা তুই এই অন্ধকারে বসে বসে কি ভাবছিস? আলোটা কি জ্বালতে নেই!

মণীশ উদাস হয়ে বলে,—অন্ধকারই ভাল সন্ধ্যাদি!

সন্ধ্যা হেসে বলে,—তোর ভাল লাগলেই যে সবার ভাল লাগবে, তা নয়। দেখি হারিকেনটা কোথায়?

সন্ধ্যা এ-দিক ও-দিক দেখে ঘরের কোণ থেকে হারিকেনটা এনে আলো জ্বালিয়ে দিল। সে আলোতে সন্ধ্যা দেখে মণীশের মুখে কালো ছায়া,—তার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যা বললে,—কি হয়েছে মণীশ?

মণীশ উত্তর দেয়,—কিছুই হয় নি।

সন্ধ্যা বলে,—আচ্ছা বল তো মণীশ! তুই কি সুজাতাকে ভালবাসিস?

মণীশ বলে,—আমি তো সবাইকে ভালবাসি সন্ধ্যাদি!

সন্ধ্যা বলে,—তা বুঝি। কিন্তু ভালবাসার মাঝেও তফাৎ আছে রে।

মণীশ বলে,—তফাৎ বুঝি না সন্ধ্যাদি! বল দেখি, তুমি কি আমাকে ভালবাস

না ?

সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে। সে সামলে নিয়ে উত্তর দেয়,—হ্যাঁ নিশ্চয়ই ভালবাসি।

মণীশ বলে,—আমিও তোমাদের সবাইকে ভালবাসি সন্ধ্যাদি!

সন্ধ্যা বলে,—পাগল! আমি এ ভালবাসার কথা বলছি না। আমার মনে হয়, সুনন্দাকে বিয়ে করতে তোর বাধা আছে।

মণীশ বলে,—কোন বাধা নেই সন্ধ্যাদি! কিন্তু আমার মন চায় না।

সন্ধ্যা বলে,—তা হলেই হল। সুনন্দাকে পেয়ে তুই সুখী হতে পারবি না।

মণীশ বলে,—কি জানি সন্ধ্যাদি! কেন যে তোমরা আমার বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছ, আমি বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয়, সুনন্দাকে ভালবাসলেও আমি তাকে সুখী করতে পারব না।

সন্ধ্যা বলে,—কেন পারবি না মণীশ ?

মণীশ বলে,—কেন পারব না—একথার উত্তর দিতে পারব না সন্ধ্যাদি! এত তাড়াতাড়ি আমি নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাই নে। এ যদি ঘটে তা হলে আমার জীবনের উপর একটা আক্রোশ থেকে যাবে। তার আগুনে আমিই পুড়ে মরব। হয়তো সুনন্দার দেহ-মনেও তার তাপ লাগবে।

সন্ধ্যা বলে,—আর কারও কথা ভাবিস মণীশ? শুধু তো নিজের দিকটাই ভাবছিস ; আর কেউ কি তোকে ভালবাসে, আর কেউ কি তোকে আপন করে নিতে চায়,—এ কথা কি কোন দিন ভেবেছিস ?

মণীশ উত্তর দেয়,—না। অপরের মনের কথা আমি কি করে জানব সন্ধ্যাদি।

সন্ধ্যার মুখেও নামে ম্লান ছায়া ; হেম-গৌরাঙ্গী সন্ধ্যার মুখের আরক্তিম আভায় যেন কালো মেঘের আভাস। ছলছল করে তার চোখ দুটি।

সন্ধ্যার মুখের দিকে তাকিয়ে মণীশ স্তম্ভিত হয়। সন্ধ্যার চোখে জল। মণীশ হকচকিয়ে বলে ওঠে,—এ কি সন্ধ্যাদি ?

সন্ধ্যা বলে,—বেশ ছিলাম মণীশ! এতদিন বেশ ছিলাম। কিন্তু হয়তো

আর পারব না রে।

মণীশ বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করে,—কি পারবে না সন্ধ্যাদি?

সন্ধ্যা বলে,—আমাদের জীবনের কি মূল্য আছে মণীশ! যাদের ভালবাসি, তাদের সুখী দেখলেই আমাদের সুখ। তোকে কি আমি সুখী দেখব না?

মণীশ উত্তর দেয়,—বল সন্ধ্যাদি! কি করলে তুমি সুখী হও?

সন্ধ্যা উত্তর দেয়,—আমাকে তুই সুখী করবি? না, সে তুই পারবি না মণীশ! সুখ ভুলে থাকার জন্যই যে আমার জীবন। সুখ ভুলে গিয়ে পুড়ে মরতে হবে। যতদিন বেঁচে থাকব, এ জ্বালা সইতে হবে। তোর কবির কবিতা আর গান আমায় বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না মণীশ!

মণীশ বলে,—এত দুঃখ করছ কেন সন্ধ্যাদি! আমি তো বলেছি, তোমার সর্বেশ্বরবাবুর আশ্রমে ট্রেনিং দিয়ে কোন কাজে লাগিয়ে দেব। তাতে শান্তি পাবে।

সন্ধ্যা হেসে জবাব দেয়,—শান্তি? বিধবার আবার শান্তি? বরং নিজের ঘরে একাদশী করে আর নিত্য হবিষ্যি করে নিজের দেহ-মনকে শুকিয়ে মারা ভাল মণীশ। বাইরের আলো আমাদের সইবে না।

মণীশ বলে,—কি বলছ সন্ধ্যাদি! কাজের চাপে দশজনের সঙ্গে মেলামেশায় মানুষ সবই ভুলে যায়।

সন্ধ্যা বলে,—কি ভুলে যায়? কি ভুলে যাব আমি? আমার কি আছে যে ভুলে যাব?

মণীশ উত্তর দেয়,—তোমায় বোঝাতে পারব না সন্ধ্যাদি! তুমি যা ভাল বোঝো কর।

সন্ধ্যা বলে,—হ্যাঁ, তাই করব। কিন্তু আজ তোর কথা শুনতে এসেছি। সত্যি কি তুই সুনন্দাকে ভালবাসিস না? ছোট বেলার কথা কি ভুলে গেছিস?

মণীশ হা হা করে হেসে উঠল,—কি ভুলে গেছি সন্ধ্যাদি! সুনন্দার সেই পাগলামির কথা কি ভুলে যেতে পারি? বাব্বা! কি মেয়ে এই সুনন্দা? আমার নাকাল করে ছাড়ত!

সন্ধ্যাও হেসে হেসে উত্তর দেয়—এখনও তার ডান হাতে তোর দাঁতের চিহ্ন রয়েছে।

মণীশ একথা শুনে যেন বিচলিত হয়ে পড়ে। সে ধীরে ধীরে বলে,—এত কথা তুমি মনে রেখেছ সন্ধ্যাদি! আমি তো কোন্ দিন তা ভুলে গেছি। সুনন্দাও হয়তো ভুলে গেছে।

সন্ধ্যা বিদ্রূপের সুরে বলে,—না, সে ভোলে নি। মেয়েরা এত সহজে ভোলে না মণীশ! আমি দেখছি সুনন্দার জীবনও ছাই হয়ে যাবে।

মণীশ বলে,—কেন? কেন সন্ধ্যাদি?

সন্ধ্যা বলে,—তোরা পুরুষ মানুষ। নিত্য নূতন কাজে অতীতকে ভুলে যাবি। দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াবি; তোদের জীবনে দাগ-কাটা বড় কঠিন মণীশ! কিন্তু আমাদের জীবনে কেউ দাগ কাটলে সে দাগ মোছে না। মুছে যাবারও কোন সুযোগ নেই। আমরা যে মেয়ে, বিশেষ করে পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে, শিক্ষাদীক্ষা পাই নি। দৈবাৎ বামুন-কায়েতের ঘরে জন্মেছি, তা না হলে আমাতে আর নবীন মাঝির মেয়েতে কি তফাৎ? তবু ওই মাঝিদের ঘরে জন্মালে এমন পুড়ে মরতে হত না। বুঝলি?

মণীশ উত্তর দেয়—বড় সমস্যায় ফেললে সন্ধ্যাদি! তুমি আমায় বড় সমস্যায় ফেললে। এর যে কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না আমি। আমাকে কেন তোমরা বেঁধে রাখতে চাও সন্ধ্যাদি? আমাকে ছন্নছাড়া হয়ে থাকতে দাও।

আবেগে কেঁপে ওঠে মণীশের কণ্ঠস্বর। সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে ছিল তার পাশে। সন্ধ্যা ধীরে ধীরে বলে,—না মণীশ! আমরা তোকে বেঁধে রাখতে চাই নে। কিন্তু তুই এগিয়ে চলবি; এই তো চাই। কিন্তু আমার মনে হয়, এ সমস্যা মিটবে না ভাই!—কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব রইল। তার পর সন্ধ্যা মণীশের দিকে তাকিয়ে বলে,—তুই পালিয়ে যা মণীশ! তুই পালিয়ে যা। কারও কথা ভাবিস নে তুই; আমাদের ভুলে যা।

হঠাৎ সন্ধ্যা দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। হতভম্ব মণীশ স্থির দৃষ্টিতে তার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মণীশ। সত্যই তার জীবনে

-নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছে। ভালবাসা?—হ্যাঁ ভালবাসা। বিপরীতমুখী দুই স্রোতের মিলন না সংঘাত? নূতন করে ভালবাসার মর্মকথা আজ মণীশের মনে আঘাত দেয়।

প্রশ্ন জাগে,—সন্ধ্যাদি তা হলে কি বলে গেল? মণীশ বুঝেছে, সন্ধ্যা কি চায়? হ্যাঁ, সত্যিই এর সমাধান নেই। পালাতে হবে।

সর্বেশ্বরের আশ্রম। প্রাক্ সন্ধ্যা; পাখির কলকাকলিতে সামনের বাগানটা মুখরিত। তারই কলরব কানে এসে পৌঁছচ্ছে। রহমান দারোগা আর সর্বেশ্বরের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে।

রহমন বলছেন,—তা হলে কি মনস্থ করলেন মাষ্টারমশাই?

সর্বেশ্বর উত্তর দিলেন,—লয়েড সাহেব আর কোন খবরই দেন নি। বিলাতে তাঁর কোন ঠিকানাও আমি জানি না। আর এত বছর হয়ে গেল, আমার মনে হয় তিনি আর বেঁচেও নাই।

রহমন বললেন,—সে তো অনেক দিনের কথা মাষ্টারমশাই!

সর্বেশ্বর বললেন,—দেখুন এ কথাটা প্রকাশ করা উচিত হবে না। আপনি আর বাতাসীমনি ছাড়া আর কেউ এ ব্যাপার জানে না।

রহমন বললেন,—ঠিক কথা বলেছেন সর্বেশ্বরবাবু! কিন্তু আমি ভাবছি, এর তো কোন কূল-কিনারা হবে না।

সর্বেশ্বর বললেন,—হ্যাঁ, আমার শরীরও ভেঙে পড়েছে। সুজাতাও বড় হয়ে উঠেছে। এমন কি করা যায়?

রহমন বললেন,—কি আবার হবে? অনেক মেয়েই আজকাল চাকুরি-বাকুরি করে স্বাধীনভাবে জীবন কাটাচ্ছে। সুজাতা না হয় তাই করবে।

সর্বেশ্বর বললেন,—আমার দিক থেকে তো একটা কর্তব্য রয়েছে রহমন সাহেব!

রহমন বললেন,—মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, দেশের কাজে নামিয়েছেন। এখন সে নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ বেছে নিতে পারবে।

সর্বেশ্বর বললেন,—সে যদি কোনদিন নিজের পরিচয় জানতে পারে, তা হলে কি আমায় ক্ষমা করবে রহমন সাহেব ?

হা হা করে হেসে উঠলেন রহমান দারোগা।

তার পর রহমন বললেন,—নিজের পরিচয় সে কি করে জানবে বলুন তো ?

সর্বেশ্বর বললেন,—তা অবশ্য না জানবারই কথা। কিন্তু আমাদের সমাজ এখনও এমন উদার হয় নি যে তার পরিচয় না জেনে তাকে গ্রহণ করবে।

রহমন হেসে হেসে উত্তর দেন,—তার পরিচয়? কেন ? সুজাতা আপনারই মেয়ে।

সর্বেশ্বর বললেন,—আমি মিথ্যা পরিচয় দিতে পারব না রহমন সাহেব ? আর আমার নিজের কিই বা পরিচয় আছে ? সমাজ তো আমাকে গ্রহণ করে নি, করবেও না।

রহমন বললেন,—আপনাদের হিন্দুধর্মটাই আমি বুঝতে পারলাম না মাষ্টারমশাই ! আপনাদের সমাজের কথা বোঝা তো আরও গোলমেলে। আপনার পরিচয় কি আপনার চৌদ্দপুরুষের খবর দিয়ে মিলবে ? আপনি নিজেই নিজের পরিচয়।

হা হা করে হেসে উঠলেন রহমন সাহেব। তার পর হেসে হেসে বললেন,— আমার সমাজ আপনাকে লুফে নেবে সর্বেশ্বরবাবু! মানুষের আবার জাত বিচার কিসের ? আমার সমাজে যে আশ্রয় নিতে চাইবে, তাকেই আশ্রয় দেবে আমার সমাজ। আর আপনার হিন্দুরা আশ্রয় দেওয়া দূরে থাক, নিজের বউ-ঝিকেও ছুতোনাতায় দূর করে দিচ্ছে।

রহমন সাহেবের কথায় সর্বেশ্বরবাবুও হেসে উঠলেন। তার পর বললেন, আপনি ঠিক কথা বলেছেন রহমান সাহেব। আমরা নিজেদের লোককে দূর করে দিচ্ছি, আর আপনারা দিচ্ছেন আশ্রয়।

রহমন সাহেব কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন,—আমার মনে হয় সর্বেশ্বরবাবু! সুজাতার জন্যে এত ভাবতে হবে না। খোদার মর্জিতে তার একটা কিনারা হয়ে যাবে!

সর্বেশ্বর বললেন,—আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না রহমন সাহেব।

রহমন বললেন,—এই ডেভিড সাহেবটাই এ সমস্যা মিটিয়ে দেবে। আমার মনে হয়, ডেভিড সুজাতাকে ভালবাসে।

সর্বেশ্বর বললেন,—এ ভালবাসার মূল্য কি রহমান সাহেব! খাঁটি ইংরেজ বাচ্চা। এদের বিশ্বাস নেই। হয়তো সুজাতার জীবনটাই ব্যর্থ হবে। মণীশ আর সুজাতার ভালবাসা তো মিথ্যা নয়, রহমন সাহেব?

রহমন বললেন, কুড়ি বছর দারোগাগিরি করেছি সর্বেশ্বরবাবু! লোকের চোখ দেখলে মনের কথা বুঝতে পারি। মণীশ তেমন ছেলে নয়। আর সুজাতাও মনে হয় নিজের পরিচয় জানলে ডেভিডের দিকেই ঝুঁকবে।

সর্বেশ্বর বললেন,—না রহমন সাহেব! আমি এখনও কিছু বুঝতে পারছি না।

রহমন বললেন,—যা হবার তা হবে, আপনি আমি কিছুই করতে পারব না।

সর্বেশ্বর বললেন,—হ্যাঁ মানুষ ভাবে এক, আর হয়ে যায় আর এক। এই তো কৃষ্ণপ্রসাদবাবুর মত লোকও শেষে কেমন পালটে গেল।

রহমন বললেন,—পালটায় নি সর্বেশ্বরবাবু! সে একটা চাল চেলেছে।

সর্বেশ্বর বললেন,—কি বললেন?

রহমন উত্তর দিলেন,—চাষীদের বশে আনবার জন্যে এ একটা চাল বৈ কি? কিন্তু আমার মনে হয় সর্বেশ্বরবাবু! কৃষ্ণপ্রসাদ আখেরে ঠকে যাবেন।

সর্বেশ্বর বললেন,—শুধু কৃষ্ণপ্রসাদবাবু কেন? আমরা সকলেই ঠকে যাব রহমন সাহেব! যাদের জন্য এত করছেন, তারা আপনাদের কথা শেষে ভুলে যাবে। এই পাহাড়ীদের কথাই ভাবুন না, টাকার লোভে এখন ডুবতে বসেছে।

রহমন বললেন,—হ্যাঁ, অনেকে পাহাড়ী বস্তী ছেড়ে দিয়ে তেলখনির কোয়ার্টারে চলে গেছে। গোল্লায় যাচ্ছে সব হারামীর বাচ্ছারা! মাতাল হয়ে হুল্লোড় করে সারারাত। মেয়েগুলো পর্যন্ত বেলেল্লাপানা করে; ছি ছি!

সর্বেশ্বর বললেন,—এখানে যখন প্রথম তেলের খনির চিমনি ওঠে, সেদিনই আমি একথা ভেবেছিলাম রহমন-সাহেব। এ অঞ্চলের লোকেরা আর যা-ই হোক, কখনও কলকারখানার মজুরির লোভে পড়ে নি। চা-বাগিচার কুলি আনতে

হয়েছে হাজার মাইল দূরের সাঁওতাল পরগণা থেকে। তাও ছলে-বলে-কৌশলে; কিন্তু আজ এক শ বছর পরে দেখছি,—এ দেশের চাষীমজুর কলকারখানার কুলী হতে ছুটে যাচ্ছে।

রহমন হেসে হেসে বললেন,—মাটির মায়া কেটে গেছে মাষ্টারমশাই! মাটি চষে আর পেট ভরে না। তাই টাকা চাই, মদ চাই।

হা-হা করে হেসে উঠলেন রহমন দারোগা।

কলকারখানা তা হলে বন্ধ করে দিতে হয় মাষ্টারমশাই! তা হলে আবার ফিরে যেতে হয় সেই বনে-জঙ্গলে। রেলগাড়ি ইস্টিমার সব ডুবিয়ে দিতে হয় এই নদীর জলে।—রহমন দারোগার কণ্ঠে হাসির সুর।

সর্বেশ্বর বললেন,—তা সম্ভব হবে না রহমন সাহেব! ইঞ্জিনের যুগ এটা। গোরুর গাড়ির যুগে কেউ ফিরে যাবে না, মাঠেও পড়বে কলের লাঙল।

রহমন হঠাৎ যেন কেমন উত্তেজিত হয়ে বলে উঠেন,—তা হলে, তা হলে এত হৈ-চৈ কেন সর্বেশ্বরবাবু? চরকা কেন? আর হাজার হাজার লোককে খেপিয়ে দিয়ে স্বরাজ-স্বরাজ করা কেন?

সর্বেশ্বর শান্তভাবে উত্তর দেন,—তারও দরকার ছিল রহমন সাহেব! আমাদের হাজার-হাজার বছরের জড়তা ভাঙ্‌বার দরকার ছিল। আমরা যে একেবারে নিজেকে ভুলে গিয়েছিলাম। প্রাণের কোন লক্ষণই যে আমাদের মধ্যে ছিল না; পোষা পাখির মতই অবস্থা ঘটেছিল আমাদের।

রহমন বললেন,—আর এখন কি হচ্ছে বলুন তো?

সর্বেশ্বর বললেন,—ঘুম যে ভেঙেছে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আরও কিছুদিন সবুর করতে হবে রহমন সাহেব। হাজার হাজার বছরের জড়তা দূর করতে সময় লাগবে।

রহমন বললেন—কিছুই হবে না। কিছুই হবে না। নেমকহারাম যত বান্দীর বাচ্ছাদের কিছুই হবে না। আমি তো দেখছি হোমরা-চোমরাদেরই বেশ সুবিধা হয়ে গেল। সেই মোহিনী উকিলের ছেলেই বড় চাকরি পেয়ে গেল।

সর্বেশ্বর বললেন,—কোন্ মোহিনী উকিল?

রহমন বললেন,—মনে নেই আপনার? সেই যে শহরের সেই মোহিনী উকিল। সেবারে যে এখানে এসে ছেলেদের খেপিয়ে দিয়েছিল।

সর্বেশ্বরের মুখে ম্লান হাসি। তিনি বললেন,—সকলেই তো আর মোহিনী উকিল নয় রহমন সাহেব! এদের মধ্যে আপনার মত লোকও রয়েছে।

রহমন উত্তেজিত হয়ে বললেন,—হ্যাঁ, রয়েছে। চোর-ডাকাত ঠেঙিয়ে এখন মাঠে মাঠে গোরু চরিয়ে বেড়াচ্ছি, আমার আর কি আছে?

রহমন দারোগার কাঁধে হাত রাখলেন সর্বেশ্বর মাষ্টার।

পাহাড়ের উপর তেলের খনির অঞ্চল।

কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে সে পাহাড়। এঁকে বেঁকে চলেছে সে পাহাড়ী পথ, এখানে ওখানে সারি সারি চিমনি। দল বেঁধে চলেছে কুলীর দল; পাহাড়ের নীচু দিয়ে চলে গেছে রেল লাইন। ছোট একটা স্টেশনও হয়েছে সেখানে।

অয়েল কোম্পানির সারি সারি কোয়ার্টার পাহাড়ের গায়ে নীচু একটা চত্বরে। বাবুদের কোয়ার্টার; তিন-চার শ বাবু আছেন সপরিবারে; কেউ কেরানী, কেউ হাজিরা বাবু, কেউ গুদাম বাবু, ছোট বড় হরেক রকমের পদবী তাঁদের।

পাহাড়ের উঁচু কয়েকটা চূড়ার উপর সাহেবদের বাংলো। পাঁচ-সাতখানি বাংলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন সারা পাহাড়টাকে শাসন করছে। কুলীদের কোয়ার্টার রয়েছে নীচে। রেল স্টেশনের ধারে পাহাড়ের নীচু অংশে ঢেউ-খেলানো টিনের সারি সারি ঘর।

স্টেশনের উত্তরে নদীর ধার ঘেঁষে বড় রাস্তাটার গায়ে বসেছে পাঁচ-সাতখানি দোকান। তার মধ্যে দু-একখানি খাবারের দোকানও রয়েছে। সকাল-বিকালে এখানে আবার হাটও বসে। দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে হয়েছে কর্মমুখর নগরীর পত্তন।

ডেভিড থাকে উপরের কোন্ এক বাংলোয়। তিন-চার দিন হয় ডেভিডের দেখা নেই। কাঞ্চনগড়ে ইদানিং প্রায় রোজই যেত ডেভিড। সুজাতার হঠাৎ খেয়াল হল—ডেভিড আসে না কেন?

নদীর অপর পারের কর্মমুখর নূতন নগরের দিকে বারবার তাকায় সুজাতা।

এক, দুই, তিন, চার, চব্বিশটা চিমনি,—চব্বিশটা পিট। পাহাড়ের উপর মানুষগুলোকেও দেখা যায়,—পিঁপড়ের মতন।

মণীশেরও আজকাল বড় পাত্তা পাওয়া যায় না। ঝড়ের মতন আসে, আবার ঝড়ের মতনই চলে যায়। মণীশ থাকলে দু জনে আজ একবার ঘুরে আসত ওই পাহাড়টায়।

নদী পার হতে হবে! ভয় কি? ঐ যে খেয়া নৌকায় পারাপার করছে অজস্র যাত্রী। এত কাছে, অথচ একটা দিনও ওপারে যাবার কৌতূহল হয় নি, বড় আশ্চর্য ঠেকে সুজাতার মনে। দু বছব যেতে না যেতে ওপারের পাহাড়ের চেহারা বদলে গেছে।

বিজলি বাতি জ্বলছে; নূতন নগর পত্তন হয়েছে। রাতদিন কেবল হুমহাম খটাখট আওয়াজ এপার থেকেও শোনা যায়। ডেভিড আছে ওখানে কোন্ এক বাংলোয়।

সুজাতা ধীরে ধীরে আশ্রমের টিলা থেকে নেমে এল। নদীর ঘাটে এসে খেয়া নৌকায় চাপল। মাঝি বলে, কোথা যাবে দিদিমনি? কেউ যে সঙ্গে নেই?

সুজাতা উত্তর দেয়,—আমি একলাই যেতে পারব। যাব ওই অয়েল কোম্পানির পাহাড়ে।

মাঝি আর কোন কথা বলে না। সহযাত্রীরা বিস্মিত হয়, এত বড় মেয়ে একা বেরিয়েছে! সুজাতার দিকে তাকিয়ে তারা আরও আশ্চর্য হয়,—নিশ্চয়ই কোন মেমসায়েবের মেয়ে। কতই না আমদানি হয়েছে এই তেলের খনির দৌলতে।

নদীর ঘাটে নৌকা ভেড়ে। চটপট নেমে পড়ে সুজাতা। কিন্তু সহযাত্রীদের কাণ্ড দেখে সে হাসি থামাতে পারে না। বড় বড় খাঁচায় ভর্তি মুর্গি, হাঁস আর পায়রা মাথায় করে নিয়ে চলেছে দু জন। তাদের এক জন নৌকা ভিড়তেই এক লাফে নেমে পড়ে; কিন্তু তার মাথা থেকে মুর্গির খাঁচাটা ছিটকে পড়ে যায়। সে তাড়াতাড়ি খাঁচাটা তুলে বলে, ইয়া আল্লা পরানডা যাইবার লাইগছে।

তার পর তার সঙ্গীকে উদ্দেশ করে বলে,—ও হাতিম ভাই নাইমছু নি ? আমার তো জান খোড়ার লাইগ্যা বাঁইচল; খোদার মরজি, না অইলে গাঙর পানি খাইতে খাইতে পরানডা যাইত।

সুজাতা অয়েল কোম্পানির রাস্তা ধরে এগিয়ে যায়। সবই অজানা, সবই অচেনা; কোথায় আছে ডেভিড ? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করে ? তবু পাহাড়ী পথে পা ফেলে সুজাতা। এক নম্বর পিটের দিকে যে বড় রাস্তাটা গেছে, সেই রাস্তা ধরে পাহাড়ে উঠতে লাগল সে। দু-চার জন বুঝি নেমে আসছে; কেউ বা উপরেও যাচ্ছে। সুজাতা নির্বাক বিস্ময়ে চারদিকে শুধু তাকায়।

পাহাড়ী পথ শেষ হয় না। এ-পথে ও-পথে ঘুরে বেড়ায় সুজাতা; মাঝে মাঝে দু-একটা পিটের কাছেও এসে দাঁড়ায়। যন্ত্র-দানবের হুঙ্কারে কানে তালা লেগে যায়। মানুষগুলোও যেন যন্ত্র হয়ে উঠেছে। কৌতূহলী চোখ পড়ে তার উপর। কিন্তু কেউ কোন কিছু জিজ্ঞাসাও করে না।

হঠাৎ দেখা হয়ে যায় কাঞ্চনগড়ের বলাই মাঝির সঙ্গে। বলাই তো অবাক; বলাই কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে,—এ কি দিদিমনি! তুমি হেথায় ই জায়গায় কেনে ?

সুজাতা হেসে উত্তর দেয়,—তোমরা তো খবর নাও না মাঝি! তোমাদের খবর নিতে এলাম।

বলাই মাঝি বলে,—হায় রে কপাল! কপালে আগুইন লাইগছে দিদিমনি! আগুইন আর নিবাইতে পাইরমু না। ঘড়ি বান্ধা কাম; সময় পাই না দিদিমনি, ছুটি অইলেই সইন্ধ্যা।

সুজাতা সহানুভূতির সুরে বলে,—তোমার সে শরীরও আর নেই মাঝি! কেন এত খাটো ?

বলাই বলে,—কেনে এত খাটি ? কি বইলমু দিদিমনি। কল আমাগোর রক্ত চুইয়া চুইয়া খাইছে। ওই যে তেল উইঠছে, ওটা আমাগোর রক্ত দিদিমনি! আমাগোর রক্ত!

সুজাতা বলে,—কি আর করবে মাঝি! যদি দেহে না সয়, একাজ ছেড়ে দাও।

বলাই মাঝি হেসে হেসে উত্তর দেয়,—পরাণডা যদ্দিন থাইকব, রেহাই নাই দিদিমনি! রাইক্ষসী পেটটা তো ভরাইতে অইব। যাই অখন, ঘন্টি পইড়া গেছে। তুমি কমনে যাইবা দিদিমনি?

সুজাতা বলে,—কোথা আর যাব? আচ্ছা, এখানে এক ডেভিড সাহেব থাকে না?

বলাই বলে,—ডেভিট? হ্যাঁ, হেই ছোকরা সাহেবটার কথা কইছ বুঝি?

সুজাতা উত্তর দেয়,—হ্যাঁ, নূতন এসেছে এখানে। তোমাদের ইঞ্জিনীয়ার।

বলাই বলে,—অখন মালুম অইছে দিদিমনি! ইঞ্জিনর সাহেব? আচ্ছা সরস মানুষ এই ডেভিট।

সুজাতা বলে,—কোথায় থাকে ডেভিড?

বলাই বলে,—ওটা একটা পাগলা সাহেব দিদিমনি! হেইদিন একনম্বর পিটের উপর থাইক্যা পইড়্যা গেছল। অখন তো হাসপাতালে আছে।

সুজাতা ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করে,—হাসপাতালে আছে? হাসপাতাল এখানে আবার কোথায়?

বলাই বলে,—ঐ যে লাল টালির বাড়িগুলান্ দিদিমনি! ওই গুলান্ই হাসপাতাল। ডেভিট সাহেব হাসপাতালে আছে।

সুজাতা প্রশ্ন করে,—তুমি তাকে দেখেছ মাঝি?

বলাই উত্তর দেয়,—আমি তখন ঐ পিটেই কাজ কইরছিলুম দিদিমনি! হঠাৎ পইড়্যা গেল সাহেব।

সুজাতা বলে,—কেমন আছে সে?

বলাই উত্তর দেয়,—আর জানি না দিদিমনি! হুইন্‌ছি হাতপা ভাইঙছে না।

সুজাতা বলে,—আমার সঙ্গে তুমি যেতে পার মাঝি?

বলাই উত্তর দেয়—কোথা দিদিমনি?

সুজাতা বলে—ওই হাসপাতালে।

বলাই বলে,—ঘন্টি পইড়্যা গেছে। হাজিরা কাইট্টা দিব দিদিমনি! ওই তো রাস্তা।

সুজাতা এগিয়ে চলে। কি ভেবে বলাইও তার পিছু পিছু চলে। বলাইকে পিছু পিছু আসতে দেখে সুজাতা বলে,—তোমার তো ঘন্টি পড়ে গেছে মাঝি, তবু এলে কেন ?

বলাই বলে,—পড়ুইক গে দিদিমনি ! তোমায় আগে সেখানটা দেখাই দিয়া আইগে।

সুজাতা আর কথা বলে না। তারা দু জনে হাসপাতালের প্রাঙ্গণে এসে পৌছাল এমন সময় হ্যাটকোট-পরা এক জন বেরিয়ে এল। বলাই তাকে দেখে একটু যেন কাঁচুমাচু হয়ে পড়ল। সে সুজাতাকে চুপি চুপি বললে—এডা এণ্টনি সাহেব দিদিমনি ! এইখানটার সুপারভাজার না কি বলে। এণ্টনিটা বড় বদমাইস সাহেব আছে।

সুজাতা বলে,—এ তো এদেশী লোক দেখছি।

বলাই বলে,—হ্যাঁগো দিদিমনি, কালাসাহেব। কিন্তুক বাবা! গোরা সাহেবগোরও এত দাপট নাই। বেটা হারামীর বাচ্ছা। আমি আসি দিদিমনি !—বলাই চলে যায়।

সুজাতা এগিয়ে গিয়ে হাসপাতালের বারান্দায় উঠল। এণ্টনি তার দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে,—কেয়া মাংতা ? হুম্ ডু ইউ ওয়াণ্ট ?

সুজাতা উত্তর দেয়,—ডেভিডকে দেখতে এসেছি।

কিছুক্ষণ বিস্মিত নেত্রে সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে এণ্টনি। তার পর বলে,—ও, ডেভিডকে দেখতে চান ?

সুজাতা উত্তর দেয়,—হ্যাঁ, ডেভিডকে আমি দেখতে এসেছি।

এণ্টনি ভাবে,—হয়তো কোন মিশনারী প্রতিষ্ঠানের মেয়ে। এদেশে এমন কত মিশনারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু এ তো বাঙালী মেয়ে নয়! এণ্টনির দৃষ্টিতে রাহুর ক্ষুধা। সুজাতা বিব্রত বোধ করে।

এণ্টনি বলে,—কিন্তু আপনি ? আপনার পরিচয় ?

সুজাতা উত্তর দেয়,—আমি সুজাতা রায়। কাছেই ঐ পাহাড়ের আশ্রমে থাকি।

এণ্টনি ওপারের পাহাড়ের দিকে একবার তাকিয়ে উত্তর দেয়,—ওঃ বুঝেছি। আসুন আমার সঙ্গে। কিন্তু বেশি কথাবার্তা বলবেন না। ছোকরা দু-তিন বছর হয়, বিলাত থেকে এসেছে। এখানে তার আর কেউ নেই। আমাদের বড় সাহেবের কাছে তার করেছি।

সুজাতা এণ্টনিকে অনুসরণ করে হাসপাতালের একটি ঘরে প্রবেশ করল। উঁচু বালিশে হেলান দিয়ে ডেভিড চোখ বুজে রয়েছে। কাছেই রয়েছে এক জন নার্স।

এণ্টনি ফিস্ ফিস্ করে নার্সকে বললে,—ইনি ডেভিডকে দেখতে এসেছেন। ডেভিড বোধ হয় এখন ঘুমোচ্ছে ?

নার্স বললে,—না, ঠিক ঘুম নয়, এরকম দু-চার মিনিট মাঝে মাঝে চোখ বুজে পড়ে থাকেন।

সুজাতার বুকটা দুরু দুরু কাঁপতে থাকে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে এণ্টনি বলে, তা হলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন মিস্ রায়। আমি আসি!

এণ্টনি চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ডেভিড চোখ খুললে,—তার বিভ্রান্ত দৃষ্টি। কাউকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

নার্স বললে,—বেশ জ্বর আছে। অবশ্য হাত-পা কিছুই জখম হয় নি। কিন্তু খুব লেগেছে। চব্বিশ ঘণ্টা বেহুঁশ ছিলেন। তার পর জ্ঞান হয়েছে। শহর থেকে সিভিল সার্জন দেখে গেছেন।

সুজাতা বলে,—ক'দিন হয়েছে ?

নার্স বলে,—এই তো চারদিন।

সুজাতা ধীরে ধীরে ডেভিডের খাটের কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত রাখল। ডেভিড চোখ তুলে তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে যেন আরামে চোখ বুজল। সুজাতা ডেভিডের চুলে ধীরে ধীরে আঙুল চালিয়ে যেতে লাগল।

নার্স তো অবাক্। নার্স বলে,—সাহেব আপনার পরিচিত না কি ?

সুজাতা বলে—হ্যাঁ।

নার্স বলে,—আপনার নাম সুজাতা ?

সুজাতা যেন চমকে ওঠে; তার পর উত্তর দেয়,—হ্যাঁ, আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?

নার্স হাসিমুখে বলে,—ডেভিড সাহেব জ্বরের ঘোরে মাঝে মাঝে আপনার নাম করেন।

সুজাতার মুখ লাল হয়ে ওঠে। নার্স বলে,—আমরা ধারণাই করতে পারি নি, এখানে ঐ নামে তাঁর পরিচিত কেউ থাকতে পারে। যাক্ আপনি নিজে থেকেই এসে গেছেন, ভালই হল। আপন জনকে কাছে পেলে রোগী অনেকটা আরাম পায়।

আপন জন? সুজাতা ভাবে—সে কি ডেভিডের আপন জন? কি ভেবেছে এই নার্স?

সুজাতা উত্তর দেয়,—না। আমাদের ওখানে মাঝে মাঝে যান কি না, তাই পরিচয় হয়ে গেছে।

নার্স বলে—বুঝেছি। সারাদিন তো ঘুরেই বেড়ান। এখানে-ওখানে বনে জঙ্গলে এগাঁয়ে ওগাঁয়ে কে না এঁকে চেনে?

কিছুক্ষণ পর ডেভিড আবার চোখ খোলে। তার পর বলে,—সুজাতা? তুমি এলে?

সুজাতা বলে,—হ্যাঁ।

ডেভিড বলে,—তোমায় কি কেউ খবর দিয়েছিল?

সুজাতা কি যেন ভেবে মিথ্যা কথা বলে,—হ্যাঁ, এখানকার এক পাহাড়ী মাঝির মুখে শুনেই এসেছি।

ডেভিড বলে,—এদেশের লোকের মন বড় উদার সুজাতা! এরা সবাইকে ভালবাসতে পারে। তবু আমার দেশ, আমার মা,—তাদের জন্যে মনটা মাঝে মাঝে উতলা হয়ে ওঠে।

নার্স বলে,—ডেভিড সাহেব! এবার ভাল হয়ে নিজের দেশটা একবার ঘুরে আসুন না।

ডেভিড সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়,—কি বল সুজাতা?

সুজাতা বলে,—বেশ তো ! নিজের দেশে তোমার এবার ফিরে যাওয়া উচিত ডেভিড।

ডেভিড আবার চোখ বোজে। সে অস্ফুট স্বরে কি বললে বোঝা গেল না। নার্স বললে,—জ্বরটা বেশিই ছিল। এখন কমের দিকে যাচ্ছে। আর এঁকে না ঘাঁটালেই ভাল।

সুজাতা ডেভিডের শিয়রে বসে রইল। নার্স বললে,—এখানে তেমন ভাল ব্যবস্থা নেই। তবু ডেভিড সাহেবের জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে।

সুজাতা বললে,—আপনি এখানে কতদিন কাজ করছেন ?

নার্স বললে,—আমি এখানে নূতন এসেছি। সদরের সরকারী হাসপাতালে আমি কাজ করি। সেখান থেকে আমাকে ডেভিড সাহেবের জন্যেই আনা হয়েছে।

সুজাতা বললে,—তা হলে ডেভিড ভাল হয়ে উঠলেই আপনি চলে যাচ্ছেন ?

নার্স বললে,—হ্যাঁ, এখানে এ জঙ্গলের মাঝখানে কথা বলার লোক নেই ; এ চারদিন আমার যা করে কাটছে আমি জানি। আর এখানকার লোকগুলোও তেমন সুবিধার নয়।

সুজাতা জিজ্ঞাসা করে,—এখানে হাসপাতাল রয়েছে ; কিন্তু কোন নার্স কি নেই ?

নার্স উত্তর দেয়,—আছে। যত সব আনাড়ী কুলীদের মেয়ে। তারা এ কাজের কি বুঝবে। এক জন অবশ্য আছেন, তিনি ওদের শিখিয়ে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু তাতে কি কাজ চলে ? ওদের সঙ্গে কথা বলতেই আমার ঘেন্না করে।

সুজাতা বলে,—আপনার খুবই কষ্ট হচ্ছে, তা বুঝতে পারছি।

নার্স বলে,—কি আর করব ? যাক্ আপনি আসায় ভালই হয়েছে, তবু কথা বলার লোক পাওয়া গেছে।

সুজাতা টেবিলে রাখা ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন চমকে উঠল। একি দুটো বাজে ! আশ্রমে কাউকে না বলে কয়ে সে এখানে চলে এসেছে। এতক্ষণে হয়তো তার খোঁজে লোক ছুটেছে। তার বাবা নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে পড়েছেন। —সুজাতার মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ।

নার্স তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে,—ভয় নেই দিদি! ডেভিড সাহেব নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবেন।

সুজাতা উত্তর দেয়,—হ্যাঁ। কিন্তু এখন আমাকে যেতে হবে।

নার্স বলে,—আপনাকে পেয়ে আমার মনের বল বেড়ে গেছে। কি যে বিশ্রী জায়গা! তা আপনার কিন্তু রোজ আসা চাই।

সুজাতা বলে,—নিশ্চয়ই আসব।

আচ্ছা আসি।—বলে সুজাতা উঠে পড়ে। ডেভিড তখন তন্দ্রাঘোরে আচ্ছন্ন। বার বার ডেভিডের মুখের দিকে তাকায় সুজাতা। ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে গেল।

বিচিত্র এই পাহাড়ী-নগরী! সুজাতা ভারাক্রান্ত মনেই পা বাড়ায়। রাস্তাগুলি দূর থেকে দেখতে অপরূপই লাগে; কোথাও বা গিরিমাটির আস্তরণ কোথাও আবার কালো কুচকুচে আবরণ,—নানা রঙের আঁকাবাঁকা পথ। পাহাড়ী অজগরের মেলা! বড় রাস্তাটা ধরে নীচের দিকে এগিয়ে চলে সুজাতা। তার চোখে পড়ল, রাস্তার অদূরে সুন্দর পরিচ্ছন্ন একটি বাংলো। বাংলোর সামনে সুন্দর বাগান। বাগানে কাজ করছে একটি মেয়ে, দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটো কুকুর।

মেয়েটি কাজ করছে, আর গান গাইছে। মাঝে মাঝে চোখও মুছছে। বড় করুণ গান—

জীবন আমার গেল রে বন্ধু
যৌবন নিল চোরে।
তোর লাইগ্যা বাঁইচ্যা আছি
(একবার) দেইখ্‌ব নয়ন ভরে॥
ওরে বন্ধু, দেইখ্‌ব নয়ন ভরে॥
উথলা যৌবন রে বন্ধু
ধইর্‌য়া রাইখ্‌তে নারি।
ডাকাইতে লুটিয়া নিল
চইক্ষে বইছে পানি রে
বন্ধু, চইক্ষে বইছে পানি॥

সুজাতা বড় রাস্তা ছেড়ে সেই বাংলোর রাস্তাটি ধরে। ধীরে ধীরে সে সেই বাংলোর বাগানে এসে দাঁড়ায়; মেয়েটির খেয়ালই নেই। কুকুর দুটি ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। মেয়েটি সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

মেয়েটির বয়স সুজাতার মতই হবে, হয়তো দু-এক বছর বেশিও হতে পারে। সুন্দর মুখশ্রী; টানাটানা চোখ। বিষণ্ণ মুখের মধ্যেও নিষ্প্রভ হাসি উঁকি-ঝুঁকি মারছে। গায়ের রঙ তামাটে হলেও তাতে দীপ্তি আছে। কানে কুণ্ডলের মত বড় বড় আংটি; হাতে গিল্টির চুড়ি।

মেয়েটিকে দেখে সুজাতার কৌতূহল বাড়ে। কেন এ দুঃখের গান? দেখে তো মনে হয়, এখানকার কোন চাষীদেরই মেয়ে। আশ্চর্য! সিঁথিতে সিঁদুর নেই। অথচ এদের তো কত অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়!

মেয়েটি সুজাতাকে দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। তার মনে হয়, কোন মেমসাহেবের মেয়ে শাড়ি পড়ে এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি কি যে বলবে ভেবে পায় না।

সুজাতাই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করে,—তুমি বুঝি এখানে কাজ কর!

মেয়েটি উত্তর দেয়,—হ্যাঁ।

সুজাতা জিজ্ঞাসা করে,—তোমার চোখ-মুখ দেখে মনে হয়, তোমার খুব কষ্টই হচ্ছে।

মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে উত্তর দেয়,—কষ্ট? কপালের লিখন, কি করে খণ্ডাব বলুন।

সুজাতা বলে, আচ্ছা এ বাংলোয় কে থাকেন? তোমার মনিবের নাম কি?

মেয়েটি এদিক ওদিক তাকিয়ে সংকোচের স্বরে বলে,—এণ্টনি সাহেব।

সুজাতা বলে,—কি কাজ কর তুমি?

মেয়েটি বলে—কি কাজ? সবই করতে হয়। সাহেব যা চায় সবই।

ছলছল হয়ে ওঠে মেয়েটির চোখ। ডান হাত তুলে সে চোখ মুছতে যায়, সুজাতার চোখে পড়ে, মেয়েটির ডান হাতের উপরদিকটায় সদ্য আঘাতের চিহ্ন। কেটে গিয়ে ফুলে উঠেছে একটা জায়গা।

সুজাতা বলে,—এ কি তুমি চোখের জল ফেলছ? তোমার কি কেউ নেই?

মেয়েটি বলে—সবাই আছে কিন্তু থাকলে কি হবে? পরের জন্তেই আমাদের দেহটা দিতে হয় মেমসাহেব। বাপ-ভাই গতর খাটায় আর আমরা মেয়েরা গতরও খাটাই আবার গতরটাও দিতে হয়।

সুজাতা তার কথা ঠিকঠিক বুঝতে পারে না। সে আবার প্রশ্ন করে—তোমার হাতখানা যে ফুলে উঠেছে; কেটে গেছে দেখছি। ওষুধ লাগাও নি?

মেয়েটি বলে,—ওষুধ? হ্যাঁ, দেব বৈ কি? কিন্তু ওষুধে এ সারবে না মেমসাহেব!

সুজাতা হাসিমুখে জবাব দেয়—তুমি আমায় মেমসাহেব ভেবেছ কেন? আমি তোমাদেরই একজন। ওইপারে ওই আশ্রমে থাকি। আমার বাবা সর্বেশ্বরবাবু।

সর্বেশ্বর মাষ্টারের মেয়ে সুজাতা!—নামটা শুনে চমকে উঠে মেয়েটি। হ্যাঁ, এই তো সেই। মণীশ যাকে পেয়ে তাদের একেবারে ভুলে গেছে। ফুলছড়ি গাঁয়ের সকলেই জানে সুজাতার নাম। তাই তো মণীশকে আর দেখতেই পায় না। বামুন-কায়েতদের অন্য ছেলেদের মত নয় মণীশ। ছোটবেলা থেকেই মণীশকে জানে সে। মণীশকেই চেয়েছিল, মনেপ্রাণে চেয়েছিল; মণীশকেই চেয়েছিল নন্দা। মণীশ ধরা দেয় নি। নন্দাদের দেহ কিংবা মনের মূল্যই বা কি? বাবুদের কাছে মাটির ভাঁড় বৈ তো নয়, কাজ ফুরিয়ে গেলেই মুখের পাত্র ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

সবই জানে নন্দা—মালাকরদের মেয়ে নন্দা। এখানেও এসেছিল বেসাতি নিয়ে; এণ্টনি জোর করে নিয়ে এসেছে তাকে। পালাবার উপায় নেই। বাপ ভাই চাকুরি করে, তাদের চাকরি যাবে। আর কি ভয়ানক লোক এই এণ্টনি; সবাই ভয় করে তাকে। পালাতে চায় নন্দা। কিন্তু উপায় নেই, দুটো কুকুর রয়েছে পাহারায়। কি কুকুর রে বাবা!

চুপ করে কত কি ভাবছে নন্দা।

সুজাতা বলে,—কি ভাবছ তুমি? যাবে আমার সঙ্গে?

মেয়েটি বলে,—না দিদিমনি! যাবার উপায় নেই। সাহেব এখনই আসবে। তুমি এখন যাও।

সুজাতা বলে,—আচ্ছা তোমার নামটি কি?

মেয়েটি বলে,—নন্দা।

সুজাতা হেসে হেসে বলে, বেশ সুন্দর নাম। বেশ নন্দা, একদিন তোমার সাহেবকে বলেই তোমায় আমি নিয়ে যাব। এখন আসি।

সুজাতা চলে যায়। নন্দার চোখে ধারা বয়। কল্পনার চোখে দেখে নন্দা, মণীশ আর সুজাতা হাত-ধরাধরি করে চলেছে। বধূরূপী সুজাতা দাঁড়িয়েছে মণীশের পাশে; উলুধ্বনি উঠছে; শাঁখ বাজছে। ফুলছড়ি আর কাঞ্চনগড়ে ধুমধাম লেগে গেছে। দূরে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে নন্দা ফেলছে চোখের জল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নন্দা।

ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন সর্বেশ্বর। তাঁর মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া! পাহাড়ী বস্তীতেও সুজাতা নেই। কেউ কিছুই বলতে পারে না। রহমন দারোগাও তার খোঁজে বেরিয়েছেন।

একটা, দুটো, তিনটে বেজে গেল। আশ্রমের বাইরে উঁচু ঢিবিটার উপর দাঁড়িয়ে সর্বেশ্বর এদিক্ ওদিকে তাকাচ্ছেন। কোথায় সুজাতা?

রহমন দারোগার মেয়ে সাকিনা, পাহাড়ী মেয়ে ময়না আর বাতাসীমনি গেছে পাহাড়ী পাড়ায়। স্কুলের দিকে কনকবাবুর কাছেও খবর গেছে। কিন্তু কোথাও সুজাতা যায় নি; কেউ তাকে দেখেছে বলেও বলছে না।

তা হলে কি হল? মণীশই বা কোথায়। দু দিন তো মণীশ আসেও নি। মণীশের কাছে হয়তো গেছে। কিন্তু এতক্ষণ? এতক্ষণ মণীশ তাকে আটকে রাখতে পারে না।

আকাশ-পাতাল ভাবেন সর্বেশ্বর মাষ্টার! নাঃ সুজাতা কোন দিন তো ওপারে যায় নি। যেতেও পারে না; ডেভিড তো চার-পাঁচ দিন আসে নি। ইংরেজ যুবক; অদৃশ্য যোগসূত্র রয়েছে দু জনের মধ্যে। বিশ্বাসও নেই।

মণীশ কাঞ্চনগড়ের দিকেই আসছিল। নদীর ধার দিয়ে সে যেইমাত্র পাহাড়ের পথে উঠতে যাবে, অমনি পেছন থেকে ডাক শোনা গেল,—মণীশদা!

এ কি! নদীর ঘাট থেকে সুজাতা ছুটতে ছুটতে আসছে। হন্তদন্ত হয়ে সুজাতা ছুটে এসে মণীশের হাত ধরে অনুনয়ের সুরে বললে,—মাপ কর মণীশদা, তোমরা হয়তো আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ। বাবা হয়তো ভাবছেন।

মণীশ সুজাতার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে জবাব দেয়,—কি বলছ? কোথা গেছলে তুমি?

সুজাতা বললে,—ওইপারে। নিশ্চয়ই বাবা খুব অস্থির হয়ে উঠেছেন।

মণীশ উত্তর দেয়,—ওই পারে? কোথায়? কেন গেছলে?

সুজাতা বললে,—জান মণীশদা! ডেভিড খুব অসুস্থ। উপর থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

মণীশ জিজ্ঞেস করে,—তোমায় বুঝি খবর দিয়েছিল?

সুজাতা উত্তর দেয়,—না। আমি অমনি গিয়েছিলাম।

মণীশ বলে,—কি আশ্চর্য। কোনদিন যে জায়গায় যাও নি, সেখানে কি করে গেলে তুমি? আর ডেভিডকেই বা পেলে কোথায়?

সুজাতা উত্তর দেয়,—তুমি আগে বল বাবা কি করছেন?

মণীশ বলে,—আমি কি করে বলব সুজাতা! তোমার বাবা কি করছেন কিংবা তুমিই বা কি করছ তা আমি কি করে বলব?

মণীশের সুরে অভিমান ও আক্রোশ ফুটে ওঠে। সুজাতা তার হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বলে,—ছিঃ ছিঃ, বল লক্ষ্মীটি! আমার সঙ্গে ঠাট্টা করো না।

মণীশ উত্তর দেয়,—আমি এইমাত্র তোমাদের ওখানে যাচ্ছি সুজাতা। আমি কিছুই জানি না।

সুজাতা বলে,—কি লজ্জার কথা! বাবা কি ভাববেন?

মণীশ বলে,—তুমি বাবাকে বলে যাও নি?

সুজাতা উত্তর দেয়,—না। কেউ জানে না।

মণীশ বলে,—তোমার সঙ্গে কে গেছল?

সুজাতা বলে,—কেউ না।

মণীশ বিস্ময়ের সুরে বলে—ধন্যি মেয়ে! এসব জায়গায় এরকম একা একা

যায়। জান না,—এখানে ওরা মানুষকে মানুষ বলে মনে করে না। মানুষকে পশুর মত খাটাচ্ছে, পশুর ক্ষুধা এদের মধ্যে। যাক, ডেভিডের সঙ্গে তোমার দেখা হল ?

সুজাতা বলে,—হ্যাঁ, দেখা হয়েছে।

মণীশ বলে,—কি হয়েছে তার ?

সুজাতা বলে,—চিমনির উপর থেকে নীচে পড়ে গিয়ে আঘাত লেগেছে। খুব জোর লেগেছে। চার দিন হয়, জ্বরে প্রায় অজ্ঞান।

সুজাতার কণ্ঠস্বরে মমতা ঝরে পড়ে; ক্লান্ত তার চোখ-মুখ। এতখানি পথ হেঁটে সুজাতা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর ডেভিড ? ডেভিডের নিঃসঙ্গ জীবনের উপরও মণীশের কেমন করুণা জন্মে।—কিন্তু সুজাতার এত উৎকণ্ঠা কেন ? ডেভিডের খোঁজে কেন ছুটে গেল সুজাতা ?

তার পর মণীশ বলে,—আহা! বেচারী বিদেশে পড়ে আছে। এখানে তো তাকে দেখবার কেউ নেই।

সুজাতা বলে,—হ্যাঁ। কিন্তু ওদের হাসপাতালে বেশ ভালভাবেই রেখেছে।

দু জনে আশ্রমের দিকে এগিয়ে চলে। দূর থেকে সর্বেশ্বর তাদের দেখতে পেয়েছেন। তিনি মণীশ আর সুজাতাকে একসঙ্গে দেখে কতকটা আশ্বস্ত হলেন। সুজাতা মণীশকে বললে,—দেখো মণীশদা! আমি কিন্তু বাবাকে বলব তুমি আমায় নিয়ে গেছলে!

মণীশ হেসে হেসে উত্তর দেয়,—আমি নিয়ে গেছলাম ? ছি ছি, অমন মিথ্যে কথা আমি বলতে পারব না।

সুজাতা মণীশের হাতে চিমটি কেটে দিয়ে বলে,—পারবে না ?

মণীশ বলে,—ছি ছি, এ কি করছ ? ছাড় ছাড়! তা হলে সত্যি কথাই বলে দেব।

সুজাতা বলে,—আমি বলব, মণীশদা আমায় জোর করে তেলের খনি দেখতে নিয়ে গেছল। বারণ শুনল না। একটা, দুটো, তিনটে বাজে তবু ফেরার নাম নেই।

মণীশ বলে,—বা রে! তোমার বাবা তা বিশ্বাস করবেন কেন ?

সুজাতা বলে,—বিশ্বাস করেন কি না দেখবে ?

মণীশ উত্তর দেয়,—ধরা পড়ার ভয় আছে। হয়তো আমার বাড়িতেও তোমার খোঁজে লোক গেছে।

সুজাতা কাঁচু-মাচু হয়ে বলে,—তা হলে কি হবে মণীশদা!

মণীশ হেসে হেসে উত্তর দেয়,—তুমিই যা হয় বলবে, আমি কোন কিছুই বলব না।

সুজাতা বলে,—ডেভিড বড় কাহিল হয়ে পড়েছে মণীশদা!

মণীশ বলে—আমিও দেখতে যাব।

সুজাতা ও মণীশ আশ্রমের টিলায় এসে উঠল। সর্বেশ্বর হাসিমুখে বললেন,—এই যে, তোমরা দুটিতে আজ বড় ভাবিয়ে তুলেছিলে। বলা নেই, কওয়া নেই, সকাল থেকে একেবারে উধাও। চারদিকে খোঁজ খোঁজ,—রহমন সাহেব তো এখনও ফেরেন নি। কোথায় গেছলে মণীশ ?

সুজাতাই উত্তর দেয়—ওইপাবে তেলের খনিটা দেখে এলাম বাবা।

সর্বেশ্বর বলেন,—তা এই অসময়ে ? নিশ্চয়ই পাগলা ডেভিড টেনে নিয়ে গেছল ?

সুজাতা বলে,—না বাবা! ডেভিডের বড় অসুখ।

সর্বেশ্বর বলেন—অসুখ! কি হয়েছে ডেভিডের ? তোমাদের বুঝি খবর দিয়েছিল ?

সুজাতা উত্তব দেয়,—না বাবা! খবরটা অন্য লোকের মুখে শুনে তোমায় সংবাদ না দিয়েই চলে গেছলাম। চিমনির উপর থেকে পড়ে গিয়ে ডেভিড অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। বড় জোর আঘাত লেগেছে।

সর্বেশ্বর উৎকণ্ঠার স্বরে বলেন—পড়ে গিয়েছিল ? কেমন আছে ডেভিড ? জখম-টখম হয় নি তো ?

সুজাতা উত্তর দেয়,—না। আজ চার দিন জ্বর। প্রায় বেহুঁশ বলা চলে।

সর্বেশ্বর বলেন,—কোথায় আছে ? কে দেখাশুনা করছে ?

সুজাতা বলে—হাসপাতালে রয়েছে। নার্স আছে, ডাক্তার আছে। খনির

সাহেবরা নাকি সদর থেকে সিভিল সার্জনকে আনিয়েছিল। ডাক্তার বলেছেন,—ভয়ের আর কারণ নেই।

সর্বেশ্বর বললেন,—তা গিয়েছিলে বেশ ভালই করেছ তোমরা! এখনও কারও খাওয়াদাওয়া হয় নি। হাত মুখ ধুয়ে শীগগির এসে পড় দু জনে।

সর্বেশ্বর ওপারের তেলের খনির চিমনির দিকে তাকিয়ে রইলেন। সুজাতা মণীশের হাত ধরে টেনে বললে,—চল।

মণীশ বললে,—আমি যে খেয়ে এসেছি!

সুজাতা বলে,—না। তুমি যদি না খাও, সব ফাঁস হয়ে যাবে।

দু জনে দু জনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। তার পর ভেতরে চলে যায়।

সুজাতা এখন প্রায়ই ডেভিডকে দেখতে যায়। মণীশকেও মাঝে মাঝে টেনে নিয়ে যায় সুজাতা।

কিন্তু মণীশের মনে অস্বস্তি জাগে। সুজাতার কোন সংকোচ নেই, ডেভিডের হাতখানি ধরে সুজাতা যখন ডেভিডকে সান্ত্বনা দেয়, মণীশ ভাবে, দু হাতের রঙে যেন কোন তফাৎ নেই। মাঝে মাঝে খিল খিল করে হেসে ওঠে সুজাতা।

এদিকে এণ্টনিকেও মণীশের ভাল লাগে না। এণ্টনি সাহেব তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে চায়। তার ব্যবহার মণীশের কাছে কেমন কেমন ঠেকে। মণীশকে এড়িয়ে সুজাতার দিকেই তার আগ্রহটা বেশি বলে মনে হয়।

কয়েক দিনের মধ্যেই ডেভিড অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল। এণ্টনি বললে,—দেখ ডেভিড! মিস্ রায় আমাদের নিতান্ত আপন জন হয়ে উঠেছেন। তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে ওঁর সম্মানের জন্য একটা পার্টি দেওয়া দরকার।

ডেভিড বলে,—পার্টি! তা অবশ্যই দিতে হবে। কিন্তু এদেশের মেয়েরা এমন সম্মানের লোভ রাখে না এণ্টনি! এদেশে জন্মেও এদেশের মেয়েদের তুমি চিনলে না!

এণ্টনি ভ্রূ কুঁচকে উত্তর দেয়,—হ্যাঁ, তবে সব দেশের মেয়েরাই এক ছাঁচে ঢালা ডেভিড! তাদের প্রাপ্য আমরা দেই না, দিতে চাই না। তাই তারা

নীরবে সহ্য করে।

ডেভিড বলে,—হ্যাঁ। মিস্ রায় আমার জন্য অনেক কষ্টই করেছেন। আর আমার বন্ধু মণীশও।

এণ্টনি বলে,—আমিই সে আয়োজন করব ডেভিড! আমাদের বন্ধু মণীশ যদি ইচ্ছে করেন, তা হলে আমি এখানে তাঁর একটা কাজেরও ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

মণীশ লজ্জিত কণ্ঠে বলে,—ও কি বলছেন! এক জন বিদেশী বন্ধুর অসুখের সময় দু-চার দিন দেখতে এসেছি, এ তো আমাদের কর্তব্য।

সুজাতা বলে,—বিদেশী মানুষ, দেশে গিয়ে যাতে এদেশের নিন্দে না করেন, সেদিকটাও আমাদের দেখতে হবে।

বলেই হো হো করে হেসে ওঠে সুজাতা। এণ্টনিও সুজাতার হাসিতে যোগ দেয়। ডেভিড বলে,—নিশ্চয়ই। দেশে ফিরে গিয়ে তোমাদের কথা ভাবতে হবে বৈ কি?

মণীশ বলে,—এবার তোমার দেশে যাওয়া উচিত ডেভিড!

ডেভিড উত্তর দেয়,—নিশ্চয়ই যাব। তোমাদের ছেড়ে গিয়ে কেমন লাগে, তা দেখতে হবে। কিন্তু বোধ হয় ছেড়ে যেতে পারব না।

ডেভিডও হাসে। নার্স এসে ঔষধ দিয়ে যায়। ডেভিড বলে,—আর ঔষধ লাগবে না।

নার্স বলে,—এখনও আপনার বিশ্রাম দরকার ডেভিড সাহেব।

সুজাতা বলে,—তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো ডেভিড। আমরা আর এপার-ওপার করতে পারব না। তোমাদের কলের চিমনিগুলোকে আমার কেমন ভয় করে।

এণ্টনি উত্তর দেয়,—ভয় পাবার কি আছে মিস্ রায়! বেশ সুন্দর জায়গা। আপনি ইচ্ছে করলে দু-চার দিন এখানে থেকে পরীক্ষা করতে পারেন।

সুজাতা বলে,—তা হলে গেছি আর কি? এই সব দুমদাম, খটাস খটাস আওয়াজ আমার সহ্য হবে না।

এণ্টনি বলে,—ওঃ, ইয়েস, আপনি অবিশ্যি আশ্রমে থাকেন। আশ্রমে যারা

থাকে তারা এর মর্ম বুঝবে না। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা মিস্ রায়। জীবনকে উপভোগ্য করতে হলে এমন নিঃসঙ্গ জীবন কাটালে চলবে না।

মণীশ বলে,—নিঃসঙ্গ জীবন ?

এণ্টনি বলে,—হ্যাঁ, হাজার বছর আগেকার আশ্রম-জীবন এ যুগে অচল। মানুষ এখন সভ্য হয়েছে, পৃথিবীকে নিঙড়ে উপভোগের সামগ্রী বের করে নিচ্ছে, পৃথিবীকে দেবতা বলে পূজো করছে না।

সুজাতা বলে,—ঠিক কথা। আমরা এসব বুঝি না এণ্টনি সাহেব। পৃথিবীর পূজো করেই আমরা শান্তি পাই।

এণ্টনি বলে,—জীবনের স্বাদ পাবেন না সে জীবনে। বনে-জঙ্গলে পশু পাখিরা রয়েছে। বলুন দেখি, তাদের জীবনের কি কোন মূল্য আছে ?

ডেভিড হঠাৎ উত্তেজিত সুরে বলে,—নিশ্চয়ই আছে এণ্টনি। তুমি বুঝবে না।

এণ্টনি বলে,—আমার বুঝেও কাজ নেই ডেভিড!

এমন সময় ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল। এণ্টনি বললে,—ওঃ, ঘণ্টা পড়ে গেছে। দু নম্বর পিটের মুখটা ভেঙ্গে গেছে; শূয়োরকি বাচ্চা কুলীগুলো সামলাতে পারছে না। যাই, দেখে আসি।

এণ্টনি চলে যায়। সুজাতা ও মণীশ অনেকক্ষণ ডেভিডের কাছে রইল।

ডেভিডকে প্রফুল্লই দেখাচ্ছে। ডেভিড ধীরে ধীরে বলে,—মণীশ! এদেশে এসেছিলাম আমি একটা মিশন নিয়ে। সে মিশন আমার পূর্ণ হয়েছে; কিন্তু তা সার্থক করতে ভয় পাচ্ছি মণীশ! তা সার্থক করতে গেলে হয়তো চরম আঘাতই পড়বে আমার উপর। তোমাদের বলেছি—আমার বাবা ছিলেন এদেশে। এদেশকে তিনিও বড় ভালবাসতেন। ছোট বেলায় তাঁরই মুখে এদেশের কথা শুনে শুনে এদেশকে ভালবাসতে শিখেছি। তার পর বাবা মারা যাবার সময় বলে গেলেন সে মিশনের কথা। এমন কোন সঙ্গতি ছিল না যে আমি হঠাৎ এদেশে আসি। সেখানেই আমার কাজ জুটত। কিন্তু বাবার কথা রাখবার জন্য ও নিজের কৌতূহল মেটাবার জন্যই আমি এদেশে এসেছি।

মণীশ বলে,—তোমার কথা বুঝতে পারছি না ডেভিড! বল না কি হয়েছে,

আমরা তোমায় সহায়তা করব!

ডেভিড বলে,—না। এ দেশকে দেখে আর তোমাদের দেখে সে কথাই আমি ভুলতে চেষ্টা করছি মণীশ! আমার মনে হয়, আমি যা চাই, তা পাব না।

মণীশ বলে,—তুমি ভাবুক কবি। তোমার কথা বোঝাই ভার। বল না কি চাও?

ডেভিড উত্তর দেয়,—বলব বৈ কি। সে সময় এখনও আসে নি।

মণীশ বলে,—বেশ, ঠিক সময়ে বলবে।

হেসে হেসে ডেভিড উত্তর দেয়,—কোন দরকার হবে না মণীশ! শূন্য হাতেই চলে যাব।

সুজাতা বলে,—ডেভিডের সকল কথায়ই হেঁয়ালি। বেশ, যা করবার করবে, এখন বিশ্রাম কর। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আমরা চলি। তোমার এণ্টনি সাহেব এসে পড়লে কিন্তু রেহাই পাব না।

ডেভিড বলে,—হ্যাঁ, তোমরা যাও, মাষ্টার মশাইকে বলবে, তাঁকে আর কষ্ট করে এখানে আসতে হবে না। দু-চার দিনের মধ্যেই আমি যেতে পারব। কোমরের ব্যথাটা নেই বললেও চলে।

সুজাতা ডেভিডের গায়ের চাদরটা ঠিক করে দিল। তার পর বলল,—আসি ডেভিড!

মণীশের চোখে যেন হঠাৎ কি পড়ে গিয়ে খচ করে উঠল। সে চোখ দুটো কচলাতে লাগল।

সুজাতা ও মণীশ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল।

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই তাদের কানে ভেসে এল একটি গানের কলি—

সখি, কেমনে ধরিব হিয়া
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমারি আঙিনা দিয়া।

হঠাৎ মণীশ বলে উঠল,—ঐ বাংলোটায় রোজই দেখি একটা মেয়ে এদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এক দিনও বাদ পড়ে না।

সুজাতা বলে,—হ্যাঁ, আমিও দেখেছি। ওটা এণ্টনি সাহেবের বাংলো। মেয়েটা ওখানে কাজ করে।

মণীশ বলে,—তা তো বুঝলাম।

সুজাতা করুণ কণ্ঠে বলে,—বড় দুঃখিনী মেয়েটা। কোন উপায় নেই, তাই এখানে পড়ে আছে।

মণীশ বলে,—তুমি এত কথা জানলে কি করে?

সুজাতা বললে,—সেই প্রথম দিন ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। সাহেব নাকি ওকে আটকে রেখেছে।

মণীশ বিস্মিত কণ্ঠে বলে,—আটকে রেখেছে? কেন, পালিয়ে আসতে পারে না?

সুজাতা বলে,—উপায় থাকলে হয়তো পালিয়ে আসত। মেয়েটি তোমাদের গাঁয়েরই মেয়ে।

মণীশ জিজ্ঞাসা করে,—ফুলছড়ি গাঁয়ের মেয়ে?

সুজাতা উত্তর দেয়,—হ্যাঁ, নাম বলেছে নন্দা।

নন্দার নাম শুনে মণীশের দেহমন যেন ঘৃণায় কেঁপে উঠল। সে বললে,—ঠিকই হয়েছে। মেয়েটা ভাল নয়।

সুজাতা জিজ্ঞাসা করে,—ভাল নয়? জান তুমি? তাকে কি ভাল করা যায় না?

মণীশ বলে—না। এরকম মেয়ের এ অবস্থাই হয় সুজাতা; তুমি বুঝবে না আর এণ্টনিও একটা শয়তান।

সুজাতা বলে,—মেয়েটি কত কাঁদলে। বল না মণীশদা, নন্দাকে কি এখান থেকে নিয়ে যাওয়া যায় না?

মণীশ উত্তর দেয়,—না সুজাতা। তুমি বুঝবে না। আমিও বুঝি না; বুঝি মানুষের মাঝেই স্বর্গ রয়েছে, নরকও রয়েছে। নরকটাকে এড়িয়ে চলার মন্ত্র আমার জানা নেই।

এমন সময় দেখা গেল, কে এক জন তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। ভদ্রলোকের

মতই তার বেশবাস। সন্ধ্যা হয়ে গেছে; দূর থেকে আগন্তুককে চেনা-চেনা মনে হতে লাগল। এ যে অজয় চৌধুরী! কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরীর নাতি! অজয় সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে মণীশ। আরও শুনেছে—সে নাকি এখানে কিসের সাপ্লাইয়ের কাজ করে।

অজয় কাছে এসে মণীশ ও সুজাতাকে দেখতে পেয়ে খুশির সুরেই বলে ওঠে,—এই যে মণীশ দেখছি; তুমিও ভিড়েছ এখানে?

মণীশ উত্তর দেয়,—এখানে এক বন্ধুকে দেখতে এসেছিলাম ভাই!

অজয় বলে,—বেশ, বেশ! সঙ্গে বান্ধবীও রয়েছেন!

মণীশ মনে মনে বিরক্ত হলেও সামলে নিয়ে উত্তর দেয়,—তা এখানে তুমি কাজ কর শুনেছি, কি কাজ?

অজয় হো হো করে হেসে বলে,—কাজ? মাল যোগান দিতে হয়, মাল। বুঝলে, সাহেবসুবো আর বাবুদের ফরমাশ মত মাল যোগান দিতে হয়।

মণীশ বলে,—বেশ, বেশ! কেমন চলছে?

অজয় বলে,—মন্দ চলছে না। মালের কি আর অভাব আছে এদেশে? কিন্তু ভায়া, জুতসই মাল যোগানোই মুশকিল। তার উপর আবার ফরমাশ আছে।

মণীশ বলে,—ঠিক কথা। তারা পয়সা দেবে, ভাল জিনিস তাদের চাই তো।

অজয় বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলে,—তা বলে আকাশের চাঁদ পেড়ে দিতে হবে? জ্বালালে ওই বেটা এণ্টনি! বেটা পয়লা নম্বরের শয়তান!

মণীশ বলে,—লোকটা বুঝি খুব কড়া।

অজয় উত্তর দেয়—কড়া? একেবারে অগ্নিশর্মা! কথায় কথায় শুয়োরকি বাচ্চা। বাবা, আমরা জমিদারের ছেলে, আমাদেরই সাতঘাটের জল খাইয়ে দিলে। বেটা এখানকার সুপারভাইজার কি না? একেবারে হর্তাকর্তা!

মণীশ বলে,—তুমিই জান। আমরা কি করে জানব বল?

অজয় বলে,—হ্যাঁ, তুমি আর কি করে জানবে? তা ভায়া, এখানে যখন যাতায়াত করছ, বিশেষ করে যখন বান্ধবীটি সঙ্গে রয়েছেন, তখন একটু সামলে-

সুমলে চলবে। কালো ফিরিঙ্গির বাচ্ছা কালা সাহেব এণ্টনি।

হি হি করে হেসে উঠল অজয়।

তার পর অজয় বলে,—বেশ আছ ভায়া! তোমার তো পোয়াবারো, এদিকেও টপাটপ, ওদিকেও টপাটপ মারছ। বেশ জুটিয়েছ কিন্তু। তবু বলছি,—সাবধান।

অজয়ের কথা মণীশ বুঝতে পারে না। মনে করে,—অজয় একেবারে অধঃপাতে গেছে। ভদ্রতা পর্যন্ত ভুলে গেছে। ছি ছি!

মণীশ বলে,—আচ্ছা ভাই! রাত হয়ে গেল। আমরা আসি।

অজয় বলে,—এস। আমি যাই, বেটা এণ্টনির তোষামোদ করতে। জরুরী হুকুম, রাত্রেই দেখা করতে হবে। জ্বালালে বেটা।

বিড় বিড় করে আপন মনে বকে চলে যায় অজয়। মণীশ ও সুজাতা দ্রুতপদে এগিয়ে চলে। সুজাতা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল; অজয়ের কথাবার্তা ও চালচলন তার ভাল লাগে নি।

সুজাতা বললে,—ছি ছি! এই তোমাদের জমিদারের নাতি!

মণীশ উত্তর দেয়,—হ্যাঁ, এরই নাম অজয়।

সুজাতা বলে,—কি কাজ করে বোঝা গেল না। কিন্তু সাহেবদের তোষামোদ করে করে মনুষ্যত্বও এদের নষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে হয়।

মণীশ বলে,—অজয়ের জন্য দুঃখ হয় সুজাতা!

সুজাতা বলে,—নন্দার জন্য আমার বেশি দুঃখ হয়। নিতান্ত অসহায় এক মেয়ে। সে কি করতে পারে? আর তোমার বন্ধু অজয় তো পুরুষ! সে যদি ইচ্ছে করে গোলামি করে, কে কি করতে পারে?

মণীশ বলে,—ঠিকই বলেছ সুজাতা! মেয়েরা বড় অসহায়।

সুজাতা বলে,—দেখতেই পাচ্ছি, আমাদের দেশে মেয়েদের কোন উপায়ই নেই। পরের গলগ্রহ হয়ে জীবন কাটাতে হয়। কিন্তু ইউরোপে তা নয়। সে দেশকে দেখতে বড় ইচ্ছা হয় মণীশদা।

মণীশ বলে,—এর কোন প্রতিকার নেই সুজাতা! ইউরোপ ঘুরে এলেই কি এ সমাজ বদলাতে পারবে?

সুজাতা বলে,—আমরা নূতন সমাজ গড়ে তুলব মণীশদা! মেয়েদের যাতে পরের গলগ্রহ হতে না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

মণীশ হেসে হেসে উত্তর দেয়,—পারবে তুমি?

সুজাতা বলে,—তোমরা সহায় হলে পারব বৈকি? ডেভিডের সঙ্গে আমি বিলেত যাব ঠিক করেছি।

মণীশের মনটা খচ করে ওঠে। সে চুপচাপ পা চালায়। দু জনে তারা নদীর ঘাটে এসে পৌঁছোয়। নৌকায় নৌকায় আলো জ্বলে উঠেছে। খেয়া নৌকায় উঠে বসল সুজাতা ও মণীশ।

দূর থেকে ভেসে আসে এক মাঝির গান—

বন্ধু, দেখাও মোরে বাত্তি।
জীবন জ্বালায় জ্বইল্যা মরি—
আন্ধাইর অইছে রাত্তি।
আন্ধাইর অইছে রাত্তিরে বন্ধু
আন্ধাইর অইছে রাত্তি॥

মণীশ বলে ওঠে,—এরকম দুঃখের গানে যে দেশের আকাশ-বাতাস ভরা, সে দেশের লোক কি আশায় সুখের সন্ধান করবে সুজাতা! ডেভিডদের দেশে নিশ্চয়ই এরকম গান কেউ গায় না।

সুজাতা উত্তর দেয় না।

কয়েক দিন ধরেই সর্বেশ্বরের শরীর ভাল যাচ্ছে না। একটু একটু জ্বর হচ্ছে। সুজাতা ও মণীশ অন্যদিনের মত সর্বেশ্বরকে তাঁর পূজার ঘরে দেখতে পায় নি। বাতাসীমনি বললে, তোমাদের বড় দেরি হয়ে গেল। বাবুর খুব জ্বর।

সুজাতা সর্বেশ্বরের ঘরে ঢুকল। সর্বেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে সুজাতা বললে, —কেমন আছ বাবা?

সর্বেশ্বর বললেন,—ভালই আছি। বিকালে জ্বর বেশিই হয়েছিল; এখন ঘাম দিয়ে জ্বরটা ছাড়ছে।

সুজাতা সর্বেশ্বরের মাথায় হাওয়া করতে লাগল। মণীশ কাছেই দাঁড়িয়ে রইল। মণীশ বললে,—ডাক্তারবাবুকে খবর দিই মাষ্টার মশাই!

সর্বেশ্বর বললেন,—না মণীশ! তেমন কিছুই হয় নি। জ্বরটা বোধ হয় ছেড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা ডেভিড কেমন আছে?

মণীশ বললে,—ভালই আছে। দু-চার দিনের মধ্যেই চলাফেরা করতে পারবে।

সর্বেশ্বর বললেন,—ভাল। ছেলেটা বড় ভাল মণীশ!

মণীশ বললে,—সাহেবদের সঙ্গে তো কোন দিন মিশি নি। দূর থেকেই দু-এক বার সাহেবদের দেখেছি। ডেভিডকে দেখে অনেক ভুল ধারণা দূর হয়ে গেছে মাষ্টার মশাই। এরা আমাদের মতই রক্তমাংসে গড়া মানুষ।

সর্বেশ্বর হেসে হেসে জবাব দেন,—হ্যাঁ এরা শুধু শাসন করে না মণীশ, এরাও মানুষ তৈরি করতে জানে। মহৎ লোক সকল দেশে সকল সমাজেই আছে মণীশ!

মণীশ উত্তর দেয়,—নিশ্চয়ই আছে। ইংরেজী সাহিত্য তাদের মনেরই পরিচয় দিচ্ছে।

সর্বেশ্বর বলেন,—আমরা শুধু কয়েকজন শাসক ইংরেজকে দেখে কিংবা পল্টনের দু-একটা গোরার আচরণ দেখে তাদের উপর ভুল ধারণা পুষে আসছি। ওদেশের কর্মশক্তির সঙ্গে এদেশের ভাবশক্তির মিলন হওয়া দরকার। বুঝলে মণীশ?

মণীশ উত্তর দেয়,—হ্যাঁ।

সর্বেশ্বর বলেন,—আমার নিজের জীবনের কথা জান মণীশ? এক মহাপ্রাণ ইংরেজই আজকের এই সর্বেশ্বরকে সৃষ্টি করে গেছেন। আমি তাঁর শিষ্য সর্বেশ্বর। আমি হিন্দু নই, মুসলমান নই, খ্রীষ্টান নই, সেই মহামানবের কাছে মনুষ্যত্বের দীক্ষাই আমি পেয়েছি।

সর্বেশ্বরের ক্লান্তমুখে দীপ্তি ফুটে ওঠে। তিনি হাত দুখানি জোড় করে যেন সেই মহাপ্রাণ ইংরেজের উদ্দেশে প্রণাম জানাতে লাগলেন। তার পর সর্বেশ্বর বললেন,—বলব মণীশ, সময় হলেই তোমাদের কাছে তাঁর কথা বলব। তাঁর কথা বলতে না পারলে আমার কর্তব্যেরই হানি হয়ে যাবে। আমার সমস্ত জীবনই ব্যর্থ হয়ে যাবে মণীশ।

সর্বেশ্বর যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেন। সুজাতা পাখার বাতাস করতে থাকে। সুজাতা বলে,—হ্যাঁ বাবা। পরে তার কথা শুনব আমরা, তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো।

সর্বেশ্বর বললেন,—মণীশ, তোমরা এখন বিশ্রাম কর গে। তোমার বাড়ি থেকে লোক এসেছিল, আমি বলে দিয়েছি তুমি আজ এখানেই থাকবে।

সুজাতা বললে,—বেশ ভালই হল। যাও মণীশদা, তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও গে।

মণীশ বললে,—আমার কিন্তু বাড়ি যাবার খুব দরকার ছিল।

সুজাতা বললে,—এত রাত্রে নাই বা গেলে! যা করবার কাল ভোরে গিয়ে করবে।

মণীশ বললে,—পিসীমা কিন্তু ক্ষেপে যাবেন সুজাতা!

সুজাতা বললে,—বাবা তো বলে পাঠিয়েছেন।

সর্বেশ্বর বললেন,—এত রাত্রে গিয়ে কাজ নেই মণীশ।

মণীশ বললে,—আচ্ছা ভোরেই যাব।

মণীশ সর্বেশ্বরের ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সুজাতা সর্বেশ্বরের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললে, দেখ বাবা! ঐ তেলের খনিতে যারা কাজ করে, তারা কিন্তু খুব সুখে নেই। আমাদের সেই বলাই মাঝিকে আমি প্রথম চিনতেই পারি নি। এদের মনে ভয় ঢুকে গেছে। আগের সে তেজও নেই। কারখানার ঘণ্টার আওয়াজে যেন তাদের মনটা কেঁপে ওঠে। শুধু মজুরির লোভে এদের হাসি-খুশি চলে গেছে বাবা!

সর্বেশ্বর মৃদু হেসে বলেন,—হ্যাঁ মা! কলকারখানা মানুষের হাসিখুশি লোপাট করে দেয়।

সুজাতা বলে,—এরা বেরিয়ে আসার সময়ই পায় না বাবা! সেই ভোর ছটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত খাটতে হয়। তার পর বেশি মজুরির লোভে কেউ কেউ আবার রাত্রেও কাজ করে।

সর্বেশ্বর বললেন,—তবু তাদের অভাব মিটবে না সুজাতা! এই মজুররা ছিল প্রকৃতির সন্তান। খোলামেলা মাঠে ঘাটে প্রাণের আনন্দে এরা কাটিয়েছে। আজ মজুরির লোভে, টাকার লোভে মাটির মায়া ছেড়ে কলের মায়াজালে পড়ে গেছে।

আর কোন পদার্থই এদের মধ্যে থাকবে না।

সুজাতা বলে,—এর কি কোন প্রতিকার নেই বাবা?

সর্বেশ্বর বলেন,—না। সভ্যতার রাক্ষসী ক্ষুধা মানুষকে পেয়ে বসেছে। এখনও তার প্রতিকারেব কথা বড় কেউ ভাবে নি।

সুজাতা বলে,—এদের জন্যে বড় কষ্ট হয় বাবা!

সর্বেশ্বর বললেন,—তোমার আমার কষ্ট হলেই বা কি; বিজ্ঞানের গতি রোধ কে করবে মা!

সর্বেশ্বরের মুখে হাসি খেলে যায়; তিনি সুজাতার মাথার উপর সস্নেহে হাত হাত রেখে বললেন,—যা মা, মণীশ হয়তো বসেই আছে।

সর্বেশ্বরের কথায় সুজাতার যেন চমক ভাঙ্গল। সে বলতে বলতে চলল, তাই তো, মণীশদা নিশ্চয়ই বসে রয়েছে। আমি এক্‌খুনি আসছি বাবা।

সুজাতা চলে যাবার পরেই রহমন দারোগা এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করলেন, কেমন আছেন মাষ্টার মশাই?

সর্বেশ্বর বললেন,—আরে রহমন সাহেব! আপনি এত রাত্রে?

রহমন বললেন,—রাত আর বেশি কোথায়? সাকিনার মুখে শুনলাম আপনার নাকি খুব জ্বর তাই ছুটে এলাম।

সর্বেশ্বর বললেন,—হ্যাঁ, কদিন থেকেই শরীরটা খারাপ যাচ্ছে। ম্যালেরিয়া-ট্যালেরিয়া হবে।

রহমন বললেন,—তা হলে হোমিওপ্যাথিতে হবে না মাষ্টার মশাই! সরকারী ডাক্তারকে ডাকতে হয়।

সর্বেশ্বর বললেন,—তা হবে সাহেব, কুইনাইন খেলেই সব সেরে যাবে।

রহমন বললেন,—না। আপনার শরীরটাও কদিন ধরে দেখছি বেশ ভেঙ্গে পড়েছে। আচ্ছা আপনার বয়স কত হল মাষ্টার মশাই!

সর্বেশ্বর হেসে হেসে উত্তর দিলেন—বয়স? সে তো একদম ভুলে গেছি রহমন সাহেব! কিন্তু আমার মনে হয়, বয়স যা-ই হোক্ না কেন, শরীরটা বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

রহমন বললেন,—কিছুদিন বিশ্রাম নিন মাষ্টার মশাই! কেবল কাজ আর কাজ!

সর্বেশ্বর হাসিমুখে বলেন,—না। এবার বিশ্রামই করব।

রহমন বললেন,—আর একটা কথা। আমার বেটি সুজাতা গেল কোথা? তাকে আর এ রকম ওপারের খনিতে পাঠাবেন না মাষ্টার মশাই!

সর্বেশ্বর বললেন,—কেন, কি হয়েছে?

রহমন বললেন,—যত সব হন্সে কুকুরের আড্ডা মাষ্টার মশাই! বউ-বেটির ইজ্জৎ সেখানে থাকে না।

সর্বেশ্বর বলেন,—না। সেরকম কোন কিছু ঘটে নি।

রহমন বললেন,—ঘটতে আর কতক্ষণ। আমি জানি মাষ্টার মশাই, ওই কৃষ্ণপ্রসাদের নাতি অজয়টা সেখানে কি কাজ করে, সবই জানি।

সর্বেশ্বর বললেন,—কি কাজ করে?

রহমন বললেন,—কৃষ্ণপ্রসাদ ভাবছেন, তাঁর প্রজারা মজুরির লোভে চলে যাচ্ছে, তা নয়। আসলে লোভ দেখাচ্ছে ওই নাতিটা। মজুরির লোভ দেখিয়ে চাষীদের খনির কাজে লাগাচ্ছে। আর,—আর কি বলব মাষ্টার মশাই! হারামজাদাটা মেয়েদেরও ইজ্জৎ মারছে।

সর্বেশ্বর বললেন,—থাক। ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কই বা কি?

রহমন বললেন,—অজয় এখন দেখছি কাঞ্চনগড়েও ঘুরঘুর করছে। ওর মতলব ভাল নয় মাষ্টার মশাই!

সর্বেশ্বর হেসে হেসে উত্তর দেন,—আপনি তো রয়েছেন।

রহমন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন—হ্যাঁ আমি রয়েছি। কিন্তু সুজাতাকে আর একা একা ওখানে পাঠাবেন না।

সর্বেশ্বর উত্তর দেন,—না। আর ডেভিড তো প্রায় সেরেই উঠেছে। মণীশ সুজাতার সঙ্গেই যায়।

রহমন বললেন,—সেই ভাল। কিন্তু সন্ধ্যার পর যেন ওপারে না থাকে। যাক আপনি বিশ্রাম করুন মাষ্টার মশাই! আমি এখন আসি।

রহমন দারোগা চলে গেলেন। রহমন দারোগার কথা সর্বেশ্বরকে কিছু শঙ্কাকুলই করেছিল, তিনি বলে উঠলেন—তাই তো সুজাতা বড় হয়ে উঠেছে।

সত্যিই অজয়কে কাঞ্চনগড়ে এখন প্রায়ই দেখা যায়। মণীশ সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হে, এখানে আবার কি মতলবে! অজয় উত্তর দিয়েছিল সাহেব-সুবোর মন যুগিয়ে চলতে হয় ভাই! খাঁটি জিনিস চাই। কাঞ্চনগড়ের বাজারে অনেক টাটকা মাল ওঠে। আমাদের ওই খনির হাটটা তো ঠকের বাজার হয়ে উঠেছে। খাঁটি জিনিস পাওয়া ভার।

মণীশ বলে—তোমায় বুঝি সাহেবদের বাজারও করতে হয়?

অজয় বলে,—চাকরি রাখতে গেলে সবই করতে হয় মণীশ! তুই বুঝবি কি? হ্যাঁ, একটা কথা মনে পড়ে গেল, তুই এণ্টনি সাহেবকে চিনিস তো?

মণীশ উত্তর দেয়,—এণ্টনি?

অজয় বলে—হ্যাঁ। সেই কালাসাহেব এণ্টনি, আমাদের সুপারভাইজার।

মণীশ বলে—হ্যাঁ, দু-এক দিন আলাপ হয়েছে বৈ কি!

অজয় বলে—তোর কত সুখ্যাতি করে। বলছিল কি না তুই যদি চাকরি নিতে চাস, ভাল চাকরি দেবে।

মণীশ বলে—চাকরি?

অজয় বলে—হ্যাঁ ভাল চাকরি। এণ্টনি সাহেবই এখানকার হর্তাকর্তা। বড় সাহেব ওঁরই কথায় ওঠে আর বসে। তুই লেখাপড়া জানিস, আমার মত তো দু-এক ক্লাসের বিদ্যে নয়, তুই বড় চাকরিই পাবি।

মণীশ বলে—না ভাই! চাকরি আমি এখন করব না।

অজয় হেসে হেসে বলে—তুই কি বোকা রে! তোকে সেধে চাকরি দিচ্ছে, আর তুই নিবি না? আচ্ছা, তোর সেই বান্ধবী কোথা?

মণীশ বলে—বান্ধবী?

অজয় বলে—হ্যাঁ, সেই সুজাতা। চাকরি নিলে বেশ থাকতিস্ দু জনে। আবার ডেভিড সাহেবের ঝোঁক আছে তোর বান্ধবীর দিকে।

মণীশ বলে—কি বলছ তুমি? ওকি কথা?

বিশ্রী ধরনের হাসি অজয়ের মুখে। সে বলে ওঠে,—কি কথা আবার? খুব মানাবে রে! কিন্তু বাবা, শেষে ডেভিডটাই মেরে দেয় কি না ভাবছি। খাঁটি ইংরেজের বাচ্ছা; তুই পারবি কেন? কিন্তু এণ্টনি তোর দিকে থাকলে কেউ সাহস করবে না।

মণীশ বলে—দেখ অজয়! আর যাই কর। আমাকে চাকরির লোভ দেখাতে এস না।

অজয় বলে,—বেশ, তুই যা ভাল বুঝিস কর। একই গাঁয়ের ছেলে এপিঠ আর ওপিঠ। উপকার করতে গেলাম কি না?

মণীশ বলে,—তোমার এ উপকারে আমার দরকার নেই অজয়! তুমি যে এত অধঃপাতে যাবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি।

অজয় বিস্ময়ের স্বরে উত্তর দেয়,—অধঃপাতে?

মণীশ বলে—হ্যাঁ, তোমার বাপ-ঠাকুর্দার মানসম্মান তুমিই ডুবিয়ে দিলে।

অজয় বলে,—আমিই ডুবিয়ে দিলাম? ঠাকুর্দা বুড়ো তো আমার কথাই শুনবে না। জমি আর জমিদারি নিয়ে কি আর চলবে? ওই সরসপুরের পাহাড়টা সাহেবদের ইজারা দিলে এখনই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেবে।

মণীশ বলে,—এসব কথা আমায় বলে লাভ কি অজয়! তোমার ঠাকুর্দাকে বল গে। কিন্তু তুমি যে পথে চলছ, তাতে বিপদ আছে। তুমি লোকের সর্বনাশ করছ, তার শাস্তি তুমি পাবে।

অজয় উত্তর দেয়—আমি লোকের সর্বনাশ করছি? সব বেটা আমার জন্যেই বেঁচে গেল। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাচ্ছে, সে টাকায় কি আমি ভাগ বসাচ্ছি?

মণীশ বলে,—তুমি মেয়েদের পর্যন্ত ফাঁদে ফেলছ অজয়!

অজয় উত্তর দেয়,—হ্যাঁ, কিন্তু যারা সে ফাঁদে পড়ছে, তারা তো ফাঁদেই পড়তে চায় মণীশ! ছ্যা, এদের আবার ইজ্জৎ।

মণীশ বলে—সবারই ইজ্জৎ আছে অজয়! ইজ্জৎটা শুধু ভদ্রলোকদের একচেটে নয়। ·হুজে কুকুরদের খাদ্য যোগাও তুমি। ছি ছি!

অজয় বলে,—তুই দেখছি বেশ লম্বা লম্বা কথা শিখে গেছিস মণীশ! এত ফর-ফরানি ভাল নয়। আমিও বলছি তুই বিপদে পড়বি; তোর এ বড়াই থাকবে না।

মণীশ বলে—তার জন্যে দুঃখ নেই অজয়! দুঃখ হয় শুধু তোমার কথা শুনে।

অজয় উত্তর দেয়—দ্যাখ্ মণীশ! যত সব বাজে কথা বলছিস। এখন যা, বুঝে-সুঝে আমায় বলবি। তুই আমায় গালাগাল দিলেও মনে রাখিস তোর উপ-কার করতে পারলে আমি খুশীই হব।

অজয় অন্য দিকে চলে গেল। মণীশের মন হয়ে উঠল ভারাক্রান্ত। এরই মধ্যে কানাঘুষোয় অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। এতদিন এ বিষয়ে কিছুই ভাবে নি মণীশ। সুজাতাকে কিছু বলতে তার মন চায় না। আর ডেভিড?—না, সুজাতার এরকম ডেভিডকে দেখতে যাওয়া আর ভাল দেখায় না। কিন্তু সুজাতা শোনে কই? বিদেশী লোক, তার সঙ্গে সম্পর্কই বা কি? ডেভিড যেন মণীশের মনোজগতে কি একটা হেঁয়ালির সৃষ্টি করেছে। সুজাতাকেও বোঝা ভার। সুনন্দার কথাও ভাবে মণীশ। মণীশের বিয়েতে বাধা পড়ে গেছে। সুনন্দার টাইফয়েড হয়েছে।

এণ্টনি সাহেব অজয়কে ধমকায়,—ড্যাম বাঙালী আদমী সব। তুমি কোন কিনারা করতে পারলে না।

অজয় বলে,—বড় শক্ত ঠাঁই সাহেব। ছোকরা চাকরি নিতে একদম রাজী নয়।

এণ্টনি বলে,—ড্যাম শূয়ারকি বাচ্ছা! আচ্ছা, ওই সর্বেশ্বরকে চাকরি দিতে পারি।

অজয় বলে,—সর্বেশ্বর বুড়ো মানুষ। সে আবার কি চাকরি করবে?

এণ্টনি বলে,—তুমি বোঝ না; লেবরদের ওয়েলফেয়ার অফিসার। তাদের যাতে ভাল হয় সে সব কাজ-টাজ করবে। মাষ্টার মানুষ ভালই পারবে।

অজয় বলে,—কক্খনো তা হবে না সাহেব! তুমি সর্বেশ্বর মাষ্টারকে চেন না।

এণ্টনি বলে,—তুমি প্রপোজালটা দিয়েই দেখ না।

অজয় বলে—দেখ সাহেব এতখানি আশা তুমি করো না। বরং ডেভিডকে বলে দেখ, সে যদি কিছু করতে পারে।

এণ্টনি বলে,—ড্যাম ইওর ডেভিড। ইংরেজের বাচ্চা, ইয়ং ম্যান! ওকে বিশ্বাস নেই।

একটু ভেবে অজয় বললে,—দেখ সাহেব! ডেভিডকে বলে দেখ না, ওর অসুখের সময় এরা অনেক কিছু করেছে; তার বদলে তাদের জন্য ডেভিডের কিছু করা দরকার।

এণ্টনি হেসে উত্তর দেয়,—ঠিক কথা বলেছ। দেখি, কি করতে পারি। কিন্তু ওই হারামীর মেয়েটা তো কিছুতেই বাগ্ মানছে না।

অজয় বলে,—কার কথা বলছ?

এণ্টনি বলে,—কার কথা আবার? সেই নন্দা মেয়েটা।

অজয় বলে,—কি আর করতে পারি বল? তোমার কাছে সুখেই থাকত। কেন যে অমন করছে বুঝতে পারছি না। তুমি বেশি মারধোর করো না সাহেব! আমি বুঝিয়ে বলব।

এণ্টনি বললে,—আচ্ছা সে দেখা যাবে। আর আমার মনে হয় কি ওই সুজাতা সর্বেশ্বরের মেয়ে নয়। এ দেশের রক্তই নেই তার গায়ে।

অজয় হেসে হেসে বলে—তুমি পাগল হয়েছ সাহেব!

এণ্টনি বললে,—না। সুজাতা এ দেশের মেয়ে নয়।

অজয় বলে,—দেশী বিলাতী সবই তোমার আমার কাছে সমান সাহেব! দেখি তোমার জন্যে কি করতে পারি!

নিজের বাংলোয় বসে এণ্টনি সাহেব অজয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। তারা ভাবে নি যে, কেউ অলক্ষ্যে থেকে তাদের গোপন পরামর্শ শুনতে পাচ্ছে।

এণ্টনি বললে,—এ পথে না হয়, অন্য পথ ধরতে হবে অজয়। মেয়েদের তুমি জান না। এক বার শুধু মুঠোর মধ্যে পেলে আমি তার সব চুরমার করে করে দিতে পারি। মনে রেখো, ওই পার্টির দিন।

তারা দু জনে ফিস্‌ফিস্ করে কি বলাবলি করতে লাগল। তার পর অজয় "আসি মিঃ এণ্টনি" বলে উঠে পড়ল।

একটি ছায়ামূর্তি তাদের পেছন থেকে সরে গেল। এণ্টনি তা বুঝতে পারলে না। ছায়ামূর্তি? না, ছায়ামূর্তি নয়, নন্দা! এদের ষড়যন্ত্রের কথা নন্দা জানতে পেরেছে। শিউরে ওঠে নন্দা! সুজাতার সর্বনাশ করতে চায় এণ্টনি!—না, না, —তা হতে দেবে না নন্দা। মণীশকে ভালবাসে নন্দা। মণীশের বান্ধবী,—মণীশের ভাবী বধূকে ছিনিয়ে নিতে দেবে না নন্দা! সুজাতাকে মণীশের বধূরূপে ভাবতে গিয়ে পুলকে ও লজ্জায় নন্দার বুকটা যেন গুমরে উঠল। হ্যাঁ, ঠিক মানাবে। ছোটবেলা থেকে মণীশের একটুখানি স্পর্শ পাবার জন্যে নন্দার মন ছটফট করত; সে জানে, তার কোন অধিকার নেই মণীশের উপর। বামুন-কায়েতের ছেলেদের সঙ্গে তার কি সংস্পর্শ! বামন হয়ে চাঁদ ধরবার স্বপ্ন! তবু মনে মনে মণীশকে পূজা করে এসেছে নন্দা।—

নন্দা বিয়ে করে নি। বাপ-মায়ের মনে আঘাত দিয়েছে; কিন্তু পারে নি নিজেকে সামলে রাখতে। লোভে পড়েছে নন্দা! তাই আজ সে বন্দিনী।

নন্দার চোখে অঝোরে অশ্রু ঝরে। কেন এমন হয়? কেন, তার প্রাণ কাঁদে?

সর্বেশ্বরকে দেখতে সুলেমান রাজা এসেছিলেন। সর্বেশ্বর কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর জ্বর ছেড়েও ছাড়ছে না। সরকারী ডাক্তারও দেখে গেছেন।

সুলেমান রাজা বললেন,—তাই তো মাষ্টার! বড় ভাবনায় ফেললে তুমি। আছে তো শুধু একটা মেয়ে। তারও কোন হিল্লে করতে পারলে না।

সর্বেশ্বর রুগ্নশয্যায়; তাঁর চিন্তাক্লিষ্ট মুখেও হাসির রেখা দেখা দেয়। তিনি আস্তে আস্তে বললেন,—হ্যাঁ রাজা সাহেব, বড় ভুল করে ফেলেছি।

সুলেমান রাজা বললেন,—ভুল নয় মাষ্টার! সবই নসিব। সবই খোদাতালার মর্জি।

সর্বেশ্বর বললেন,—হ্যাঁ, মানুষ আর কি করতে পারে। মেয়েটা বড় হয়েছে;

তার একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই নিশ্চিন্ত হতাম।

স্থলেমান রাজা বললেন,—যাই বল মাষ্টার! এটা ঢাকা-কলকাতা নয়, অজ পাড়া গাঁ, তোমার হিন্দুরা তো তোমাকে নেবে না, মুসলমান হলে তো কথাই ছিল না। থিরিস্তানি তোমার মধ্যে নেই। তুমি কিচ্ছুই নও মাষ্টার! তুমি কিচ্ছুই নও।

হো হো করে হেসে ওঠেন স্থলেমান রাজা।

সর্বেশ্বরও হেসে উত্তর দেন,—হ্যাঁ রাজা সাহেব, আমি একটা অপদার্থ!

স্থলেমান রাজা বলেন,—না হে না; তোমার মধ্যে পদার্থ আছে, সে পদার্থের কদর এ দেশের মানুষ জানে না। এরা মানুষ নয় মাষ্টার! মিছামিছি তুমি এ পাহাড়ে-জঙ্গলে এসে জানটা মাটি করলে। তোমার জন্য ভাবি না মাষ্টার! তোমার একটা ব্যবস্থা আমি করতে পারব।

সর্বেশ্বর বলেন,—কিসের ব্যবস্থা?—গোর দেবার?

স্থলেমান হাসিমুখে উত্তর দেন,—হ্যাঁ, তুমি মরলে তোমার দেহটা নিয়ে কাড়াকাড়ি লেগে যাবে মাষ্টার! হা হা হা।

স্থলেমান রাজার হাসি থামে না।

সর্বেশ্বর বললেন,—সেটা জানি। আপনি যখন রয়েছেন, তার একটা ব্যবস্থা হবে।

স্থলেমান রাজা বললেন,—এত সহজে তোমায় ছাড়ছি না মাষ্টার! মেয়েটার একটা বিয়ে দিতে হবে।

সর্বেশ্বর বললেন,—বিয়ে তো দিতেই হবে। কিন্তু—

সর্বেশ্বর আর বলতে পারলেন না, হঠাৎ যেন কাশিতে তাঁর দম আটকে যেতে লাগল। তার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সর্বেশ্বর বললেন,—তার চেয়ে স্থজাতার আরও লেখাপড়ার ব্যবস্থা করলে ভাল হয় রাজা সাহেব।

স্থলেমান রাজা বললেন,—বল কি হে? আরও লেখাপড়া শেখাবে। এত বড় হয়ে গেছে! না, না, এখানে এ সব মানায় না মাষ্টার! তুমি কি মেয়েকে মেমসাহেব তৈরি করবে? তুমি তো খ্রীষ্টান নও মাষ্টার, তবু খ্রীষ্টানী বুদ্ধি কেন?

সর্বেশ্বর বলেন,—না রাজা সাহেব! আজকাল মেয়েরা লেখাপড়া শিখে বড় বড় চাকরি করছে। দেখুন না—শহরে এ রকম কত মেয়ে রয়েছে।

সুলেমান রাজা উত্তর দেন,—সবই দেখেছি মাষ্টার! কিন্তু এসব আমার ভাল লাগে না। মেয়েরা চাকরি করবে কি হে? এতে ঘরের শান্তি থাকে না মাষ্টার! ঘরের শান্তি থাকে না। মেয়েরা যদি চাকরি করবে, তা হলে ঘর বাঁধবে কাকে নিয়ে?

সর্বেশ্বর উত্তর দেন,—সব মেয়েই তো চাকরি করতে যাচ্ছে না রাজা সাহেব! লেখাপড়া শিখলে মনটাও বড় হয়, মানুষ পরিচ্ছন্ন থাকতে শেখে।

সুলেমান রাজা হেসে উত্তর দেন,—কি যে বল মাষ্টার! তুমি কি বলতে চাও তোমার আমার মায়ের মনটা বড় ছিল না? দশ বছর বয়সে আমার মায়ের শাদি হয়েছিল; আমার মা সেই বয়সেই বাড়ির একটা প্রাণী অভুক্ত থাকা পর্যন্ত জলগ্রহণ করতেন না। শীতের দিনে এ তল্লাটের গরীবদের ঘরে ঘরে কম্বল বিলি না করা পর্যন্ত নিজে লেপ গায়ে দিতেন না।

সর্বেশ্বর বলেন,—বংশের ধারা ও পৈতৃক উদারতাও মনকে বড় করতে সাহায্য করে রাজাসাহেব! আপনার মায়ের কথা শুনেছি, এরকম মা কয়জন পায়, এটা সৌভাগ্যের কথা।

সুলেমান রাজা বললেন,—হ্যাঁ মাষ্টার! আগের আমলটাই ভাল ছিল। মেয়েরা বড় হয়ে উঠলে পরের ঘরে গিয়ে আর খাপ খাওয়াতে পারে না।

সর্বেশ্বর বললেন,—যখন বড় হয়েই উঠেছে, তখন তার মনটাও দেখতে হবে রাজা সাহেব!

সুলেমান রাজা বললেন,—উচিত কথা বলেছ তুমি! এ কথা স্বীকার করছি মাষ্টার! তোমার মেয়ে আমার অন্দরেও হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছে। তার মনটাও দেখা দরকার।

সর্বেশ্বর বললেন,—সে কি আর নিজের কথা এমনি বলবে রাজা সাহেব?

সুলেমান রাজা হেসে বললেন,—তাই তো! কিন্তু মাষ্টার এখানে সে রকম পাত্রই বা কোথায়?

সর্বেশ্বর উত্তর দিলেন,—সেজন্যই মনে করেছি, মেয়েকে বাইরে পাঠিয়ে দেব। লেখাপড়া শিখে স্বাধীন ভাবে নিজের অদৃষ্ট নিজেই যাচাই করে নেবে।

সুলেমান রাজা বললেন,—মন্দ কথা বল নি মাষ্টার! কিন্তু এ বয়সটা ভাল নয়। যা করবার শীগগির করে ফেল। আর এক কথা কদমপুরের ওই তেলের খনির সাহেবগুলোর সঙ্গে মিশতে দিয়ো না মাষ্টার! ওরা লোক ভাল নয়।

সর্বেশ্বর বললেন,—না। সেখানে ডেভিড সাহেবের অসুখের সময় দু-চার দিন গিয়েছিল; আর সেখানে যাবার কোন দরকারই নেই।

সুলেমান রাজা হো-হো করে হেসে বললেন,—ওঃ সেই আধপাগলা সাহেবটা! তোমার কাছেই যত সব পাগল এসে জোটে মাষ্টার, এখন তো শুনেছি সে ভাল হয়ে উঠেছে। সাহেবটা বড় ভাল মাষ্টার! হাজার হোক খাঁটি ইংরেজ-বাচ্চা।

সর্বেশ্বর বললেন,—হ্যাঁ বড় ভাল ছেলেটা। সে বলছিল, সুজাতাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভাল বন্দোবস্ত করে দেবে।

সুলেমান রাজা বললেন,—সে কি আবার ব্যবস্থা করবে মাষ্টার? তোমার মেয়ে পরশ-পাথর মাষ্টার! তাকে ভয় নেই। তবু বয়সটা বোঝো তো?

সর্বেশ্বর উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ। কিন্তু ডেভিডকে বিশ্বাস করা যায়।

সুলেমান রাজা হেসে হেসে উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ আমিও তাই বলছি। আর যাই বল এই ডেভিডের সঙ্গেই তোমার মেয়েকে ভাল মানাবে। বাঙালীর ঘরে এ মেয়ে মানাবে না মাষ্টার!

এমন সময় রহমন দারোগা এলেন। তিনি সুলেমান রাজাকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন,—সেলাম রাজা সাহেব! আপনি কতক্ষণ এসেছেন?

সুলেমান রাজাও হাসিমুখে প্রত্যুত্তর দিয়ে বললেন,—অনেকক্ষণ হল এসেছি দারোগা! কেমন আছ?

রহমন দারোগা উত্তর দেন,—ভাল আছি রাজা সাহেব! খোদার দোয়ায় এক রকম চলে যাচ্ছে।

সুলেমান রাজা বললেন,—বেশ আছ রহমন! ছিলে দারোগা, এখন হয়েছ ডাক্তার। আগে চোর-ডাকাত ঠেঙিয়ে বেড়াতে, এখন রোগ ঠেঙিয়ে বেড়াচ্ছ।

রহমন দারোগা হেসে উত্তর দেন,—একটা কিছু নিয়ে দিন কাটাতে হবে তো রাজা সাহেব!

সুলেমান রাজা বললেন,—বেশ, বেশ! আচ্ছা আমাদের এই মাষ্টারের অবস্থা কি বুঝছ? সরকারী ডাক্তার কি বলেছে?

রহমন দারোগা উত্তর দিলেন,—না, তেমন কিছু নয়; কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। রক্তটা পরীক্ষা করবার জন্য তিনি নিয়ে গেছেন। জ্বরটার জন্যই ভাবনা।

সুলেমান রাজা বললেন,—হ্যাঁ যা করবার কোর রহমন! দরকার হলে শহর থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে এসো।

রহমন বললেন,—হ্যাঁ তেমন জরুরী বুঝলে আনতে হবে বৈকি?

সর্বেশ্বর এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। তিনি বললেন,—না রাজা সাহেব! মিছামিছি কতকগুলো টাকা নষ্ট করবার দরকারই বা কি?

সুলেমান রাজা বললেন,—আমরা যা ভাল বুঝব, তাই করব মাষ্টার! তুমি বড় ভাবিয়ে তুলেছ। তাই তো বলছিলাম, মেয়েটার বিয়ে দিয়ে ফেল।

রহমন বললেন,—হ্যাঁ রাজা সাহেব! কিন্তু এদের হিন্দুদের যত সব বায়নাক্কা, তা না হলে এই মণীশ ছেলেটা মন্দ ছিল না।

হো-হো করে হেসে উঠলেন সুলেমান রাজা। তিনি বললেন,—তোমার নজর আছে রহমন! তোমার নজর আছে। ভুল করে বাঙালীর ঘরে এসে পড়েছে মেয়েটা। সাহেবদের ঘরে পড়লেই ভাল হত।

রহমন দারোগা রাজা সাহেবের কথা শুনে হকচকিয়ে উঠলেন। তার পর হেসে হেসে বললেন,—হ্যাঁ, ভালই হত রাজা সাহেব! কিন্তু হিন্দুদের কথা জানেন তো?

সুলেমান রাজা বললেন,—রেখে দাও তোমার এসব কথা। ছেলেটা রাজী হলেই হয়।

সর্বেশ্বর হাসিমুখে উত্তর দেন,—আমার জন্য কি এক জন তার জাতধর্ম বিসর্জন দিয়ে পথে বসবে রাজা সাহেব?

সুলেমান রাজা বললেন,—তোমাদের জাত আর ধর্ম আমি কিছুই বুঝতে পারি নে মাষ্টার! সবই কিন্তু তকিমাকার।

সর্বেশ্বর উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ, এসব বুঝতে পারবেন না রাজাসাহেব। ধর্মের নামে যা চলছে, সেটা অভ্যাস মাত্র। অভ্যাসই এখন সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে।

সুলেমান রাজা বললেন,—তা হলে এসব মানা কেন মাষ্টার?

সর্বেশ্বর উত্তর দিলেন,—মানতে হবে বৈ কি? যারা যাতে অভ্যস্ত, তাতে আঘাত পড়লেই ক্ষেপে ওঠে; ক্ষমতার জোরে তা রাখতে চায়। কিন্তু যুগে যুগে যে দেশ কাল ও সমাজের উপযোগী করে নিতে হবে, তা ভাবে না। এখানেই যত গণ্ডগোল।

রহমন বললেন,—ঠিক বলেছেন মাষ্টার মশাই! ক্ষমতার জোরেই আজকাল সব চলছে।

সুলেমান রাজা বললেন,—সবুর কর মাষ্টার! এসব এক দিন দূর হবে।

সর্বেশ্বর বললেন,—জানি, কিন্তু সেদিন আসতে আর এই গ্রাম্য সমাজে তার প্রভাব পড়তে অনেক দেরি।

সুলেমান রাজা বললেন,—বেশ তো। তুমিই না হয় সেদিনটা এগিয়ে দাও।

সুলেমান রাজা হাসতে লাগলেন। রহমন দারোগা বললেন,—হ্যাঁ, আমি বলি কি মণীশের সঙ্গে সুজাতার বিয়ে দিয়ে দেখাই যাক না।

সর্বেশ্বর বললেন,—এখানে তারা টিকতে পারবে না। খড়্গহস্ত হয়ে উঠবেন কৃষ্ণপ্রসাদবাবু। তাদের সমাজ একাজ মেনে নেবে না।

সুলেমান রাজা বললেন,—আমি আছি মাষ্টার! আমি আছি।

সর্বেশ্বর বললেন,—তবুও রক্ষে থাকবে না রাজা সাহেব! কত রাজা গেল, রাজ্যপাট লোপাট হয়ে গেল, তবু সমাজের এ শাসনদণ্ডটি লোপাট হয়ে যায় নি। সমাজপতিরা তাদের শাসন চালিয়েই যাচ্ছে। মোগল, পাঠান কিংবা ইংরেজ কেউ সেখানে হাত দিতে পারে নি। ধর্মের নামে অন্ধ সংস্কার জয়লাভ করছে।

সর্বেশ্বরের মুখে উত্তেজনার ভাব দেখা গেল। রহমন দারোগা বললেন,—থাক মাষ্টার মশাই! পরে ভাল বুঝে যা হয় করা যাবে। আগে আপনি সেরে উঠুন।

এমন সময় সুজাতা ঘরের মধ্যে ঢুকল। সুজাতাকে দেখে সুলেমান রাজা বললেন,—হ্যাঁরে মা! তুই আম্মাদের একদম ভুলেই গেছিস। কই, আমার বাড়ি যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিলি!

সুজাতা লজ্জিত হয়ে বলে,—ভুলি নি চাচাসাহেব! সময় পাই না; এই তো বাবার অসুখ। বের হবার উপায় নেই।

সুলেমান রাজা বললেন,—বাবার অসুখ তো দু-চার দিনেই সেরে যাবে। তার জন্যে ভাবনা কি? আর এবার তো মা, তুই আমাদের ছেড়ে চলেও যাবি।

সুজাতা হাসিমুখে বলে,—কেন চলে যাব? আমাকে আপনারা তাড়িয়ে দেবেন না কি?

সুলেমান রাজা বললেন,—তাড়িয়ে দেব কি রে? বাপ-মায়ের কাছে কি মেয়ে চিরটা কাল থাকে?

সুজাতা সুলেমান রাজার কথার মর্মার্থ বোঝে। লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে তার মুখমণ্ডল। সে সপ্রতিভ স্বরে উত্তর দেয়,—কেন বাপ-মায়ের কাছে থাকার অধিকারও কি মেয়েদের থাকে না চাচাসাহেব! আমি আপনাদের কাছেই থাকব।

সুলেমান রাজা বললেন,—থাক মা! তাই থাক। কিন্তু তা কি পারবি? আচ্ছা দেখা যাবে।

সুলেমান রাজা হাসতে লাগলেন। সুজাতা সর্বেশ্বরের মাথার কাছে বসে হাত-পাখা চালাতে লাগল। রহমন দারোগা বললেন,—এবার ডাক্তারবাবু আসবেন মা। সে ওষুধটা খাইয়ে দিয়েছ তো!

সুজাতা বললে,—হ্যাঁ!

সর্বেশ্বর বললেন,—ওষুধটা খাওয়ার পর থেকে আমার খুব ঘাম হচ্ছে। বেশ অস্বস্তি বোধ করছি।

রহমন বললেন,—তা একটু হতে পারে। ডাক্তারবাবু বললেন, জ্বরটা আজ আর নাও আসতে পারে।

সুলেমান রাজা বললেন,—সাবধানে থেকো মাষ্টার! আমি এখন আসি।

আর দেখো দারোগা, মাষ্টার কেমন থাকে আমায় খবর দিয়ো।

সুলেমান রাজা চলে গেলেন। রহমন দারোগা বললেন, আমিও আসি মা! ডাক্তারবাবু এলে সব বুঝে নিয়ো। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসছি।

সর্বেশ্বর বললেন,—তাড়াতাড়ি ফিরবেন রহমন সাহেব।

রহমন মাথা দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেলেন।

মণীশের মনটা আজ ভাল ছিল না। সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে, থামবার নাম নেই। কাঞ্চনগড়েও সে আজ দু দিন যায় নি। শরীরটাও খারাপ ঠেকছিল। সুনন্দার অবস্থা দেখে মনটা বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছে। বিকারের ঘোরে ভুল বকছে সুনন্দা। সন্ধ্যাই মণীশকে সুনন্দাকে দেখতে প্রায় জোর করে নিয়ে গিয়েছিল।

সুনন্দার সঙ্গে তার ভাবী সম্পর্কের কথা মণীশের মনে একটু সংকোচও এনে দিয়েছিল। কিন্তু তার আপত্তি সন্ধ্যা শোনে নি। সন্ধ্যার সঙ্গে মেলামেশায়ও মণীশ আজকাল শঙ্কিত হয়। কত কথা উঠেছে; সন্ধ্যার মাও ইদানিং সন্ধ্যাকে সাবধান করে দিয়েছেন। তবু সন্ধ্যা এ সব গ্রাহ্যই করে না।

সন্ধ্যা প্রায় হাত ধরে টেনেই মণীশকে নিয়ে সুনন্দার রুগ্নশয্যার কাছে নিয়ে গেল। তার রোগ-কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে মণীশ শিউরে উঠেছিল। তাকে চেনাই যায় না; সেই দুরন্ত মেয়ে সুনন্দা যেন কেমন হয়ে গেছে! চোখ দুটি লাল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে যেন কাউকে খুঁজছে। মুখে তার যত সব অসংলগ্ন কথা; প্রলাপ বকছিল সুনন্দা।

সন্ধ্যা সুনন্দার কাছে গিয়ে তার দুখানি শীর্ণ হাত তার নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলেছিল,—চেয়ে দেখ্ সুনন্দা! মণীশ এসেছে।

সুনন্দা চুপ করে ড্যাব ড্যাব চোখ করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল; তার পর বললে,—না। এখন আমি খেলব না। খেলাঘর ভেঙে দিয়েছি।

আর কোন উত্তর দেয় নি সুনন্দা। শুধু সন্ধ্যার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার চোখ বুজেছিল। সুনন্দার মা বলেছিলেন,—তোমাদের কথাই বলে

বাবা! সেই সব ছোটবেলার কথা।

অঝোরে চোখের জল ফেলেছিলেন সুনন্দার মা।

আর মণীশ সুনন্দার প্রলাপ শুনে চুপ করে ভাবে,—হ্যাঁ, খেলাঘর ভেঙেই গেছে। ছোটবেলার খেলাঘরে আর ফিরে যাওয়া যায় না।

সুনন্দার অবস্থা দেখে মণীশের কষ্টই হয়। সে ভাবে,—কি করতে পারি আমি? হয়তো মনে আঘাত পেয়েছে সুনন্দা। না, ভাল হয়ে উঠুক সুনন্দা। তার পর,—তার পর দেখা যাবে। কিন্তু মণীশের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন জুড়ে দিয়ে সুনন্দা শান্তি পাবে কি?

সন্ধ্যা বলে,—দেখলি মণীশ! বড় কষ্ট পাচ্ছে রে, কাউকে বড় একটা চিনতেই পারে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সন্ধ্যা। মণীশ বলে, আসি আমি।

সুনন্দার মা বলেন,—মাঝে মাঝে এসে দেখে যেয়ো বাবা! আমি আর কি বলব।

সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে মণীশ বিদায় নিয়েছিল। সুনন্দার অবস্থা তার মনকে বিচলিতই করেছিল। বাড়ি ফিরে সে শুনল, সন্দীপের দাদা তার খোঁজে এসেছিলেন; সন্দীপের খোঁজে নাকি পুলিস ঘুরছে।

হ্যাঁ, সবই সত্যি। মণীশও সন্দীপের কথা কিছুই জানত না। সন্দীপের জন্যও মনটা ছটফট করছে। এত ভাল ছেলে! পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেণ্ড হয়। সে কিনা শেষে রিভলিউশনারী দলে যোগ দিলে?

কাল রাত্রে এসেছিল সন্দীপ। বড় চুপি চুপি এসেছিল; নিঝুম রাত। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ দরজায় টোকার আওয়াজ। মণীশের ঘুম আসে নি, আকাশ-পাতাল চিন্তা আর মাথার যন্ত্রণা তাকে অস্থির করে তুলেছিল। দরজায় এমনি করে আগেও টোকা দিয়ে আসত সন্দীপ। তবু এত রাত্রে সেই আওয়াজ পেয়ে মণীশ বিস্মিত হয়েছিল। সে জানত সন্দীপ বাড়ি নেই; আর এখন আসারও কথা নয়। দরজা খুলে সন্দীপকে দেখে মণীশ বিস্মিত হল।

সন্দীপ ঘরে ঢুকে চুপি চুপি বললে,—তোর সঙ্গে দেখা করতে এলাম মণীশ!

আর হয়তো দেখাই হবে না। কোথায় থাকব, তার কোন ঠিকঠিকানা নেই। আমাকে লুকিয়ে বেড়াতে হবে।

মণীশ হতভম্বের মত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল,—কি বলছিস? এত রাত্রে কোথা থেকে এসেছিস আর যাবিই বা কোথায়?

সন্দীপ উত্তর দিয়েছিল,—পুলিস আমার পিছু নিয়েছে মণীশ!

মণীশ বলেছিল,—কেন? তুই তো কলেজের হোস্টেলে ছিলি! সেখানে আবার কি হল? বাড়িই বা কখন এলি?

সন্দীপ হেসে হেসে উত্তর দিয়েছিল,—আর বাড়ি ঢোকা হবে না মণীশ! তাই তোকে বলতে এসেছি। আমি হোস্টেল ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।

মণীশ সংশয়াকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল,—কেন? হোস্টেলে কোন গোলমাল করেছিস নাকি? বাড়িতে জানাস নি? তোর দাদা কি এ সব জানেন না?

সন্দীপ উত্তর দিয়েছিল,—দাদা জানবে কি করে? যাক্, তোকেই বলে যাচ্ছি, আমি দাদার আশা পূর্ণ করতে পারব না। হয়তো দাদার সঙ্গে জীবনেও দেখা হবে না।

মণীশ সন্দীপের কথা প্রথমে বুঝে উঠতে পারে নি। সন্দীপের চেহারা দেখে সে শিউরে উঠল। তার কাপড়জামা ভিজে গেছে। দাড়ি কামায় নি; রুক্ষ চুল আর শুকনো মুখ।

মণীশ বলেছিল,—বড্ড ভিজে গেছিস সন্দীপ। এখন তো কাপড়চোপড় ছাড়। তার পর যা হয় হবে।

সন্দীপ উত্তর দিয়েছিল,—না ভাই! আমায় এক্ষুনি পালাতে হবে। তা না হলে তোরও বিপদ হবে। আমরা যে ইংরেজের শত্রু। কাগজে পড়িস নি তিন দিন আগে শহরের তোষাখানা লুট হয়ে গেছে।

মণীশ হকচকিয়ে উঠেছিল। শিউরে উঠেছিল সন্দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে। বিদ্যুতের লহরী খেলছিল মনে,—কি সর্বনাশ! সন্দীপ বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছে! কই, কোন দিন তো ঘুণাক্ষরেও একথা জানতে দেয় নি সন্দীপ!

মণীশ নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল,—এ কি করলি সন্দীপ! শেষে এপথ বেছে নিলি কেন?

সন্দীপ উত্তর দিয়েছিল,—আর যে কোন পথ নেই মণীশ ! বনে জঙ্গলে ঘুরে পাহাড়ী আর চাষাভূষাকে চরিয়ে দেশ স্বাধীন হবে না। আগে দেশকে মুক্ত করতে হবে।

সন্দীপের কথা শুনে মণীশ হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পায় নি। সে ভাবছিল, সন্দীপের দাদার কথা। তার বিধবা মা তো কত আশা করে বসে আছেন। সন্দীপ চাকরি করে তাঁদের দুঃখ দূর করবে! সংসারের ঘানি টেনে চলেছেন হাঁপানি-রোগ-গ্রস্ত দাদা। কি কষ্টে যে তাঁরা সন্দীপের পড়ার খরচ যোগাচ্ছেন! সন্দীপ তাঁদের কথা ভাবল না। সন্দীপ রিভলিউশনারী! শুধু তাই নয়, সরকারী তোষাখানা লুট করেছে যারা, সন্দীপ তাদেরই এক জন।

খবরের কাগজে বড় বড় শিরোনামায় বেরিয়েছে সে সাংঘাতিক খবর! বিপ্লবী বাঙালীর অভাবনীয় দুঃসাহসের কর্মকাহিনী! সেদিনের কাগজে পড়ে মণীশের বুক গর্বে ফুলে উঠেছিল। নিজের দেশের ছেলেদের সাহসিকতার গর্বে উত্তেজনাই জেগেছিল। কিন্তু সন্দীপের কথা শুনে আর সন্দীপকে সামনে পেয়ে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে উঠেছিল মণীশ। মনে হয়েছিল,—সন্দীপ সর্বনাশের পথে পা বাড়িয়েছে; আর নিস্তার নেই।

বিহ্বল চিত্তে মণীশ সন্দীপকে বলেছিল,—একি করলি তুই? এখন উপায়?

সন্দীপ উত্তর দিয়েছিল,—আমার জন্যে ভাবিস না মণীশ! আমার উপায় আমিই করব। ফাঁসি-কাঠ তো রয়েইছে। এখন বিদায়।

মণীশকে আর কথা বলবার অবকাশ দেয় নি সন্দীপ; হঠাৎ হাসিমুখে তার হাতে বেশ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সন্দীপ চলে গিয়েছিল। হতভম্বের মত সেই নিশীথরাত্রির অন্ধকারে ভিজে মাটির উপর সন্দীপের পায়ের শব্দ দু-এক বার শুনেছিল মণীশ। অনেকক্ষণ সে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাত্রে আর ঘুমোতে পারে নি।

সেই থেকে মনটা তার ভাল ছিল না। সর্বেশ্বরের ওখানেও যায় নি; দু দিন হয়ে গেছে। তার উপর সুনন্দাকে দেখতে সন্ধ্যা এসে নিয়ে গেল। তারও খবর ভাল নয়। সন্ধ্যা বলেছে,—সুনন্দা মনে বড় আঘাত পেয়েছে মণীশ! তুই তার স্বপ্ন ভেঙে দিলি।

হ্যাঁ, মণীশ অপরাধী। কিন্তু কে কি স্বপ্ন দেখছে, কার স্বপ্ন কিসে ভেঙে গেল, সে জানবে কি করে? সুনন্দার স্বপ্ন মণীশ ভেঙে দিয়েছে?—তার জন্য কি মণীশ দায়ী? সে তো কোন দিন সুনন্দাকে কিংবা তার বাবা-মাকে কোন কথা দেয় নি। কেন সুনন্দা এ স্বপ্ন দেখেছিল? তবু কষ্ট হয়, সুনন্দার মুখখানি বার বার মনে পড়ে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মণীশ। কি জানি কি হয়?—বড় দুরন্ত আর বড় বেপরোয়া মেয়ে এই সুনন্দা!

আবার মনে পড়ে যায় সুজাতার কথা। মণীশ নিজেই যে স্বপ্নজাল রচনা করছে, তার সে স্বপ্ন কি ভেঙে যাবে? সুজাতাকে বুঝে ওঠা কঠিন! কোন সংকোচ নেই তার মনে। মণীশের মনে ভেসে ওঠে সে দৃশ্য—রুগ্ন ডেভিডের হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে আদর করছে সুজাতা! ভাবতে গিয়ে হঠাৎ মণীশের মনটা কেমন যেন হয়ে ওঠে।

সর্বেশ্বর মাষ্টারের মেয়ে সুজাতা! এমন রঙ, এমন চুল,—এমন গড়ন! মণীশ আজ যেন নূতন করে দেখছে,—ডেভিড আর সুজাতাকে মনের পর্দায় পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখছে মণীশ!

সর্বেশ্বরের কথাগুলিও আজ নূতন করে আলোড়ন জাগায় মণীশের মনে। আবার ভাবে,—না, সুজাতা নিশ্চয়ই মণীশকে ভালবাসে। যদি মণীশের স্বপ্ন মিথ্যা হয়, কিসের ওপর দাঁড়াবে মণীশ?

সুজাতাকে মণীশ ভালবাসে। সুজাতা সুখী হোক।—না, না, মণীশ যে তাকে একান্ত আপন করেই চায়। কিন্তু তাতে বাধা আছে; সমাজ আছে, ধর্ম আছে। পিসীমার ছল ছল চোখ দুটি তার সামনে যেন দেখতে পায় মণীশ।

কেউ কেউ বলে, সর্বেশ্বর সুজাতাকে কুড়িয়ে পেয়েছেন। কোথাকার কোন্ সাহেবের মেয়ে। সত্যি যদি সুজাতা তেমন কেউ হয়! তবু মণীশ সুজাতার জন্য সবই ছাড়বে। কিন্তু এমন কর্ম-চঞ্চল সংকোচহীন, দ্বিধাহীন বিহঙ্গী কি খাঁচায় বন্ধ থাকতে চাইবে? না, না,—তা হতে পারে না।

আবার সন্দীপের কথা মনে পড়ে। তার দাদা হয়তো আবার তার খোঁজ করতে আসবেন। কি খবর দেবে মণীশ?—সন্দীপ রিভলিউশনারী দলে যোগ

দিয়েছে। কাগজে যাদের কথা বেরিয়েছে সন্দীপ তাদেরই এক জন।—কি বলবে হাঁপানি-রোগ গ্রস্ত সেই দাদাকে ?

মণীশ ভাবে,—সেও বিদ্রোহী হবে ? সেও আঘাত দেবে তার পিসীমা আর গোকুলকাকার মনে ?

সংশয়-দোলায় দোলে মণীশের মন। তার চোখের সামনে যেন দেখে ডেভিড আর সুজাতার মূর্তি,—দু জনে হাত-ধরাধরি করে জাহাজে উঠছে; এদেশের ভাবশক্তি আর বিলাতের কর্মশক্তি মিলিত হতে যাচ্ছে।

কদমপুরের পাহাড়ী পথে সুজাতা চলেছে।

দু দিন হয়, মণীশের দেখাই নেই। এদিকে সর্বেশ্বর অসুস্থ, তবু তিনিই সুজাতাকে জোর করে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বলেছিলেন,—না গেলে ভাল দেখায় না মা! এণ্টনি কিংবা ডেভিড্ যে-ই নিমন্ত্রণ করুক না কেন, ডেভিডের জন্যই এ আয়োজন করা হয়েছে। শিষ্টাচারের খাতিরেও তোমার যাওয়া উচিত। না গেলে ডেভিড ক্ষুণ্ণ হবে।

ডেভিডের রোগ-মুক্তি উপলক্ষ্য করে এণ্টনি একটা পার্টি দিচ্ছে। তারই নিমন্ত্রণ। মণীশ বলেছিল, তাকেও নিমন্ত্রণ করেছে। দু জনে এক সঙ্গেই যাওয়ার কথা; কিন্তু মণীশ আসে নি। সর্বেশ্বরবাবুর শরীর এখন অনেকটা ভালই ছিল। রহমন দারোগা তাঁর কাছে বসে গল্প করছিলেন। সর্বেশ্বর বলেন, এই তো রহমন সাহেব রয়েছেন; তুমি তাড়াতাড়ি একবার ঘুরে এস। মণীশ যদি এখানে আসে, তাকে আমি পাঠিয়ে দেব।

রহমন দারোগা বলেছিলেন,—একা যাবে কেন ? সাবিকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

সুজাতা সাবিকে সঙ্গে নিতে চায় নি। সে একাই চলে এসেছে। বেলা তখন বিশেষ নেই, পাঁচটা বেজে গেছে; রবিবার,—সুতরাং খনিতে আর তেমন কর্ম-চঞ্চলতা নেই। তবুও দু-চার জন এদিকে-ওদিকে চলাফেরা করছে।

তিন নম্বর বাংলোতেই অনুষ্ঠানের কথা। এই বাংলোতেই এণ্টনি থাকে। সাহেবসুবোদের এরকম পার্টিতে সুজাতা এই প্রথম যোগ দিতে যাচ্ছে; শুধু

সাহেবসুবোদের কেন, কোনরকম সামাজিক উৎসবেই সুজাতা আজ পর্যন্ত যোগ দেবার সুযোগ পায় নি।

সর্বেশ্বর বাবু বলেছিলেন,—এ উপলক্ষে কিছু উপহার দেবার রীতি আছে মা! কিই-বা দিবি? একটা ফুলের তোড়া নিয়ে যা। ডোভিডের হাতে দিস্। সুজাতা তাঁর কথা মত ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছে।

তিন নম্বর বাংলোর কাছাকাছি একটা জায়গায় দু-তিনটা রাস্তা এসে একসঙ্গে মিশেছে। চৌমাথার এপাশে-ওপাশে বড় বড় বটগাছ; মাঝে মাঝে দেব-কাঞ্চনের গাছও রয়েছে। গাছগুলোর তলায় ছোট ছোট দোকান। চিঁড়ে, মুড়ি, লাড্ডু আর ভুট্টার খই সাজানো রয়েছে; চা-ও পাওয়া যায় একটা দোকানে। রবিবার হলেও দু-এক জন খদ্দের বসে রয়েছে। সুজাতা দু-এক বার এদিকে তাকিয়ে নিজের পথে চলতে লাগল। এমন সময় নন্দার সঙ্গে দেখা। নন্দাকে দেখে সুজাতার মনটা কেমন বেদনায় ভরে উঠল। নন্দা কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে বললে,—দিদিমনি! তুমি একা যে? কেউ সঙ্গে আসে নি?

সুজাতা উত্তর দেয়,—হ্যাঁ একাই এলাম।

নন্দা বলে,—কেন, মণীশ দাদাভাই আসে নি?

সুজাতা বললে,—তারও আসার কথা। কিন্তু অনেকক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা করে চলে এলাম।

নন্দা বিস্ময়ের সুরে বললে,—কেন, কোথায় গেছে মণীশ দাদাভাই?

সুজাতা বললে,—মণীশদা তো তাঁর বাড়িতে থাকেন। দু দিন হয় আমাদের ওখানে আসেন নি।

নন্দা বললে,—একটা কথা দিদিমনি! তুমি খুব তাড়াতাড়ি চলে যেয়ো। এণ্টনি সাহেবটা ভাল মানুষ নয়; আর কেনই বা তুমি এলে?

সুজাতা বলে,—না, আমি বেশিক্ষণ থাকব না। বাবার অসুখ, শুধু ভদ্রতার খাতিরেই এসেছি।

নন্দা বললে,—বেশ করেছ। ডেভিড সাহেব ভালমানুষ। কিন্তু এখানে ওদের পার্টিতে হৈ-হল্লোড় হবে। তুমি থেকো না।

সুজাতা বলে,—হোক্ না হৈ-হুল্লোড়! আমোদ-প্রমোদ একটু করবে বৈ কি?

নন্দা বলে,—শুধু হৈ-হুল্লোড় নয় দিদিমনি, ওরা মদ খেয়ে মাতলামি করবে। এরকম পার্টি আমার অনেক দেখা আছে। কি যে বেলেল্লাপানা করে, দেখলে গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে।

সুজাতা বলে,—না. আমি ডেভিডের সঙ্গে দেখা করেই চলে যাব। আচ্ছা এণ্টনি এখন তো তোমায় বের হতে দিয়েছে দেখছি।

নন্দা হেসে হেসে বলে,—হ্যাঁ দিয়েছে। তার মতলব ভাল নয় দিদিমনি! আজ আমাকে আমার বাবার কাছে যেতে দিয়েছে।

সুজাতা বলে,—ভালই হল, তোমায় আমি আজ আমার সঙ্গে নিয়ে যাব।

নন্দা উত্তর দেয়,—তুমি পারবে না দিদিমনি! কদমপুরের এই কারখানা-গুলোর বাইরে আমার এক পাও বাড়াবার উপায় নেই। হন্যে কুকুর সব আমার উপর চোখ রেখেছে। আর শোনো দিদিমনি আমি বুঝতে পারছি, এণ্টনি আজ রাতের মত আমাকে সরিয়ে দিয়ে তার একটা মতলব হাসিল করতে চায়।

সুজাতা জিজ্ঞাসা করে,—কি মতলব?

নন্দা বলে,—তোমাকে বিপদে ফেলবে এণ্টনি। খবরদার বলছি, দিদিমনি! ওর কোন কথাই বিশ্বাস করবে না। মদ খাইয়ে সবাইকে বিভোল করে রাখবে, তখন,—তখন দিদিমনি! ওই কুকুরটা তোমায়—।

নন্দা আর বলতে পারে না; ক্ষোভে আর রাগে তার চোখমুখ বিকৃত হয়ে ওঠে। চোখের জল ফেলতে ফেলতে নন্দা বললে,—আমি আসি দিদিমনি! তুমি সন্ধ্যার আগেই বেরিয়ে পড়বে। ওখানে কোন কিছুই মুখে দেবে না।

সুজাতা বিস্ময়-বিহ্বল স্বরে বলে,—মুখে দেব না? কি বলছ তুমি? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

নন্দা বলে,—কি বলব দিদিমনি! তুমি কি বোকা! এণ্টনি মেয়েদের সর্বনাশ করে। ও যে একটা আস্ত জানোয়ার।

নন্দার কথা শুনে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থাকে সুজাতা। মনে মনে ভাবে, হ্যাঁ, এণ্টনি জানোয়ার হতে পারে, কিন্তু তার কি ভয়? সে তো তার সঙ্গে

মেলামেশা করে না। নেহাৎ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছে। অবশ্য ওদের সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে সে।

নন্দা বলে,—খবরদার! সন্ধ্যার আগেই তুমি বেরিয়ে পড়বে। কোন কিছুই মুখে দেবে না।

সুজাতা আতঙ্কের সুরে বলে,—সে কি সম্ভব হবে? কি করে তাদের অনুরোধ এড়াব?

নন্দা বলে,—কি জানি, খাবারের সঙ্গে যদি কোন কিছু নেশার জিনিস মিশিয়ে দেয় দিদিমনি! তাই একথা বলছি।

নন্দার কথা শুনে সুজাতার মুখখানি এতটুকু হয়ে যায়। সে ভাবে, ডেভিড আছে। ডেভিড তো ওরকম নয়।

নন্দা বলে,—এ একটা ছলছুতোর পার্টি দিদিমনি! আসলে তোমাকে এ পার্টিতে নিয়ে আসার মতলবেই এণ্টনি ফাঁদ পেতেছে। জান না, মণীশদাদা-ভাইকে এর জন্যেই চাকুরি দিতে চেয়েছে এণ্টনি।

আতঙ্কে সুজাতা আর পা ফেলতে পারে না। ভাবে, এখান থেকেই পালিয়ে যাই। আবার ভাবে,—মিছামিছি এ আতঙ্ক! কোন ভদ্রলোক কাউকে নিমন্ত্রণ করে এনে এরকম বিপদে ফেলতে পারে না।

সুজাতা বলে,—তা হলে কি হবে? কি করব আমি?

নন্দা বলে,—আমার কথা শোন, তুমি বলবে ডেভিড সাহেবের মঙ্গলের জন্য তুমি আজ উপোস করে আছ।

সুজাতা বলে,—সে কি?

নন্দা বলে,—হ্যাঁ, আমরা হিন্দু। আমাদের মধ্যে তো এ রীত আছে দিদিমনি! একথা জানিয়ে দিলেই তোমাকে খাবার জন্যে আর পীড়াপীড়ি করতে পারবে না। বুঝলে?

সুজাতা নন্দার কথায় যেন অকূল সাগরে কূল পায়। তার মুখ থেকে ম্লান ছায়া কতকটা দূর হল। তবুও ভীতকণ্ঠে বললে,—এখানে আমার এরকম একা না এলেই হত।

নন্দা উত্তর দেয়,—তুমি ভেবো না দিদিমনি! শুধু আমার কথাটা মনে রেখো। আমি ভাবছি মণীশ দাদাভাই যদি শেষ কালে এসে পড়ে, তা হলে সামলাব কি করে?

সুজাতা বলে,—তাই তো। কি হবে?

নন্দা বলে,—তুমি আর দেরি কোর না দিদিমনি! শীগ্‌গির তোমায় ফিরে আসতে হবে। আমি দেখছি মণীশ দাদাভাই আসে কিনা!

সুজাতা চলে গেল। নন্দা দু-এক বার পিছন ফিরে তার দিকে ফিরে তাকিয়ে অন্য পথ ধরল। নন্দা জানে—এণ্টনি সহজে ক্ষান্ত হবে না। এণ্টনির বিষ-দাঁতের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছে নন্দা। এণ্টনির বিষদাঁত ভাঙতে হবে।

নন্দা কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়াল। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তেলখনি-অঞ্চলে প্রবেশ করার পথটা দেখা যায়। বাইরে থেকে কেউ এলে তাকে দেখতে পাবে না। মণীশের জন্যই এখন তার ভাবনা, যদি মণীশ আসে!

অনেকক্ষণ হয়ে গেল। মণীশের দেখা নেই। এদিকে সূর্যও ডুবু ডুবু হয়েছে। নন্দার মন উৎকণ্ঠায় ভরে উঠল। মণীশের কি অসুখ-বিসুখ হল? না কোন বিপদ-আপদ্ ঘটেছে। সুজাতা দিদিমনি বলেছে, দু দিন মণীশের দেখা নেই! কি হল তার? না, এণ্টনি নিজের কাজ হাসিল করার জন্যে কোন কৌশলে তার আসার পথে বাধা জন্মিয়েছে? ভাবতে ভাবতে ব্যাকুল হয়ে উঠল নন্দা। তার পর নন্দা ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে কুলী-ব্যারাকের দিকে চলল।

ব্যারাকের পাহারাদার সুলাল সর্দার। সুলাল তখন ব্যারাকের ফটক আগলে বসে আছে। নন্দাকে দেখতে পেয়ে সুলাল বললে,—কি রে, বড় যে ছেড়ে দিলে সাহেব?

নন্দা হেসে হেসে চোখ-মুখের ইঙ্গিতে ঢলঢল ভাব এনে বলে,—ছাড়ে কি আর? তোমার জন্যেই পালিয়ে এলাম সর্দার?

সুলাল গদ্‌গদ হয়ে উত্তর দেয়,—আমার জন্যে?

নন্দা বলে,—হ্যাঁ গো সর্দার! তোমায় কি ভুলতে পারি? সাহেবকে

সাতপাঁচ নানা কথায় ভুলিয়ে তোমার ঠাঁই চলে এলাম।

সুলাল সর্দার তখন মদের নেশায় মশগুল। নন্দার কথা শুনে সে নেশা আরও যেন বিহ্বল করে তুলল। নন্দার দিকে তার অনেক দিন থেকেই নজর ; কিন্তু ধরা-ছোঁয়া দেয় না ; তার উপরে এণ্টনি সাহেব রয়েছে, বাবা! এণ্টনি ব্যাটাকে একবার বাগে পেলে হয় ; ব্যাটাকে একেবারে এক নম্বর পিটের তলায় ছুঁড়ে দিলে গায়ের জ্বালা জুড়ায়।

সুলাল বলে,—কিন্তু বড় অসময়ে যে ?

নন্দা বলে,—সময়-অসময় কি সর্দার ? ছলছুতোয় বেরিয়ে এসেছি। চল, শীগগির চল।

সুলাল হতভম্বের মত বলে,—কোথা যাব ?

নন্দা হেসে হেসে তার হাত ধরে টান মারে আর বলে,—ন্যাকা আর কি ? চল না আমার সঙ্গে।

সুলাল বলে,—এই ফটক কে দেখবে ?

নন্দা বলে,—কে আর দেখবে ? আজ ছুটি, মদন সর্দারকে বলে দাও।

কিছু দূরে একটা ঘরের দাওয়ায় মদন সর্দার বসেছিল, সুলাল হাঁক দিয়ে বললে, —হেই মদন, ফটকটা দেখিস।

মদন সেই যুগলমূর্তির দিকে তাকিয়ে হি হি করে দাঁত-বের-করা হাসি হেসে বললে,—বহুৎ আচ্ছা!

এণ্টনির অত্যাচারে সর্দারেরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাদের বউ-ঝিদের মান-ইজ্জৎ রাখে নি এণ্টনি। সুলাল সর্দারের মনে পড়ে জুলিয়ার কথা। জুলিয়ার ডাগর ডাগর চোখ দুটি এখনও সে ভোলে নি। পরাণ মাঝির মেয়ে জুলিয়া। জুলিয়াকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল সুলাল। কিন্তু তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। মনে মনে জানে সুলাল এণ্টনিরই এ-কাজ। নন্দাও হাতছাড়া হয়ে গেল। মনে মনে ফোঁস ফোঁস করে সুলাল সর্দার। আর নন্দাকেও সে বুঝে উঠতে পারে নি। কি চরিত্রের যে মেয়েটা! তার মর্ম বোঝাই ভার।

নন্দা ফিস্ ফিস্ করে তার কানে কানে কি কথা বলে! নন্দার কথা শুনে

মাঝে মাঝে সুলালের মুখখানা যেন বিকৃত হয়ে ওঠে। সুলাল বলে,—আজ ব্যাটা এণ্টনিকে শেষ করে দেব।

নন্দা বলে,—না, না! খবরদার সর্দার! আমি যা বলি, তা শোন! এত ঝটপট কাজ করলে সব মাটি করবি।

সুলাল বলে,—জেল হবে, ফাঁসি হবে? তার ভয় আমি করি নে বুঝলি?

নন্দা বলে,—তুই বড় বোকা সর্দার! আগে দিদিমনিকে ওর খপ্পর থেকে বাঁচাতে হবে। তার পর যা পারিস করবি।

সুলাল বলে,—বেশ, বেশ। তাই করব। কিন্তক্ তোর কি হবে বল দেখি?

নন্দা বলে,—আমার আর কি হবে সর্দার! আমি তো তোর সঙ্গে আছি। তুই ওখানটায় লুকিয়ে থাক। আমি ওদিকে যাই।

সুলাল বলে,—ফাঁকি দিবি না তো?

নন্দা হেসে জবাব দেয়,—তার পর দেখা যাবে সর্দার, তোর এত ভাবনা কেন?

সুলাল নন্দার কথামত একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। নন্দা আবার তার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বলে,—বুঝলি, দিদিমনিকে চিনিস তো?

সুলাল বলে,—চিনি বৈ কি? ওই বাঙালী দিদি তো? ডেভিড সাহেবকে যে দেখতে আসে।

নন্দা বলে,—হ্যাঁ। আর সেই অজয় বাবুর কথা মনে রাখিস।

সুলালকে বসিয়ে রেখে নন্দা অন্যদিকে চলে যায়। নন্দার মনে আজ কত ভাবনা। তার চোখ-মুখে তীব্র উন্মাদনা। সুজাতা দিদিমনিকে বাঁচাতেই হবে। এণ্টনিকে মনে মনে ভয়ও করে নন্দা। হোক্ না কালাসাহেব। সাহেব তো বটে, ওরা লোককে খুন করলেও বুঝি ওদের কিছুই হয় না। দেহ দিয়েও মুক্তি নেই, শেকল দিয়ে আটকে রাখে। রক্ত নিঙড়ে নিতে চায় এই এণ্টনি! নিজের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখে নন্দা। উঃ, কি যন্ত্রণা! খামচে মাংস তুলে নিয়েছে। মদ খেয়ে চাবুক মেরেছে পিঠে।

ফোঁস ফোঁস করে ওঠে নন্দা! তার অন্তরে আজ ফণিনী যেন এক শ ফণা

মেলে জেগে উঠেছে। মণীশের কথা ভাবে নন্দা। কি জানি ছোটবেলা থেকে মণীশকে কেন যে তার বড় ভাল লাগে বুঝতে পারে না। বাবুদের কত ছেলেকে দেখেছে নন্দা। মণীশের মত তো কেউ নয়। লাজুক মণীশ; কারও সঙ্গে সে মিশতে চাইত না। নন্দাই কত ছলে, কত ভাবে তাকে ধরতে চেয়েছে, তার মন ভোলাতে চেয়েছে। মণীশ ধরা দেয় নি। ছোটবেলায় ছলছুতোয় মণীশের গা ছুঁতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করত নন্দা। কি যে পুলক জাগত ওর দেহ-মনে। একটি বার চোখে পড়লে চোখ দুটো সার্থক হত। রক্তমাংসে গড়া মানুষ কেমন করে যে এমন নির্বিকার হতে পারে! আশ্চর্য হয়ে যায় নন্দা। সুজাতা জাগাতে পারবে এ পাষাণ-দেবতাকে। সার্থক হবে নন্দার স্বপ্ন। সে আর কিছুই আজ চায় না।

এণ্টনি পেছনে লেগেছে। ডেভিড এসে দাঁড়িয়েছে মাঝখানে। না, না, নন্দা আর কাউকেই সহ্য করতে পারবে না।

এণ্টনির বাংলোতে ঢুকতে গিয়েই গেটের সামনে অজয়কে দেখতে পায় সুজাতা। অজয়কেই দেখেই তার মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠল।

বাংলোর বারান্দায় চার-পাঁচ জন সাহেবী-পোশাকপরা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন; তাঁদের মধ্যে এণ্টনিও ছিল। এণ্টনি প্রায় চীৎকার করে বলে উঠল,—কি সৌভাগ্য! আসুন আসুন, মিস্ রায়!

সুজাতাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এণ্টনি হাত বাড়িয়ে দিল; সুজাতা তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে বারান্দায় উঠে এসে বললে,—আমারও সৌভাগ্য এণ্টনি সাহেব! আজ আপনাদের এ অনুষ্ঠানে যে আসতে পেরেছি, তাতে নিজেই গৌরববোধ করছি। ডেভিড কোথায়?

সুজাতার সাড়া পেয়ে ডেভিড বেরিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল। সুজাতাও নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে,—ডেভিড! তোমার রোগমুক্তির জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ!

তার পর সুজাতা ফুলের তোড়া ডেভিডের হাতে তুলে দিয়ে বললে,—

আজকের এই অনুষ্ঠানের জন্য এণ্টনি সাহেবকেও ধন্যবাদ !

এণ্টনি হাসিমুখে বললে,—না, সুজাতা দেবী! এ অনুষ্ঠান আপনাদের জন্যই সম্ভব হয়েছে; ডেভিডের অসুস্থতার সময় আপনার উপস্থিতি আমাদের বেশি উৎসাহিত করেছে; এর জন্যে আপনিও ধন্যবাদ পাবার যোগ্য।

সুজাতা উত্তর দেয়,—বেশ, তাই যদি হয়, তাও মেনে নিলাম। কিন্তু আমায় এক্ষুনি ছুটি দিতে হবে।

এণ্টনি বললে,—সে কি ? নিমন্ত্রিতদের সকলে এখনও এসে পৌছন নি। আর মণীশই বা কোথা ?

সুজাতা বললে,—তার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি চলে এসেছি। তার কোন খবর আমি জানি না।

ডেভিড বললে,—তুমি জান না সুজাতা ?

সুজাতা উত্তর দেয়,—না, আজ দু দিন হয়, মণীশদা কাঞ্চনগড়ে আসে নি। হয়তো তার অসুখ-বিসুখ করেছে।

এণ্টনি বললে,—সার্টেনলি, তার কোন কিছু হয়েছে। যাক সে পরে দেখা যাবে। আসুন আলাপ করিয়ে দিই,—ইনি আমাদের ফোরম্যান ওয়ার্ড, আর ইনি মিসেস ওয়ার্ড, আর ইনি মিস্টার নিকলসন,—কেমিস্ট।

উপস্থিত সকলের সঙ্গে একে একে পরিচিত হল সুজাতা। কিন্তু তার মনের মধ্যে নন্দার সাবধানবাণী আলোড়ন তুলেছে। সন্ধ্যার আগেই পালিয়ে যেতে হবে।

এণ্টনি বললে,—আসুন, সকলে ভেতরে বসি।

ভেতরে টেবিলের বিচিত্র সজ্জা। খাবার-দাবারের বিপুল আয়োজন। আর এক পাশে নানা ধরনের মদের বোতল ও গ্লাস রয়েছে। সুজাতা ডেভিডের পাশেই বসল। কিছুক্ষণ নানা প্রসঙ্গের আলাপ-আলোচনা চলার পরে সুজাতা বললে, এবার আমায় উঠতে হবে ডেভিড।

ডেভিড বললে,—কেন ? এখনও আসল কাজটা বাকি !

সুজাতা বললে,—না। আমি তো কোন কিছুই স্পর্শ করব না। আমাদের এটা নিয়ম।

এণ্টনি তার কথা শুনে হাসতে হাসতে বলে উঠল,—আপনিও নেটিভদের মত জাতের বিচার করেন মিস্ রায়?

সুজাতার মুখমণ্ডল তার কথায় আরক্ত হয়ে ওঠে। নিজেকে সামলে নিয়ে সুজাতা উত্তর দেয়,—আমিও একজন নেটিভ এণ্টনি সাহেব। আমার গায়ের রঙ্ সাদা, তবু আমি নেটিভ।

সুজাতার এ ইঙ্গিতে কালাসাহেব এণ্টনির ভ্রূ যেন একটু কুঁচকে গেল। এণ্টনি উত্তর দিল,—সাদা কালোর কথা হচ্ছে না মিস্ রায়! খাদ্যাখাদ্যের বিচার আর জাত যাবার ভয় এদেশের অধিকাংশ লোকেরই আছে। কিন্তু আপনার মত শিক্ষিত মেয়ের তা থাকা উচিত নয়, সে-কথাই বলছি।

সুজাতা উত্তর দেয়,—দরকার পড়লে বিচার করব বৈকি এণ্টনি সাহেব! যাকে ঘৃণা করি, যার আচরণ আমার কাছে ঘৃণ্য, সে সাদাই হোক্ আর কালোই হোক্ তার হাতে বা তার ছোঁয়া জিনিস আমরা গ্রহণ করতে পারি না! এবং কোন সৎ লোকই তা গ্রহণ করতে পারে না! আমাদের নেটিভদের এদিক দিয়ে বিচার না করলে আপনি ভুল করবেন। কিন্তু আজ এখানে সে কথা অবান্তর।

ডেভিড এতক্ষণ চুপ করেছিল। সে বললে, তোমার কথা আমি বুঝেছি সুজাতা! কিন্তু এখানে খাদ্য গ্রহণ করতে তোমার কি বাধা আছে?

সুজাতা হাসিমুখে উত্তর দেয়,—বললাম তো, এটা আমাদেব নিয়ম। কাবও কল্যাণকামনায় আমাদের উপবাস করাই নিয়ম। তাই আজ আমি কোন জিনিসই স্পর্শ করব না! এদেশের নিয়ম জান তো ডেভিড! এদেশের লোক প্রিয়জনের কল্যাণকামনায় দেবতার কাছে প্রার্থনা করে, উপবাস করে দেহমনকে শুদ্ধ করে ভগবানের নিকট নিজের আকূতি জানায়।

এণ্টনি হঠাৎ উচ্ছ্বাসভরে বলে ওঠে—ওঃ, কি মার্ভেলাস আইডিয়া! সত্যি মিস্ রায়! আপনি আজ একটা নূতন দিক্ আমাদের চোখের সামনে খুলে ধরলেন।

ডেভিড বললে,—সুন্দর এ আইডিয়া! সত্যি বড় মহান্ এদেশ! বেশ সুজাতা, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে নিশ্চয়ই তোমার আপত্তি নেই? আই থিঙ্ক ইওর ফাদার ইজ অলরাইট্ নাউ।

এণ্টনি যোগ দেয়,—হ্যাঁ, আমরা কিন্তু এত সহজে ছাড়ছি না মিস্ রায়! আপনার মত অতিথি পেয়ে আমরা ধন্য। কিন্তু মণীশ—? মণীশের নিশ্চয়ই কোন অসুখ-বিসুখ হয়েছে!

সুজাতা বলে,—কি করে জানব বলুন? আমার বাবার শরীর ঠিক ভাল নেই। সেজন্য এক্ষুনি আমাকে যেতে হবে। আপনাদের অনুরোধ আমি রাখতে পারলাম না।

এণ্টনি বললে,—না, না, এমন কিছু দেরি হবে না। আমি গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসব।

সুজাতা হেসে উত্তর দেয়,—গাড়ি তো আর নদীটা ডিঙোতে পারবে না এণ্টনি সাহেব?

এণ্টনি বললে,—বেশ তো নদীর ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দেব। সে তো আর কম দূর নয়, মাইল দুয়েক নিশ্চয়ই হবে!

ডেভিডও বললে,—হ্যাঁ, তাই ভাল সুজাতা!

সুজাতা বললে,—এখানে তোমাদের সব অতিথিদের রেখে আমায় পৌঁছে দিতে যাবে? সে ভাল দেখায় না।

এণ্টনি বলে,—না, না, তাতে কি হয়েছে, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব। ডেভিড আছে এখানে।

ডেভিডও এণ্টনির কথায় সায় দিল। এণ্টনি বললে,—তাই হবে। আমি গাড়িটা ঠিক করে আসি। এণ্টনি বাইরে চলে গেল।

আধ ঘণ্টার উপর হয় এণ্টনি আর ফেরে না। সুজাতার মন অস্থির হয়ে উঠল। সুজাতা ডেভিডকে বললে, এণ্টনি তো ফিরে আসছে না। আমি এখন উঠি ডেভিড!

ডেভিড বলে,—কি যে করব, এণ্টনি আবার কোথায় গেল! এখানে সব নিমন্ত্রিতেরা আসছেন। আমি সবাইকে চিনিও না। চল, আমি তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

সুজাতা মনে মনে চায় ডেভিড তার সঙ্গে চলুক, কিন্তু প্রকাশ্যে কোন কিছুই

বলতে পারলে না। সে শুধু বললে,—সে কি হয় ডেভিড! তোমরা কেউ এখানে না থাকলে কি চলে?

ডেভিড বললে,—তাই তো? চল বেরিয়ে দেখি, এণ্টনি কি করছে?

সুজাতা ও ডেভিড বাংলোর সামনের চত্বর পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল! এমন সময় দেখা গেল, কয়েকটি লোক ছুটে এদিকে আসছে। তাদের মধ্যে অজয় ছিল। অজয় এগিয়ে এসে বললে,—সর্বনাশ হয়েছে সাহেব! এণ্টনি সাহেবকে কুলীরা খুন করে ফেলছে।

ডেভিড বললে,—খুন? কেন কি হয়েছে?

এদিকে সুজাতা অজয়ের কথা শুনে নিথর নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছে। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছে না। নন্দার কথা তার মনে পড়ল।

ডেভিডের কথার উত্তরে অজয় বললে,—সাহেব একটা মেয়েছেলেকে চাপা দিয়েছে। তাই কুলীরা ক্ষেপে গেছে।

ডেভিড বললে,—কেমন করে চাপা দিয়েছে?

অজয় বললে,—এণ্টনি সাহেব যেন গ্যারেজে গাড়ি আনতে গেছল; সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে ফিরে আসতে কুলীদেরই একটা মেয়েকে চাপা দিয়েছে এণ্টনি।

ডেভিড বলে,—কি সর্বনাশ! কোথায় এণ্টনি?

অজয় বলে,—আমি ছুটে পালিয়ে এসেছি সাহেব? আমাকেও মারবে ব্যাটারা!

ডেভিড বলে,—কেন? তুমি কি করেছ?

অজয় হাউ মাউ করে উত্তর দেয়,—কি আর করব সাহেব? আই এম এ জমিন্দারর্স সন; মাই গ্র্যাণ্ড ফাদার ইজ এ বিগ্ জমিন্দার। শুধু তোমাদের এই খনির মজুর যোগান দিয়েছি এই আমার অপরাধ। এণ্টনি আমায় ভালবাসে কি না!

সুজাতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অজয়ের দিকে তাকায়! অজয়ের মুখ আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

ডেভিড বলে,—চল কোথায়, দেখে আসি। সুজাতা, তুমি এখানে দাঁড়াও; না এখানে নয়, বাংলোর ভেতরে যাও।

সুজাতা বলে,—না, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

ডেভিড বিস্মিত হয়ে বলে,—তুমিও যাবে ?

সুজাতা বলে,— হ্যাঁ আমি যাব।

ডেভিড বলে,—তুমি দাঁড়াও, বন্দুকটা নিয়ে আসি।

সুজাতা বলে,—বন্দুক আনতে হবে না ডেভিড। তারা তোমার কোন অনিষ্ট করবে না।

ডেভিড বলে,—কিন্তু এণ্টনিকে উদ্ধার করতে হবে তো।

সুজাতা বলে,—আমি বলছি বন্দুকের দরকার নেই। চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

অজয় হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে। সুজাতা তার দিকে ফিরে বলে, আপনি এখানে থাকুন অজয়বাবু, আপনাকে দেখলে ওরা ক্ষেপে উঠবে। বরং অতিথিদের আপনি দেখুন।

অজয় কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দেয়,—তারা যদি এদিকে আসে—

সুজাতা ধমক দিয়ে বলে,—আপনি এত ভীরু অজয়বাবু! জমিদারের ছেলে তো এত ভীরু হয় না। যান্, ভেতরে যান্। চল ডেভিড!

ডেভিড আর সুজাতা ছুটে চলল। চৌমাথার মোড়ে হল্লা হচ্ছে! হৈ-হৈ আওয়াজ! সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। চৌমাথার আশে-পাশের ঝোপজঙ্গলের কাছে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে।

এণ্টনি যে গাড়িখানা নিয়ে আসছিল, সেখানা একদিকের খাদে পড়ে গেছে; রাস্তার বাঁ পাশে রক্তাক্ত এক নারীর দেহ; এখনও প্রাণ আছে। সেই দেহটি ঘিরে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। ডেভিডকে দেখে তারা প্রথমে হৈ-হৈ করে উঠল; কিন্তু হঠাৎ তাদের মধ্যে এক জন ধমকে বলে উঠল,—হেই খবরদার। আমাগোর দিদিমনি আইছে।

এগিয়ে এল বলাই সর্দার। সে এগিয়ে এসে বললে, দিদিমনি, এণ্টনি সাহেব নন্দারে মাইর‍্যা ফালাইছে।

সুজাতা স্তম্ভিত হয়ে যায়। তার পর উৎকণ্ঠার স্বরে বলে,—কি সর্দার? নন্দাকে মেরে ফেলেছে!

বলাই বলে,—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। ওই তো পইড়া রইছে। এখনও জানটা রইছে দিদিমনি! এখনও জানটা রইছে।

সুজাতা বলে,—এণ্টনি কোথায়?

ডেভিডও উৎকণ্ঠার স্বরে জিজ্ঞাসা করে,—এণ্টনি কোথায়?

বলাই উত্তর দেয়,—সাহেব তো উল্টে পইড়া গেছল। তার পর কি যে হইয়া গেল দিদিমনি! হুই যে, ওইদিগে ছুইট্যা পালাল এণ্টনি। আর যত্তেক লোক সব হুইদিগে ছুইট্যা গেছে দিদিমনি! এণ্টনিকে আইজ মাইরা ফালাইব।

ডেভিড বললে,—চল, কোন্ দিকে দেখিয়ে দাও।

বলাই বলে,—তুমি যেয়ো না সাহেব।

এমন সময় বিপদসূচক ঘণ্টি বেজে উঠল।

ডেভিড ও সুজাতা দেখলে কয়েক জন সাহেব দলবল নিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে এদিকে আসছে। তারা এসে ডেভিডের কাছে সব কথা শুনে যেদিক থেকে হৈ-চৈ শোনা যাচ্ছিল, সেদিকে এগিয়ে গেল।

সুজাতা ছুটে গিয়ে নন্দাকে জড়িয়ে ধরে বললে,—এ কি হল নন্দা? কেমন করে তুমি গাড়ির তলায় পড়লে?

নন্দা মৃত্যুযন্ত্রণা ভুলে গিয়ে কাতর কণ্ঠে জবাব দেয়,—এণ্টনি আমাকে দেখতে পেয়ে পিছু নিয়েছিল দিদিমনি! আমাকে ধরতে চেয়েছিল। তাই ধরা দিলাম দিদিমনি; তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে তার গাড়ির তলায় চাপা পড়ে গিয়ে শেষ ধরাই দিলাম। এ ছাড়া তো কোন উপায় ছিল না ভাই!

সুজাতা অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলে,—এ কি করলে নন্দা?

নন্দা জড়িত স্বরে কি যে বলে তার সবটুকু বোঝা গেল না। শুধু মণীশের নামটি শুনতে পায় সুজাতা।

ইতিমধ্যে পুলিস ও ডাক্তার এসে হাজির হল। ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল অনেক লোক। সেই ভিড় ঠেলে হঠাৎ মণীশও এসে দেখা দিল। নন্দার এ অবস্থা দেখে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কিন্তু সুজাতার পাশে ডেভিডকে দেখে তার অন্তর্জগতে যে কি আলোড়ন ঘটল, মণীশ তা বুঝতে পারে না। এ কি ঈর্ষা?

মণীশ সুজাতাকে বললে,—তুমি এখানে কেন ?

সুজাতা উত্তর দেয়,—এখানেই ছিলাম, তাই শুনেই এসেছি। নন্দা যে ছটফট করছে মণীশদা! এক বার কাছে এসে দেখে যাও।

মণীশ উত্তর দেয়,—আমি দেখে আর কি করব ? তুমি সরে এস। এক্ষুনি ডাক্তার দেখবেন।

সুজাতা বললে,—হ্যাঁ যাচ্ছি। তুমি একটি বার কাছে এস মণীশদা! তোমায় দেখতে চেয়েছিল ; এখনও জ্ঞান আছে।

মণীশ এ অবস্থায় কি করবে ঠিক করতে পারছিল না। সুজাতা এগিয়ে এসে তার হাত দুটি ধরে প্রায় টেনেই নন্দার কাছে নিয়ে এল। মণীশ দাঁড়িয়ে রইল। সুজাতা হাঁটু গেড়ে নন্দার কাছে বসে পড়ল। বিড বিড করে কি যেন বলছে নন্দা। মণীশের মন সংকোচে ভরে উঠেছে। তবু এই ব্যভিচারিণী মেয়েটার শোচনীয় মৃত্যুর দৃশ্য তাকে বিচলিতই করল। এক দৃষ্টে নন্দা যেন তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে দিল নন্দা।

মুহূর্তের মধ্যে সুজাতা মণীশের ডান হাতটা টেনে নিয়ে নন্দার হাতে দিয়ে বললে,—তুমি কি যে মণীশদা! এ মৃত্যুপথযাত্রিণীকে স্পর্শ করলে তোমার কোন পাপ হবে না।

হতবাক মণীশ। এত লোকের সামনে সুজাতার এই আচরণ তাকে সংকোচ ও লজ্জায় ভরে দিল। সে দেখল,—প্রসন্নতার আভাস ফুটে উঠেছে নন্দার মুখে। ধীরে ধীরে চোখ বুজলে নন্দা। পুলিস এদিক-ওদিকের সকল লোককেই সরিয়ে দিলে। ডেভিড বললে,—তোমরা সরে এস মণীশ! ডাক্তার দেখবেন।

ডাক্তার এসে নন্দাকে পরীক্ষা করে বললেন,—সব শেষ হয়ে গেছে।

সুজাতার চোখে অশ্রু নামে। মণীশেরও চোখ দুটি ছল ছল করছে। ডেভিড বললে,—মেয়েটি নিশ্চয়ই তোমাদের চেনা-জানা! এণ্টনি একটা রাসকেল। চল, আমরা এখান থেকে সরে যাই।

পুলিস নন্দার দেহ ঘিরে থাকে। নন্দার বাপ ও ভাই তত্ক্ষণে খবর পেয়ে ছুটে এল। নন্দার বুড়ো বাপ তার রক্তাক্ত দেহের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

করুণ আর্তনাদে বাতাস ভরে উঠল।

মণীশ বললে,—ডেভিড! এখন সুজাতাকে বোধ হয় ছেড়ে দিতে পার?

ডেভিড বললে,—হ্যাঁ! তার জন্যই এ কাণ্ডটা ঘটল। তোমরা যাও সুজাতা।

সুজাতা বললে,—আমার জন্যেই কাণ্ডটা ঘটল, তা ঠিক বটে। কিন্তু এণ্টনির কি হল?

ডেভিড বললে,—তার যা হবার তা ঠিকই হবে সুজাতা! তোমরা যাও।

সুজাতা মণীশকে বললে,—তুমি যে আসবে তা আমি ভাবি নি। কেন এত দেরি করলে?

মণীশ বললে,—হ্যাঁ দেরি হয়ে গেল। কিন্তু ব্যাপারটা কি? তোমার জন্যেই শেষে আমাকে আসতে হল। এখানকাব স্টেশনের গেটে এসেই শুনলাম হৈ-হৈ কাণ্ড। সবাই এদিকে ছুটে আসছে। শুনলাম,—এণ্টনি সাহেবকে কুলীরা মেরে ফেলেছে। আবার কেউ কেউ বলছিল, কুলীদের একটা মেয়েকে নাকি এণ্টনি মেরে ফেলেছে। তাই কুলীরা ক্ষেপে উঠেছে।

ডেভিড বললে,—আমরাও এর বেশি কিছুই জানি নে মণীশ। তবে এটা নিশ্চয় যে মোটর অ্যাক্সিডেণ্টে এই মেয়েটা মারাত্মক আঘাত পেয়েছে।. আর এণ্টনি এই অ্যাক্সিডেণ্টটা ঘটিয়ে প্রাণের দায়ে পালিয়েছে। ও একটা শয়তান মণীশ। ও একটা শয়তান।

মণীশ বললে,—কি বলছ তুমি? কুলীরা তার পিছু নিয়েছে; মেরে ফেলবে তাকে।

ডেভিড বললেন,—এখন বুঝতে পারছি সে একটা মতলব হাসিল করতে চেয়েছিল। অ্যাকসিডেণ্টটা ঘটে সব গোলমাল হয়ে গেছে। তোমরা এখন যাও।

সুজাতা বললে,—হ্যাঁ, আমরা আসি। বাবা নিশ্চয়ই আমার জন্য চিন্তা করছেন।

মণীশ বললে,—হ্যাঁ। আমি আসতাম না। তিনিই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

ডেভিড বললে,—এণ্টনির উপর এখানকার লোকেরা ক্ষেপেই আছে। এবার সুযোগ পেয়েছে। এই অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটায় তারা প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেয়েছে।

সুজাতা বললে,—আমারও তাই মনে হয় ডেভিড!

ডেভিড বললে,—কি আর করা যায়? তোমরা এখন যাও।

মণীশ ও সুজাতা ডেভিডের নিকট বিদায় নিয়ে পাহাড়ীপথে নামতে লাগল। বস্তির অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে; এক এক করে তারায় আকাশ ভরে উঠেছে; পেছনে পাহাড়ের গায়ে জ্বলজ্বল করছে অজস্র আলো। কিন্তু তারা দুজনে চলেছে অন্ধকার পথে; সে পথে আলো নেই। দূরে নদীগর্ভে দু-একখানি নৌকায় আলো দেখা যাচ্ছে।

সুজাতা বললে,—জান মণীশদা! কেন নন্দা প্রাণ দিলে?

মণীশ বললে,—অ্যাক্সিডেণ্টে।

সুজাতার মুখে করুণ হাসি ফুটে উঠল। সে আর্দ্রকণ্ঠে বললে,—না! তুমি এখনও বোঝ নি, হয়তো কোন দিন বুঝতেও পারবে না!

মণীশ বললে,—কি বুঝতে পারব না? মেয়েটা অসৎ প্রকৃতির ছিল, এরকম মেয়েদের অমন করেই প্রাণ যাওয়া ভাল।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সুজাতা উত্তর দেয়,—হ্যাঁ, অমন করে প্রাণ দিয়েই তোমাদের গাঁয়ের এক অসৎ মেয়ে নন্দা আমাকে চরম বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

মণীশ ব্যগ্রকণ্ঠে বললে,—তোমায় বাঁচিয়েছে? তুমি তো এ গাড়িতে ছিলে না! তোমার তো কোন বিপদ হয়েছিল বলে শুনি নি!

সুজাতা উত্তর দেয়,—না, আমি এ গাড়িতে ছিলাম না। কিন্তু গাড়িটা আমার জন্যেই আনছিল এণ্টনি। আর এ গাড়িতে আমাকে তুলতে পারলে কি হত, তা আগে থেকে ভেবেই নন্দা গাড়ির তলায় পড়ে প্রাণ দিল।

মণীশ উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য মেশানো স্বরে বললে,—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না সুজাতা! তোমায় এসব কথা কে বললে?

সুজাতা বললে,—সব কথা আমিও জানি নে। কিন্তু এণ্টনির পার্টিতে যাবার পথে নন্দাই আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল। এমন কি সেখানে কোন কিছু মুখে দিতেও বারণ করে দিয়েছিল।

মণীশ জিজ্ঞাসা করে,—কেন, কেন বারণ করেছিল?

সুজাতা বললে,—তাও তোমায় বুঝিয়ে বলতে হবে মণীশদা! তুমি এণ্টনির চরিত্র এখনও বুঝতে পার নি? ছলছুতোয় সে মেয়েদের সর্বনাশ করে মণীশদা!

মণীশ বললে,—হ্যাঁ, তা বিশ্বাস করি। কিন্তু নন্দাকে সে সেদিন ছেড়ে দিলে কেন?

সুজাতা বললে,—নন্দাকে সে বিশ্বাস করত না মণীশদা! নন্দা বাংলোয় উপস্থিত থাকলে হয়ত বাধা পড়বে এই ভেবে নন্দাকে ছুটি দিয়েছিল।

মণীশ গম্ভীর হয়ে রইল। সুজাতা আস্তে আস্তে নন্দার সঙ্গে দেখা হবার সময় থেকে যা যা ঘটেছিল, তা মণীশকে সবিস্তারে বললে।

মণীশ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, একটু তাড়াতাড়ি চল সুজাতা! মাষ্টার মশাই তোমার জন্য ছটফট করছেন।

রাত্রে সুজাতাকে সর্বেশ্বরের আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে মণীশ আবার বাড়ি ফেরার জন্য প্রস্তুত হল।

সর্বেশ্বর বললেন,—তা হলে আর দেরি কোর না। কাল একবার এসো মণীশ! তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

মণীশ বললে,—নিশ্চয়ই কাল আসতে চেষ্টা করব মাষ্টার মশাই!

সর্বেশ্বর বললেন,—আসবে বাবা! আমার মনে হয়, আমি আর সেরে উঠব না, তার আগে আমার যা-কিছু কাজ তা শেষ করে যেতে হবে।

মণীশ বললে,—এ কি বলছেন মাষ্টারমশাই! আপনি নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবেন।

সর্বেশ্বর হাসিমুখে বললেন,—তবুও দিন ফুরিয়ে এসেছে, অনেক কাজ বাকি, তার হিসাবনিকাশ করতে হবে মণীশ!

সর্বেশ্বরের কথার কোন উত্তর মণীশের মুখে যোগায় না। ক'দিন ধরেই সে লক্ষ্য করছে সর্বেশ্বর মাষ্টারের আগের সে উদ্দীপনা আর নেই; জ্বলন্ত প্রদীপ যেন নিভে আসছে। নৈরাশ্য ফুটে ওঠে তাঁর প্রতিটি কথায়। মণীশ বললে,—তা হলে কাল আসব মাষ্টার মশাই! এখন আসি।

সর্বেশ্বর বললেন,—হ্যাঁ এসো বাবা! কিন্তু সুজাতা কোথায়?

মণীশ বললে,—সে ভেতরেই আছে। আমি ডেকে দিচ্ছি।

সর্বেশ্বর চুপ করে কিছুক্ষণ থেকে বললেন,—সুজাতার জন্যেই আমার যত ভাবনা বাবা! আমি কিছুতে শান্তি পাচ্ছি না?

মণীশ দাঁড়িয়ে ছিল; সে সান্ত্বনার সুরে বললে,—তার জন্যে ভাবনার কোন কারণ নেই মাষ্টার মশাই! আসি এখন, কাল এসে আপনার কথা শুনব।

মণীশ সর্বেশ্বরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এদিক্-ওদিকে তাকিয়ে সুজাতার ঘরের সামনে গিয়ে দেখলে সুজাতা এক কাপ দুধ নিয়ে বেরিয়ে আসছে। মণীশকে দেখে সুজাতা বললে, তুমি চলে যাচ্ছ মণীশদা!

মণীশ বললে,—হ্যাঁ। মাষ্টার মশাই তোমায় ডাকছেন।

সুজাতা বললে,—বাবার জন্য দুধ নিয়ে আমি তাঁর ঘরেই যাচ্ছি। কিন্তু কাল একবার আসবে মণীশদা!

মণীশ বললে,—হ্যাঁ নিশ্চয়ই আসব। কিন্তু দেখো মাষ্টার মশাইকে ওখানকার এত কথা এখন বলবে না; তা হলে এই দুর্বল শরীরে তাঁর মনের উপর চাপ পড়বে।

সুজাতা উত্তর দেয়,—হ্যাঁ, আমিও তাই ভেবেছি। যা জেনেছেন, তাই ঢের। শুধু একটা অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে; এক জন মেয়েছেলে চাপা পড়েছে,—এই তো তাঁকে বলা হয়েছে?

মণীশ বললে,—হ্যাঁ। এর বেশি কিছু আর বলতে যেয়ো না।

সুজাতা বললে,—তুমি চলে যাও মণীশদা, রাত হয়ে যাচ্ছে।

মণীশ পাহাড়ী পথে পা বাড়াল; নীচে নেমেও পেছন ফিরে দেখে—সুজাতা তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে তারই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। মণীশের অন্তরে আজ উঠেছে উত্তাল তরঙ্গ; নন্দা মরেছে। কিন্তু জানিয়ে গেছে নন্দা মণীশকে ভালবাসে। তার জন্যই মরেছে নন্দা। মণীশ ভাবে, কেন এমন হয়? যা অসম্ভব তাকে পাবার জন্য মানুষ কেন এমন করে নিজের প্রাণ দেয়? নন্দা নিশ্চয়ই জানত যে মণীশ তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, তবু নন্দা তারই জন্য আত্মবলি

দিয়েছে। না, তার জন্য নয়, সুজাতাকে বাঁচাবার জন্য নন্দা প্রাণ দিয়েছে। সুজাতার সঙ্গে মণীশের কি সম্পর্ক? তার সঙ্গে সুজাতার সম্পর্ক কল্পনা করে নন্দা আত্মাহুতি দিয়েছে। কি চেয়েছিল নন্দা? চেয়েছিল,—মণীশ যাকে ভালবাসে তাকে নিয়ে সুখী হোক্?—তাই কি চেয়েছিল নন্দা? না, না, এর চেয়েও মহান্ নন্দার মন, সে চেয়েছিল যে মণীশকে ভালবাসে সে সুখী হোক্।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন, ভাবনার পর ভাবনা,—চিন্তার ঢেউ খেলে যায়। নন্দা তাকে চেয়েছিল, নন্দা তাকে ভালবেসেছিল। ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, নন্দার প্রতিটি আচরণ মণীশের চোখের সামনে আজ প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। সেই দুষ্টু ছোট মেয়েটি যে ছুতোনাতায় নানা ছলে মণীশকে উত্যক্ত করত, সেই নন্দা যেন অন্ধকার পথে তারই সামনে মুচকি হেসে মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছে, আবার চোখের ইঙ্গিতে কি যেন বলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মণীশ যেন শুনতে পাচ্ছে নন্দার কণ্ঠস্বর,—দাদাভাই! সামলে চল।

মণীশের পা আর চলে না। লোকাল বোর্ডের বড় রাস্তা ধরে চলেছে মণীশ! চন্দনপুর পার হয়ে মাঠের মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা গিয়েছে। দু-পাশে ঘন নল-খাগড়ার বন। এই মাঠটা পার হলেই তাদের গ্রাম। মাঠের মাঝামাঝি এসে আজ হঠাৎ মণীশের মনে কেমন যেন ভয় জাগল। নলখাগড়ার বনের ভেতর থেকে যেন খিল খিল করে কে হাসছে! আকাশে তারা, আর পায়ের নীচে আঁকাবাঁকা উঁচুনীচু পথ; আশেপাশে কোন বসতি নাই। পথেও লোক-চলাচল বন্ধ হয়েছে। অন্ধকারে কি একটা পাখি মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। দূর হতে ভেসে আসছে শকুনির কর্কশ ও বীভৎস আওয়াজ—হিঃ-ই-হিঃ-ই-হিঃ-ই।

এ পথ তো নূতন নয়। রাতও বেশি হয় নি। অথচ মনে হচ্ছে নিঝুম নিশা। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে যায় মণীশ; কিন্তু পারে না। তার পা দুখানি যেন অসাড় হয়ে আসে। কিন্তু একি! অদূরে একটা প্রকাণ্ড বটগাছে এক নারীমূর্তি ঝুলছে! গাছের শাখা-প্রশাখায় উড়ছে যেন শাড়ির পতাকা। রক্ত ঝরছে সে নারীমূর্তির গা বেয়ে। শাড়ির পতাকা থেকেও রক্ত ঝরছে। হতভম্ব মণীশ।

এ কি দেখছে মণীশ? তার কি মতিভ্রম হল? ওই যে কিশোর বৈরাগীর

আখড়ায় প্রদীপ জলছে। গাঙের বাঁকে কিশোর বৈরাগীর আখড়া। মাঠ পার হয়ে এসেছে মণীশ। গা দিয়ে তার ঘাম ছুটছে; টুং-টুং-রিং-রিং মধুর আওয়াজ কানে ভেসে আসছে। মধুর কণ্ঠের সেই করুণ গীতি—

এ দেহ থাকিতে পাব না বঁধুরে,
জানি রে ললিতে জানি।
কুলমানে বাঁধা জীবন যৌবন
শতেক বাধা রে মানি॥
বাতাসে মিশিয়া পরশ করিব
থাকিবে না কোন বাধা।
জাতিকুলমান এড়াইতে সখি,
মরিবে আজি রে রাধা॥
যার অঙ্গে তার দেহ মিশাইবে
তাহারি অঙ্গেতে মিশি
পুরাইব মোর জনমের সাধ
পুলকে কাটিবে নিশি।
ললিতে, পুলকে কাটিবে নিশি॥

মণীশের ভয় কেটে যায়। না, ভুল করেছে সে। নারীদেহ নয়, বটগাছের ঝুরি নেমেছে; চিক্‌চিক্ করছে চাঁদের আলোয়। রক্ত নয়, মনের ভ্রম। আজ রক্ত দেখে এসেছে মণীশ। নন্দার রক্তাক্ত দেহ, আর তার পরনের গঙ্গা-যমুনা শাড়ির কথা উঁকিঝুঁকি মেরেছে মনের কোণে।

বৈরাগীর গানের করুণ রাগিণী মণীশকে আরও উতলা করে দেয়। নন্দার কথা মনে পড়ে। মরে গিয়ে নন্দা তার সাধ পূর্ণ করবে? কিশোর বৈরাগীর আখড়ার দিকে এগিয়ে যায় মণীশ; একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে দিন কাটায় কিশোর বৈরাগী। কোন কোন দিন গাঁয়ের পথেও বৈরাগীকে দেখা যায়; ভিক্ষে করে বৈরাগী। কিন্তু এ গভীর রাত্রেও গান! বৈরাগী কি মনের কথা জানে?

কিশোর দাসের আখড়া। আখড়া বলতে যা বোঝায়, এখানে তার কোন লক্ষণই নেই। গাঙের বাঁকে গাঁয়ের শেষ প্রান্তে প্রকাণ্ড এক বটগাছ। কত-কালের তা কে জানে! তার শাখাপ্রশাখা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। আর নেমেছে সারি সারি ঝুরি। তপোমগ্ন ঋষিব জটাজাল যেন মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে। দূর থেকে মনে হয়, অজস্র অজগর উর্ধ্বমুখী হয়ে জড়িয়ে রয়েছে সে মহাপাদপকে। তারই ভেতরে কিশোর বৈরাগীর আস্তানা। বটঋষির জটাজালই রচনা করেছে সে আখড়া। তার পাদপীঠে জড়ানো আর কুণ্ডলীপাকানো অগণিত শিকড়ের সুন্দর চত্বর রচনা করেছে কিশোর বৈরাগীর আসন আর শয্যা।

সবাই বলে সিদ্ধপুরুষ কিশোর বৈরাগী। তার একতারার গান সংসার-জ্বালা জুড়িয়ে দেয়, পশুপক্ষী মুগ্ধ হয় তার রাগিণীতে। কোথায় বাড়ি, কোথায় তার ঘর, কোথা থেকে যে এসেছে কেউ জানে না! কাউকে কোন পরিচয় দেয় নি কিশোর বৈরাগী।

কেউ কেউ বলে ডাকাত ছিল কিশোর,—কিশোর ডাকাত। রত্নাকরের মতই পেয়েছে দেবতার সাক্ষাৎ। কত গান শুনেছে মণীশ, কিন্তু এমন করে কিশোর বৈরাগীর গান কোন দিন তো তার মন উতলা করে দেয় নি! তারই মনের কথা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এ গানে।

রাধা! রাধা! রাধা!—গান থেমে যায়। শুধু সুরের লহর ছোটে আকাশে-বাতাসে। চুপচাপ এসে বৈরাগীর কাছে দাঁড়ায় মণীশ; মাথায় ধবধবে সাদা চুল, মুখে দাড়ি। চুলগুলো দমকা হাওয়ায় মাঝে মাঝে এলোপাতাড়ি ওড়াউড়ি করছে। বাবাজী নির্বিকার, একতারায় তার হাত চলছে! কোন দিকে কোন খেয়াল নেই।

ভয়ে কাঁপছে মণীশ; কৌতূহল আর আতঙ্ক এখন যেন তাকে পেয়ে বসেছে। চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে যেন বৈরাগী। বাড়ির পথে একি বিড়ম্বনা! আজ যেন মণীশকে ভূতে পেয়েছে।

হঠাৎ বৈরাগীর যেন ধ্যানভঙ্গ হল। মণীশের দিকে ফিরে বললে, এ কি বাবা! এত রাত্রে রাধার খোঁজে বেরিয়েছ?

বৈরাগীর স্মিত কণ্ঠ; চোখে-মুখে অপূর্ব হাসির ছটা। মণীশ ভাবল,—বিদ্রূপ

করছে বৈরাগী।

বৈরাগী আবার বললে,—ভয় পেয়েছ? ভয় পেলে চলবে কেন? রাধা যে ছড়িয়ে আছে, মিশে আছে, আকাশে-বাতাসে, পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, গাছপালায়। আমায় ছুঁয়ে যায়, কানে কানে কত কি বলে যায়, তবু ধরতে পারি না। তুমিও পারবে না।

বৈরাগী হাসে। মণীশ ভাবে, পাগল এই বৈরাগী।

বৈরাগী বলে,—ভয় পেয়েছ? এগিয়ে দিয়ে আসি। ভয় পেলে চলবে কেন? ভয় পেলে কি আর রাধাকে পাবে? চল বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

মণীশ বলে,—না, আমি একাই যেতে পারব।

বৈরাগী বলে,—বেশ যাও। আমি রাধাকে খুঁজি, দেখি ধরতে পারি কি না? আমার গান শুনলে, আমার গলার আওয়াজ পেলে ছুটে আসত রাধা, সে রাধা আজ লুকোচুরি খেলছে, তাকে ধরতে পারছি নে।

মণীশ বিস্মিত হয়ে উত্তর দেয়,—কে রাধা? কোথায় সে রাধা?

বৈরাগী বললে—ঐ বললাম না, আকাশে-বাতাসে মিশে রয়েছে; আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, কানে কানে কত কি বলে যাচ্ছে, কিন্তু ধরা দিচ্ছে না।

পাগল; পাগল এ বৈরাগী!—মণীশ মনে মনে ভাবে, পাগল না হলে এরকম থাকে! তার পর বললে,—এ রাধাকে তুমি ধরতে পারবে না বাবাজী! আমায় দেখিয়ে দাও, আমি ধরতে পারি কি না দেখি।

বৈরাগী বললে,—না তুমি পারবে না। ভুল করে বসবে তুমি। আমার রাধাকে ধরতে গিয়ে তোমার রাধাকে হারাবে। আর সত্যি কথা বলতে কি, আসল রাধা ধরা দেয় না ভাই। আসল রাধা দেহ আর যৌবন নিয়ে ধরা দেয় না। জীবন যৌবন তো ফাঁকি, তাই বাতাসে মিশে গিয়ে সে ফাঁকির হাত থেকে রেহাই পায় ভাই! আমার রাধা নিজেই রেহাই পেয়েছে, কিন্তু আমাকে রেহাই দেয় নি। সারা জীবন তাকে খুঁজে মরছি, ধরা দিয়েও ধরা দিচ্ছে না।

মণীশের কৌতূহল বাড়ে। সে প্রশ্ন করে,—তোমার রাধা? তার কি হয়েছে বাবাজী?

বৈরাগী করুণ হাসি হেসে বলে,—রাধা? হ্যাঁ রাধাই ছিল তার নাম। কি জাত কে জানে? ভিক্ষে করে ঘুরে বেড়াত শহরের রাস্তায়। তাকে ধরে এনে বন্দী করেছিলাম আমার ঘরে। পোষ মেনেছিল রাধা। আমি একতারায় সুর দিতাম আর সে মুগ্ধ হয়ে শুনত। আকাশের বিজুলি খেলত আমার ঘরে।

মণীশ জিজ্ঞাসা করে,—তার পর কি হল বাবাজী?

বৈরাগী উত্তর দেয়,—সুখেই কাটল তিন বছর। দিনে একতারা বাজিয়ে ভিক্ষে করি। কাজকর্ম আমার কোন দিনই ভাল লাগত না। বংশীদাসের বংশ আমরা। নামডাক ছিল আমাদের। আমাদের লাঠি-সড়কির সামনে টেঁকে এমন সাধ্যি কারও ছিল না।

মণীশ বলে,—শুধু ভিক্ষে করে কি দিন চলত বাবাজী?

হেসে উত্তর দেয় কিশোর বৈরাগী,—সে সব শুনে তোমার কি লাভ বাবা! তিন দিনের পথ রণ-পায় চড়ে তিন ঘণ্টায় চলে যেতাম। গহীন রাতে রাধা ঘুমিয়ে পড়লে বের হতাম, আবার ফিরে আসতাম ভোরের আগে। হাতে থাকত রামদাখানা।

মণীশ ভাবে, তা হলে কিশোর দাস নিশ্চয়ই ডাকাত ছিল।

মণীশ চুপ করে থাকে। বৈরাগী বলে, কি ভাবছ বাবা! ডাকাত আবার সাধু হল কি করে এই তো?

মণীশ উত্তর দেয়,—নিশ্চয়ই কোন দেবতার কৃপা তুমি পেয়েছ।

হো হো করে হেসে উঠল কিশোর বৈরাগী। তার পরে বললে,—হ্যাঁ কৃপা পেয়েছি বৈ কি? কিন্তু দেবতার নয় বাবা! আমার রাধার কৃপা পেয়েছি।

মণীশ বিস্ময়ের কণ্ঠে বলে,—রাধার কৃপা?

বৈরাগী বলে,—হ্যাঁ বাবা! আমার রাধাই ব্রজের রাধাকে চিনিয়ে দিলে, রাধা-তত্ত্বে দীক্ষা দিলে আমার রাধা।

বৈরাগীর চোখ দুটি ভিজে উঠল। মণীশ বললে,—থাক বাবাজী, সে কথা। আমি এখন আসি।

বৈরাগী বললে—শুনেই যাও বাবা! কেউ জানে না যে কথা, সেকথা

আজ শুনে যাও। হয়তো আর কাউকে বলবার সুযোগ আমার হবে না। রাধা আমার হারিয়ে গেল ; নানা গাঁয়ে, হাটে বাজারে একতারা বাজিয়ে ঘুরেছি, রাধার নাগাল আমি পাই নি। কিশোর ডাকাত আজ কিশোর বৈরাগী, তবুও তার বুকের আগুন নেভে নি।

বৈরাগী বলতে থাকে,—আমারই সাকরেদ ছিল কানাই। রণ-পা পরে আমারই সঙ্গে সঙ্গে ছুটত সে। রাধারই সমবয়সী হবে। কালো কেষ্ট ঠাকুরের মত তার চোখ-মুখ। ডাগর ডাগর চোখ দুটি তার যেন কথা বলত। সেই কানাই-ই করলে সর্বনাশ।

মণীশ বলে,—কি করলে কানাই ?

বৈরাগী বলে,—কি আর করবে ? মন চুরি। কানাইর সঙ্গে রাধার মেলামেশা হাসিখুশি কি জানি কেন আমার ভাল লাগত না। তবুও রাধাকে অবিশ্বাস আমি করতে পারতাম না। আর কানাইকেও কিছু বলতে পারি নি। ভাবতাম হয়তো ভুল করছি। কিন্তু তাদের দু জনকেই হারালাম।

মণীশ জিজ্ঞাসা করে,—তারা বুঝি পালিয়ে গেল ?

হঠাৎ বৈরাগীর চোখ দুটি যেন জ্বলে উঠল ; তার পর একটু শান্ত হয়ে জবাব দিল,—না, না, ঠিক বুঝতে পারি নি। কি যে হল তাদের, কোথায় লুকোল তারা ?

মণীশ বললে,—নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে।

হেসে উঠল কিশোর বৈরাগী ; সে বললে, লুকোয় নি বাবা! আমার রাধা লুকোচুরি খেলছে। যেদিনের কথা বলছি,—রাধার শরীরটা ভাল ছিল না। সেদিন সন্ধ্যা হতে না হতেই অচেতনের মত সে ঘুমিয়ে পড়ল। কানাই বললে, সে আজ আর বের হবে না। আমি একাই বের হলাম। গহীন রাতে ফিরে এলাম। কিন্তু এ কি দেখলাম ? রাধার কোলে মাথা রেখে কানাই শুয়ে আছে। রামদাখানা ঝিলিক মেরে উঠল। আমার চোখটা ধাঁধিয়ে গেল। কানাইকে আর দেখতে পেলাম না ; তার পিছু পিছু ছুটলাম। ফিরে এসে দেখি, রাধাও নেই।

রামদা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। পাগলের মত খুঁজে বেড়ালাম; রাধা কোথায় উধাও হয়ে গেল! একতারা বাজাই, আর দেশে দেশে ঘুরি। ভিখারীর মেয়ে রাধাকে যদি ভিখারীদের মধ্যে খুঁজে পাই! কিন্তু না, না, সে সত্যি মিশে গেছে আকাশে-বাতাসে।—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কিশোর বৈরাগী।

মণীশ বলে,—মিছামিছি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ বাবাজী!

বৈরাগী উত্তর দেয়,—জানি রে বাবা জানি! রক্তমাংসের দেহ তাকে আটকিয়ে রাখতে পারে নি; আমার রাধা আমাকে ছেড়ে যায় নি। একতারায় সুর দিলেই তার হাসি আমার কানে বাজে, সে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমি কিন্তু তাকে ধরতে পারি নে, তবুও বাজাই।

কিশোর বৈরাগীর কথা শুনে মণীশ বিস্মিত হয়। মনে মনে প্রশ্ন জাগে,—এর নাম প্রেম? এর নাম ভালবাসা?

বৈরাগী বলে,—রাধার প্রেম সব ভুলিয়ে দেয় বাবা! সব ভুলিয়ে দেয়। ও ফাঁদে পা দিলে আর নিস্তার নেই।

মণীশ কোন উত্তর দিতে পারে না। কিশোর বৈরাগীর কথাগুলি তার মনে নূতন অনুভূতি জাগিয়ে দিয়েছে। সে ভাবে আর নয়, আর নয়। সন্ধ্যাও সেদিন বলেছিল,—তুই পালিয়ে যা মণীশ। তুই পালিয়ে যা। কেন এরকম করে বলেছিল সন্ধ্যা?

বৈরাগী বলে,—অনেক রাত হল বাবা! এত রাতে কি বেরোতে আছে? বাড়ি যাও।

মণীশ বৈরাগীকে প্রণাম করে গাঁয়ের পথে পা বাড়ায়।

যজ্ঞেশ্বরের মেয়ে সুনন্দা মারা গেছে।—খবরটা পেয়ে চমকে উঠলেন কৃষ্ণপ্রসাদ।

জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদের জমিদারিই যেন ডুবে গেল! একে তো তাঁর নাতি অজয়ের যা মতিগতি, তাতে বংশের মর্যাদা লোপ পেতে বসেছে। তার উপরে অজয় প্রজাদেরও বিগড়ে দিচ্ছে। কৃষ্ণপ্রসাদ বুঝতে পেরেছেন, অজয়ই চাষাভুষাদের

লোভ দেখিয়ে তেলের খনির মজুরিতে লাগিয়ে দিচ্ছে। তাঁর সব কূটনীতিই ব্যর্থ হয়ে গেল।

কথা শোনে না অজয়। এখন তো তার দেখা মেলাই ভার। সর্বেশ্বর মাষ্টারের মেয়ে সুজাতা কৃষ্ণপ্রসাদের চোখ খুলে দিয়েছে! এই মেয়েটাই সেদিন তাঁর সম্মান বাঁচিয়েছে। তবু কৃষ্ণপ্রসাদের মনের ক্ষোভ মেটে না। মণীশকে তিনি বেঁধে রাখতে পারলেন না; সুনন্দা মরে গিয়ে তার পথ আরও পরিষ্কার করে দিল।

কি জানি কি এক ঈর্ষার জ্বালা কৃষ্ণপ্রসাদকে উত্তেজিত করে তোলে। সুজাতার মত মেয়ের সঙ্গে মণীশের মিলন ঘটলে চৌধুরী-বংশের কীর্তি লোপ পেয়ে যাবে; এমনি তো ম্লান হতে বসেছে সে কীর্তি! অজয়ের দ্বারা তো কোন আশাই নেই। নীচু হয়ে থাকবে কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরীর নাতি; তারও হয়তো বংশ বাড়বে। তার বংশধরেরা নীচু হয়ে থাকবে; আর মাথা তুলে দাঁড়াবে তাঁরই বৃত্তিভোগী বামুনের ছেলে মণীশ, আর তার বংশ!—কৃষ্ণপ্রসাদ অস্থির হয়ে ওঠেন।

হ্যাঁ, তাদের সমাজচ্যুত করতে পারেন তিনি। কিন্তু তাতে কি ফল হবে? তাদের উন্নতির পথে এ সমাজচ্যুতি কোন বাধাই দেবে না। তিনি তো দেখছেন আজকাল সমাজচ্যুতেরাই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। যারা দেশের পুজো পাচ্ছে, দেশের লোক শুধু নাম বলতেই যাদের চেনে, তাদের আবার জাত?

তারাই তো সব চেয়ে বেশি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, যারা—হিন্দু হলেও হিন্দুয়ানি মানে না, সমাজকে গ্রাহ্য করে না, জাতের বিচার করে না, তারাই নিজের নামে নিজের কাজে যশস্বী হয়ে উঠেছে, কৃতী হয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণপ্রসাদের এই ক্ষুদ্র গ্রামটির বাইরে, তাঁর জমিদারির বাইরে কে তাঁর নাম জানে? তিনি এই গ্রাম্য সমাজের হর্তাকর্তা বিধাতা। সাতপুরুষ ধরে এ অঞ্চলের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে চৌধুরী-বংশ! আজ পর্যন্ত তাঁদের আওতা থেকে কেউ বেরিয়ে যেতে পারে নি। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও প্রতিপত্তিতে এ গাঁয়ে বাস করে চৌধুরী-বংশকে ডিঙিয়ে যে কেউ যাবে, তার পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন চৌধুরীরা।

ক্রূর হাসি খেলে যায় কৃষ্ণপ্রসাদের মুখে। অথচ সকলেই জানে—উদারতা,

বদান্যতা ও ভদ্রতায় চৌধুরী-বংশ এ গাঁয়ের সকলেরই মান-ইজ্জৎ বজায় রেখেছেন। গাঁয়ের ছেলেদের বিদ্যাদানের বন্দোবস্তও করেছেন তাঁরা। অকালে কেউ মারা গেলে তার অনাথ ছেলেমেয়ে বা পরিবার যাতে বিপন্ন না হয়, তারও ব্যবস্থা করেছিলেন চৌধুরীরা।

কিন্তু কেউ তাঁদের গণ্ডিকে ডিঙিয়ে যেতে পারে নি। এমনি সুকৌশলে পরিচালনা করেছিলেন তাঁরা এ গ্রাম্য সমাজ। দেব-দ্বিজে ভক্তির জন্য খ্যাত এই বংশ। তবু,—তবু জানেন কৃষ্ণপ্রসাদ চাণক্যের কূটনীতির চেয়েও কুটিল স্বার্থনীতি ছিল এর পেছনে।

আপন মনে হেসে ওঠেন কৃষ্ণপ্রসাদ; এবার চৌধুরী-বংশের ভিত টলেছে। ভূমিকম্প হচ্ছে। সব ভেঙে-চুরে পড়ে গেল। দু হাতে আর কত ঠেকিয়ে রাখবেন কৃষ্ণপ্রসাদ! তাঁর পেছনে দাঁড়াবার যে কেউ নেই! তাঁরই নাতি কি না আজ খনির সাহেবদের রসদ যোগান দিচ্ছে! ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ!

অস্থিরচিত্ত কৃষ্ণপ্রসাদ পায়চারি করেন।

না। এই ইংরেজরাই সর্বনাশ ঘটিয়েছে। নির্বিচারে সকলকে লেখাপড়া শেখবার অধিকার দিয়েছে; লেখাপড়া শিখলে চাকুরি দিচ্ছে। মুচির ছেলেও ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে। ইংরেজরাই এ ভাঙন ধরিয়েছে। এ যে ভূমিকম্পের চেয়েও ভীষণ। সব ভেঙে-চুরে চুরমার করে দিচ্ছে।

জমিদারির লোভে, বড় হবার লোভে ইংরেজকে এদেশে পাকাপোক্ত হয়ে বসতে দেবার সুযোগ দিয়েছে যারা, তারাই সর্বনাশ করেছে। অভিশপ্ত এ জমিদারি! অভিশপ্ত সে সকল বড়লোকদের বংশ! তাদের পায়ের তলা থেকে আজ মাটি সরে যাচ্ছে। জমিদারির ইমারত আজ মাথায় ধ্বসে পড়ছে। যাদের পায়ের তলায় রাখবার জন্য এ ষড়যন্ত্র, আজ তারাই মাথায় ওঠবার সুযোগ পেয়েছে।

কূটনীতি, কৌশল, বদান্যতা কিংবা জমিদারের চোখ-রাঙানি সবই আজ নিষ্ফল!—অস্থির হয়ে উঠলেন কৃষ্ণপ্রসাদ।

ইংরেজ যে বিষ ছড়িয়েছে, সে বিষে তাকেও জর্জরিত হতে হচ্ছে। বিষ দিয়ে,

—চাকুরির লোভের বিষ দিয়ে মানুষকে অবশ করে রাখতে চেয়েছিল ইংরেজ। কিন্তু তা পারে নি। বিষে বিষক্ষয় হয়ে গেল; গোলামির বিষ কেটে গিয়ে মানুষ আজ স্বাধীন হতে চায়,—ইংরেজের বিষদাঁত ভাঙতে চায়। ইংরেজকেও পালাতে হবে।

কৃষ্ণপ্রসাদের কানে যেন ভেসে আসছে জনজাগরণের জয়ধ্বনি—বন্দেমাতরম্। নূতন করে আজ বুঝতে শিখেছেন কৃষ্ণপ্রসাদ। সেই মেয়েটা, সর্বেশ্বর মাষ্টারের সেই মেয়েটা যেন তাঁর বংশগত নেশার ঘোর কাটিয়ে দিয়ে গেছে। মানুষকে মানুষের অধিকার দিতে হবে।

কিন্তু সে কাজ কি কৃষ্ণপ্রসাদের পক্ষে সম্ভব? হিমালয়ের চূড়ো কি নীচু হতে পারে কোন দিন? না, না, তিনি উঠবেন, আরও উঁচুতে উঠবেন। তাঁরই বংশের কেউ কি তাঁর আশা মেটাবে না? চমকে ওঠেন কৃষ্ণপ্রসাদ! নৈরাশ্য তাঁর মুখের ভাবকে বিকৃত করে তোলে। কেউ নেই,—কেউ নেই! নূতনের সঙ্গে পা ফেলে চলে কেউ নেই তাঁর। অজয় অধঃপাতে গেছে। তা হলে তাঁরই আশ্রিত-লোকের প্রায়-অনাথ ছেলে বিজয়মুকুট পরবে?

তা মেনে নিতে পারেন না কৃষ্ণপ্রসাদ। তাই তো মণীশের জন্য জাল পেতেছিলেন; কূটনীতির কূটচক্রে ধরা পড়েও পড়ল না মণীশ। যজ্ঞেশ্বরের মেয়েটা শেষে মারাই গেল! বাঁধতে পারলেন না মণীশকে।

পরমহিতৈষী সেজে ছেলেটার বেয়াড়া গতিব মোড় ফিরিয়ে দিতে পারলেন না কৃষ্ণপ্রসাদ। মনে মনে আক্ষেপ করতে লাগলেন। এ সৃষ্টিছাড়া ছেলে কোথা থেকে এল? হ্যাঁ, সৃষ্টিছাড়া বৈকি!

কৃষ্ণপ্রসাদের সম্মুখ দিয়ে যেন বিজয়মুকুট পরে সুজাতার হাত ধরে চলে যাচ্ছে, মণীশ! অতর্কিত মুহূর্তে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, আমাদের মুখ উজ্জ্বল করলে মণীশ! গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল হল।

না, তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন? মণীশ তো এখানে নেই। আবার পায়চারি করতে লাগলেন কৃষ্ণপ্রসাদ। এমন সময় গৃহিণী এসে কাছে দাঁড়িয়ে বললেন,—এ কি! ভেতরে চল। স্নান-টান করবে। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—হ্যাঁ, বেলা তো হয়েছে। এবার বেলাশেষের পালা। জান গিন্নী, এবার বেলাশেষের পালা! চল, আমরা কাশী চলে যাই।

গৃহিণী বললেন,—কাশী?

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—হ্যাঁ কাশী। এখানে আর থাকা চলবে না গিন্নী। কোনদিন বুড়োবয়সে এ পুরনো বাড়িটা মাথার উপর ভেঙ্গেই পড়বে; চল, সময় থাকতে সরে পড়ি।

গৃহিণী বললেন,—এ কি বলছ? আমার অজয়ের বিয়ে দেব। নাত-বউ ঘরে এনে প্রতিষ্ঠা করব।

কৃষ্ণপ্রসাদ ম্লান হেসে উত্তর দেন,—প্রতিষ্ঠা করবে? অজয়ের বিয়ে দেবে? সে-সব কথা ভুলে যাও গিন্নী। চৌধুরী-বংশ লোপ পেয়েছে।

কথা বলতে বলতে কাঁপতে লাগলেন কৃষ্ণপ্রসাদ। গৃহিণী তাঁকে হাত ধরে অন্দরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বললেন,—এ কি বলছ তুমি? ক'দিন ধরেই দেখছি, কি যেন ভাবছ। কি হয়েছে আমাদের?

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—কিছুই হয় নি গিন্নী। বেলা শেষ হয়ে এসেছে; বেলা-শেষের গান গাইতে গেলে আর প্রতিষ্ঠার কথা ভাবা চলে না। চৌধুরী-বংশ লোপ পেয়েছে।

সেদিন অনেক রাত্রে মণীশ বাড়ি ফিরল। নিঝুম রাত। বাড়ি ঢুকতে গিয়েই তার কানে এল আর্তনাদ—বল হরি, হরিবোল!

দূর থেকে, গাঙের ধারের শ্মশান থেকে যেন ভেসে আসছে আওয়াজ! হকচকিয়ে উঠল মণীশ। প্রশ্ন জাগে তার মনে,—কে মারা গেল? কে মারা গেল তাদের গাঁয়ের? এমন অসুখ-বিসুক তো কারও শোনে নি সে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় মণীশ। তার বুকের ভেতরটা যেন গুমরে উঠল,—সুনন্দা? সুনন্দা কি তা হলে—। মণীশ আর ভাবতে পারে না; ধীরে ধীরে প্রায় টলতে টলতে বাড়ির ভেতর গেল। আজ এ কি দুর্যোগ? আজকের দিনটা এ কি ঘটালে?

মণীশ উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকলে—পিসীমা!

পিসীমা তারই জন্য বোধ হয় দরজা ভেজিয়ে বসেছিলেন; তিনি তৎক্ষণাৎ হারিকেন হাতে নিয়ে দরজা খুলে দিয়ে মণীশের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন,—কি হয়েছে বাবা! তোর মুখ-চোখ এমন শুকনো কেন?

মণীশ ক্লান্ত স্বরে বললে,—না আমার কিছুই হয় নি পিসীমা! কে মারা গেছে বল দেখি? গোকুল কাকাই বা কোথায়?

পিসীমার চোখ দুটিও ছল ছল করছে। তিনি বললেন,—সুনন্দা আর নেই রে। সূর্যি যখন ডুবু ডুবু তখনই মা আমার চলে গেছে। তোর গোকুল কাকা শ্মশানে গেছে।

মণীশ বললে,—মারা গেছে?

পিসীমা বললেন,—কোন আশাই তো ছিল না বাবা! তবু এত শীগগির যে চলে যাবে, কেউ ভাবে নি।

মণীশ কোন উত্তর দেয় না। তার মুখ দিয়ে যেন আর কথা সরছে না। মণীশ ঘরে ঢুকে তক্তপোশের উপর বসে পড়ল। মনে হল কত ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে। পিসীমা বললেন,—বসে পড়লি বাবা! অনেক রাত হয়েছে। দাওয়ায় জল রেখেছি, হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে চারটি মুখে দে।

মণীশ ততক্ষণে তক্তপোশের উপর দেহখানি এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছে। পিসীমা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন,—কি হল বাবা! তোর শরীর খারাপ নাকি? তিনি মণীশের মাথায় হাত দিয়ে দেখে বললেন,—গাটা একটু ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে। কি যে করিস? কথাবার্তা তো শুনবি না, সেই যে বিকেলে বেরিয়েছিস, আমি তো ভয়েই মরি।

মণীশ উত্তর দেয়,—না পিসীমা। তেমন কিছুই হয় নি। সর্দি-টর্দি হবে; মাথাটা খুব ধরেছে।

পিসীমা বললেন,—গরম জল আছে। পাটা ধুয়ে নে।

মণীশ বিছানা ছেড়ে উঠতেই চায় না। সে উত্তর দেয়,—থাক পিসীমা, পরে হবে খন।

পিসীমা পীড়াপীড়ি করায় মণীশকে অগত্যা উঠে গিয়ে পা ধুয়ে আসতে হল। পিসীমা বললেন, চল তোর ঘরে দিয়ে আসি।

মণীশ বললে,—না পিসীমা। আজ এ ঘরেই থাকব।

পিসীমা হেসে বললেন,—বাব্বা! এখনও তুই সেই ছেলেমানুষটি আছিস! কেউ মারা গেলে ভয়ে ঘর থেকে বের হতিস না; আমার বুকে মুখ লুকিয়ে থাকতিস।

মণীশ নিস্তেজ কণ্ঠে উত্তর দেয়,—না, না, আমার ভাল লাগছে না পিসীমা। আজ তোমার ঘরেই থাকি।

কথা বলতে বলতে মণীশ বিছানায় গা ঢেলে দেয়। চোখ বুজে পড়ে থাকে মণীশ। পিসীমা বলেন,—হ্যাঁরে, দুধটা গরম করে দিই, খেয়ে নে।

মণীশ আর কথা বলে না। পিসীমা দুধ আনতে চলে যান। মণীশের মাথার ভেতর যেন আগুন জ্বলছে। তার চোখে ভাসছে রক্তাক্ত নন্দার দেহ; আর কঙ্কালসার সুনন্দার কোটরগত সেই রক্তরাঙা চোখ দুটি।

কি আশ্চর্য! যারা মণীশকে চেয়েছিল; হয়তো মণীশকে একান্ত আপন করে যারা রাখতে চেয়েছিল, তারা দু জনে একই দিনে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে! মুক্তি দিয়েছে মণীশকে,—মুক্তি!

মণীশ তন্দ্রাঘোরে আচ্ছন্ন; অবসন্ন তার দেহ ও মন। অচৈতন্যের মত পড়ে থাকে মণীশ। পিসীমা দুধ নিয়ে এসে ডাকেন,—মণীশ! ওঠ বাবা! দুধটা খেয়ে নে।

মণীশ কোন সাড়াই দেয় না। পিসীমা দু-এক বার ডাকাডাকি করে আপন মনে বললেন,—রাতদিন ঘুরঘুর করলে কি আর দেহ ঠিক থাকে। আমায় জ্বালিয়ে মারলে বাপু! এখুনি ঘুমিয়ে পড়লে।

তার পর জলচৌকির উপর হাতের বাটিটা রেখে মণীশের গায়ে হাত দিয়ে ডাকলেন,—ওঠ বাবা! ঘুমিয়ে পড়লি না কি?

মণীশ ঘুমের ঘোরে সাড়া দেয়,—পিসীমা? কি বলছ?

পিসীমা বললে,—দুধ এনেছি বাবা! একটু ওঠ্। খেয়ে নে।

মণীশ বললে,—বড্ড মাথা ধরেছে পিসীমা! ভাল লাগছে না।

পিসীমা বললেন,—গরম দুধ খেলে আরাম পাবি বাবা! নে, খেয়ে নে!

পিসীমা দুধের বাটিটা মণীশের মুখের কাছে ধরলেন। মণীশ বিছানার উপর বসেই দুধটুকু খেয়ে আবার শুয়ে পড়ল। পিসীমা দেখলেন মণীশের চোখ দুটি ছলছল করছে।

পিসীমা বললেন,—এ কি রে? কি হয়েছে? খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি!

মণীশ বললে,—না পিসীমা! কিছুই হয় নি।

পিসীমা বলতে থাকেন,—কত বলি বাবা! রাতবিরেতে এত ঘুরঘুর করিস নে। কথা তো শুনবি না। দিন-কাল ভাল নয়, এই তো ভর সন্ধ্যেবেলা মেয়েটা মারা গেল। এ সময় বাইরে থাকতে আছে?

মণীশ বললে,—তা কি আমি জানতাম পিসীমা?

পিসীমা বললেন,—সন্ধ্যা কয়েক বার এসে তোর খোঁজ করে গেল রে! মেয়েটা নাকি বারবার তোর নাম করছিল। আহা-হা! বাপ-মার বুক খালি করে চলে গেল। কত আশা করেছিলাম—।

পিসীমা আর কথা বলতে পারেন না; তার কণ্ঠও যেন অশ্রুরুদ্ধ হয়ে উঠল।

মণীশ আস্তে আস্তে বললে,—মানুষ মারা গেলে কি হয় পিসীমা!

পিসীমার অশ্রুমাখা মুখেও হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি উত্তর দিলেন,—এখনও কি তুই সেই ছেলেমানুষটি আছিস মণীশ! সেই ছোটবেলা থেকে কত বার যে এই একই কথা বলে আসছিস, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তারা স্বর্গে যায় বাবা!

মণীশ বলে,—স্বর্গে যায় না আকাশে-বাতাসে মিশে থাকে?

পিসীমা বললেন,—অত কথা জানি নে বাবা! সেই একই হল, তারা স্বর্গে যায়।

মণীশ পিসীমার উত্তর শুনে চুপ করে গেল। তাঁর কানে ধ্বনিত হচ্ছে—কিশোর বৈরাগীর কথা,—হারিয়ে গিয়ে তার রাধা আকাশে-বাতাসে মিশে গেছে। সে এসে ছুঁয়ে যায় অথচ ধরতে পারে না।

পিসীমা লণ্ঠনের আলোটা কমিয়ে দিয়ে বললেন—এখন ঘুমো বাবা! আমি ও-ঘরে আছি।

মণীশ ঘুমোয় না, স্বপ্ন দেখে!

পরের দিন। মণীশ সেদিন আর বের হয় নি।

কাঞ্চনগড়ে যাবার ইচ্ছাটাও দমন করে রাখল। শরীর তেমন ভালও নেই। পিসীমাও নিষেধ করেছেন। মণীশ কেবল কালকের ঘটনার কথাই ভাবছে। কদমপুরের পাহাড়ের সেই রক্তাক্ত দৃশ্য আর নন্দার সেই অন্তিম হাসি তার চোখের সামনে যেন ধাঁধার সৃষ্টি করেছিল; তার পর সুনন্দা গেল।

হ্যাঁ, কিশোর বৈরাগীর উদাসী হওয়ার ইতিহাস নূতন ভাবে রেখাপাত করেছে মণীশের মনে। রাধার প্রেমে ঘর-ছাড়া হয়েছে কিশোর বৈরাগী; লোকে জানে সে বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বে বিভোর! মনে মনে হাসে মণীশ। কিশোর বৈরাগীই বলেছে,—তার কুড়িয়ে-পাওয়া-রাধা হারিয়ে গিয়ে তাকে পাগল করে দিয়ে গেছে; তাকে বিবাগী করেছে। কিশোর বৈরাগী জেনেছে, আকাশে-বাতাসে মিশে আছে তার রাধা। সেই প্রেমেই বিভোর কিশোর বৈরাগী।

এই তো উদাসী বাউলের ইতিকথা! ভালবাসা মানুষকে এমনি করে দেয়! ভালবাসা!—প্রেম!—বার বার মনে মনে উচ্চারণ করে মণীশ। তার মনোজগতের আরও একটা যবনিকা যেন সরে গেল।

মনে মনে প্রশ্ন জাগে মণীশের,—কেন এমন হয়?

উত্তর মেলে না। আবার ভাবে,—কই সে তো এদের কাউকে চায় নি? তবু কেন এমন হল?

আবার নিজের মনোজগতের আর একটি পর্দা সরে যায়। মণীশ বিস্মিত হয়। সুজাতাকে সে ভালবাসে! যারা গেছে এদের কাউকে না চাইলেও সুজাতাকে সে চায়!

কিশোর বৈরাগীর কাহিনী তাকে উদ্বেল করে তোলে। চুপ করে ভাবছে মণীশ। না, এখান থেকে তাকে চলে যেতে হবে। অনেক দূরে চলে যাবে সে। সংসারে

কে-ই বা আছে? এখানে থাকলে বন্ধনের ভয় আছে। পিসীমা রয়েছেন; গোকুলকাকা রয়েছেন। হিতৈষী পাড়া-প্রতিবেশীদের অনেকেই রয়েছেন। তাঁরা চান মণীশকে বেঁধে রাখতে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বিছানার উপর বসে মণীশ সুধীরের চিঠিখানা নাড়াচাড়া করছিল। সুধীর চিঠি লিখেছে,—কলকাতায় এলে মণীশের ভাল ব্যবস্থাই করতে পারবে। দু বেলা দুটো টিউশনি করলেই বেশ চলে যাবে। মিছামিছি সময় নষ্ট না করে যেন চলে আসে মণীশ। আরও টিপ্পনি কেটেছে সুধীর। আলেয়ার পেছনে ঘুরতে তাকে মানা করছে।—কি বিশ্রী রসিকতা।

হ্যাঁ, মণীশ যাবে। এখানে থেকে তার কি লাভ? নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতন যোগ্যতা তাকে অর্জন করতে হবে। মানুষের মত মানুষ হতে হবে। দশ জনের মাঝে মাথা তুলে দাঁড়াবে সে। ছোটবেলার কল্পনার স্বপ্ন উঁকি-ঝুঁকি মারে। দেশের লোকে নাম জানবে তার। তারও ছবি থাকবে অনেকের ঘরে।

ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথ, আর বিবেকানন্দের ছবি দেখে, মণীশের মনে দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল। দেশে দেশে মাথা উঁচু করে ভারতের বাণী প্রচার করবে সে।—নিশ্চয়ই সে সুযোগ আসবে। কলকাতায় যাবে সে। এই পাড়া-গাঁয়ে, পাহাড়-জঙ্গলে পড়ে থাকলে তার সে স্বপ্ন সফল হবে না।

সত্যই বলেন গোকুল কাকা! তাঁর কাছে অদৃষ্টের চাবিকাঠি খুঁজতে গিয়েছিল মণীশ। গোকুল কাকা বলেছেন, বড় বোকা তুই মণীশ! গ্রহ-নক্ষত্রের মর্মকথা থাকবে তোর আমার হাতের রেখায়? তুই কি মনে করিস কবচ মাদুলি দিয়ে মানুষের কপালের লেখন পালটে দেওয়া যায়। হ্যাঁ, পারা যায় বটে, নিজের চেষ্টায় পারা যায়। কিং কুর্বন্তি গ্রহা সর্বে? একমনে কাজ করে যা বাবা! তার ফল তুই পাবি। গ্রহেরা তোর কি করবে? বুঝলি?

হ্যাঁ, নিজের অদৃষ্ট নিজেকেই গড়ে তুলতে হবে। এখানে পড়ে থাকলে এখানকার লোকের মতই গণ্ডির ভেতরে আটকে পড়তে হবে। আজ সুনন্দা গেল, কাল আর এক সুনন্দা জুটবে। আজ নন্দা আত্মহত্যা করল, কাল হয়তো সন্ধ্যা করবে। আর সুজাতা? সুজাতার পাশে দাঁড়াবার মত যোগ্যতা তার কোথায়?

তাও যদি সম্ভব হয়, তবু এই গণ্ডির মধ্যেই আটকে থাকতে হবে। মুক্ত বিহঙ্গকে পিঞ্জরাবদ্ধ হতে হবে।

তার চেয়ে এই ভাল,—এই ভাল। সুধীরের কাছে চলে যাবে সে। সুজাতার লক্ষ্য অনেক দূর,—তার বাবার আদর্শ আরও মহান। ডেভিড তার স্বপ্ন সফল করতে পারে। সর্বেশ্বরবাবু বলেছেন,—ইউরোপ দেখা দরকার। সে দেশের কর্মশক্তিকে বরণ করবে আমাদের ভাবশক্তি। দুইয়ের মিলনে ভবিষ্যৎ ভারত গড়ে উঠবে। সেই সুজাতাকে গৃহের বাঁধনে বাঁধতে চায় মণীশ! না, না,—মুক্ত বিহঙ্গী আকাশে উড়ে যাক্।—সুজাতা মুক্ত বিহঙ্গী; মাতা নয়, কন্যা নয়, বধূ নয়, সুজাতা নারী। সুজাতা প্রেরণার সুধাভাণ্ড হাতে নিয়ে একক দাঁড়িয়ে থেকে প্রেরণা যোগাবে।

দূর থেকে সে প্রেরণার উন্মাদনায় মণীশ এগিয়ে চলবে। অগস্ত্যের মত একাকী দুস্তর দুর্গম পথের যাত্রী হবে মণীশ। তার পথ আর সর্বেশ্বর মাষ্টারের পথ এক নয়।

আকাশ-পাতাল চিন্তায় ডুবে আছে মণীশ।

হঠাৎ পায়ের সাড়া পেয়ে চোখ তুলে দেখে সন্ধ্যা তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সন্ধ্যার মুখে ম্লান হাসি। হকচকিয়ে উঠে মণীশ বলে,—তুমি? তুমি আবার এলে সন্ধ্যাদি!

সন্ধ্যা উত্তর দেয়,—হ্যাঁ এলাম। তাতে দোষ আছে কিছু?

মণীশ বলে,—না কোন দোষ নেই সন্ধ্যাদি! কিন্তু সবাই যখন মানা করছে কালীমা পর্যন্ত বারণ করেছেন, তখন না এলেই পারতে।

সন্ধ্যা বলে,—তাদের বারণ কে শুনছে মণীশ! সুজাতা বলেছিল, আমি যদি তাদের আশ্রমে গিয়ে থাকতে চাই তা হলে সে নিয়ে যাবে। এখন তো সে আর এদিকে আসে না।

মণীশ বলে,—তার বাবার খুব অসুখ। তাই হয়তো আসছে না।

সন্ধ্যা বলে,—তার বাবার অসুখ? কিন্তু তুই যে আজ গেলি নে?

মণীশ উত্তর দেয়,—শরীরটা ভাল নেই সন্ধ্যাদি! কাল এক বার যাব।

সন্ধ্যা বলে,—আমায় তুই সেখানে নিয়ে চল মণীশ! আমি যে আর এখানে টিঁকতে পারছি না।

মণীশ বলে,—কি যে বল সন্ধ্যাদি! তুমি গিয়ে থাকবে সেখানে? তোমার বাবা আর তোমার মা তোমায় ছেড়ে দিলে তো?

সন্ধ্যা বলে,—আমি যাব মণীশ। কেউ আমায় বাধা দিতে পারবে না।

মণীশ বলে,—তোমার যা খুশি কর সন্ধ্যাদি! আমাকে এর মধ্যে টেনো না।

সন্ধ্যা বলে,—আমাকে একটু আশ্রয় দিলেই আমি নিজেই নিজের ব্যবস্থা করে নিতে পারব রে। তুই নিয়ে না যাস, আমি নিজেই নিজের ব্যবস্থা করব।

সন্ধ্যা বেরিয়ে গেল। মণীশ আবার ভাবতে বসল, যত আপদ্! এ সমাজে কি বাস করা চলে? এদের মায়ামমতা দেখতে গেলে নিজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে; এদেরও উপকার হবে না। না, না, মণীশ চলেই যাবে। সন্ধ্যা, সুনন্দা কিংবা সুজাতার দিকে ফিরে তাকালে তার চলবে না।

ভবিষ্যতের স্বর্ণচূড়া তার কল্পনার জগতে ঝিলমিল করছে।

আবার সেই রক্তক্ষয়ী বিপ্লব। ইংরেজী ১৯৩০ সাল।

রুগ্নশয্যায় সর্বেশ্বর। বালিশে হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। পড়তে পড়তে উত্তেজনায় দীপ্ত হয়ে উঠল তাঁর চোখ-মুখ। আবার যেন সেই যৌবনে ফিরে গেলেন। সর্বেশ্বর আপন মনে বলতে লাগলেন,—বাঙালীর ছেলে অস্ত্রাগার লুট করেছে;—ইংরেজের অস্ত্রাগার। সমগ্র ভারতবর্ষ কেঁপে উঠেছে।

বিপ্লবীরা শহরের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছে। রেলওয়ে কিংবা টেলিফোন-টেলিগ্রামের যোগাযোগেরও কোন উপায় রাখে নি।—স্তম্ভিত হন সর্বেশ্বর। তাঁর যৌবনের কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে, চট্টগ্রামের কিশোর বালকদের কথা। কিন্তু তারা তো তখন নিতান্ত শিশু ছিল। হয়তো কারও কারও জন্মও তখন হয় নি। কাগজখানি তন্ন তন্ন করে পড়েন সর্বেশ্বর। যত সব অচেনা নাম!

নিশীথ রাত্রের সেই দুর্বার আক্রমণ!—চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বিপ্লবী-

বীরদের বিজয়-অভিযানের মিছিল দেখেন সর্বেশ্বর। এরা নির্মূল করবে ইংরেজ-শক্তিকে!

অপর দিকে,—সেই অহিংস অভিযানের মিছিল। দাণ্ডি অভিযান,—লবণ সত্যাগ্রহে চলেছে অজস্র সৈনিক। হিংসা ও অহিংসার মিছিল;—ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে দেশ।

ইউরোপীয়েরা প্রমাদ গুণছে। এদেশে যারা রয়েছে, তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। সর্বত্র পড়েছে শঙ্কার ছায়া। জানালা দিয়ে দেখা যায় কদমপুরের তেলের খনি। সর্বেশ্বরের মনে হয়, খনির কর্মচঞ্চল মুখরতাও যেন কেমন স্তিমিত হয়ে এসেছে। ওঃ, ডেভিড রয়েছে এখানে! আশঙ্কায় ভরে ওঠে সর্বেশ্বরের মন।

নিত্য নূতন খবর আসছে। বিপ্লবীদের ধরবার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে ইংরেজ। কোথায় তারা? তাদের খোঁজাখুঁজির অজুহাতে শহরে ও শহরতলীর গ্রামে বেপরোয়া অত্যাচার চলছে। তল্লাশির নামে অত্যাচার করছে পুলিস; মেয়েদের কিংবা বালক-বালিকাদেরও রেহাই নেই। খেয়াল-খুশিমত প্রায় নগ্ন করে তল্লাশি করছে সে বর্বরের দল।

কিশোর বালকদেরও ধরে ধরে হাজতে পুরছে। পলাতক বিপ্লবীদের আত্মীয়-স্বজনের উপর চলছে উৎপীড়ন।—উত্তেজিত হয়ে ওঠেন সর্বেশ্বর। তাঁর যৌবনের উন্মাদনা যেন আবার ফিরে আসে।

হ্যাঁ, বিপ্লব চাই,—রক্তক্ষয়ী বিপ্লব। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে নামতে হবে। বিপ্লবের নাম তো হিংসা নয়। আত্মরক্ষার জন্য, হিংস্র দস্যুর সঙ্গে সংগ্রামের নাম নিশ্চয়ই হিংসা নয়! এই যে কয়েক বছর আগে ইউরোপের কোন এক ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা জার্মানির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে হাজার হাজার লোকের প্রাণনাশ করে বাহবা নিলে, শুধু সেটাই কি মহৎ কাজ? আর ভারতের স্বাধীনতা পদদলিত করে নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর লাঠি চালানো কি মহত্ত্বের কাজ?

সর্বেশ্বর এই দীর্ঘকালের সাধনা, তাঁর বিপ্লবী গুরু মহেন্দ্রদার বিদায়-বাণী, আর রবার্টসন সাহেবের কথা যেন ভুলে যান। তিনি হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলে ওঠেন,

—হ্যাঁ বিপ্লব চাই,—প্রতিশোধ চাই। রক্তের বদলে রক্ত চাই।

উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েন সর্বেশ্বর। তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন। সুজাতা তাঁর শেষের কথাগুলি শুনতে পেয়ে পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে বললে,—একি বাবা! তুমি যে ঘেমে গেছ।

সর্বেশ্বর বলেন,—আবার বিপ্লব স্থরু হয়ে গেছে মা! আবার বিপ্লব! তাই ভাবছিলাম।

সুজাতা তোয়ালেখানা টেনে নিয়ে সর্বেশ্বরের ঘাম মুছতে মুছতে বলতে লাগল, —তুমি শুয়ে পড় বাবা! আমি হাওয়া করছি।

সুজাতা পাখার বাতাস করতে থাকে। সর্বেশ্বর বলেন,—জানিস মা! এরা যে রক্ত দিচ্ছে, এ রক্ত ব্যর্থ হবার নয়। দেশের লোক সজাগ হয়ে উঠছে। নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা বুঝতে পারছে দেশের লোক। দেখছিস মা! তারাও দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এ যুদ্ধে। কত মারবে ইংরেজ? তেত্রিশ কোটির এক কোটি মরে গেলেও লাভ আছে! ওদের গোলা-বারুদ ফুরিয়ে যাবে, হাতের মুঠি শিথিল হয়ে যাবে।

সুজাতা বললে,—তাই তো বাবা! দেশটা যেন ক্ষেপে উঠেছে।

সর্বেশ্বর বললেন,—অহিংস অভিযানেও হিংসা আসছে মা! ওরা লাঠি মারছে, তার বদলে আঘাত একদিন তাদের পেতেই হবে। অহিংসার মাঝেও হিংসা মাথা তুলে দাঁড়াবে মা!

সুজাতা বললে,—থাক বাবা! থাক ওসব কথা। তুমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।

সর্বেশ্বর হাসলেন। সে হাসিতে মমতার ধারা যেন ঝরে পড়ছে। তার পর তিনি ধীরে ধীরে বললেন,—জানিস মা! আমিও একদিন বিপ্লবী ছিলাম। এই হাতে এখনও তার চিহ্ন আছে সুজাতা! এই হাতে গুলি ছুঁড়েছি,—এই যে, এই যে।

সর্বেশ্বর নিজের হাত উলটে-পালটে দেখান। তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন,—কিন্তু এরা আমাদের চেয়েও দুর্দম। আমরা যা পারি নি, এরা তা পেরেছে। ভুল পথে চলেছিলাম আমরা, তাই আমাদের পরজয় ঘটল। এদের পরাজয় নেই

মা! সারা দেশ এদের পেছনে রয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি—এদের উপর অত্যাচারের,—এদের রক্তদানের প্রতিশোধ নেবে সারা দেশ। অহিংস অসহযোগে ইন্ধন যোগাচ্ছে এদের মারণ-যজ্ঞ।

সুজাতা বিস্ময়ে অবাক হয়ে সর্বেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। হতবাক সুজাতা ভাবে,—তার বাবা বিপ্লবী ছিলেন!

সর্বেশ্বর বলতে থাকেন,—অবাক হচ্ছিস সুজাতা! জানিস সে পথ আমি কেন ছেড়ে দিলাম? আমায় নূতন মন্ত্রের আভাস দিয়ে গেলেন আমার বিপ্লবী গুরু মহেন্দ্রদা। তিনি বলেছিলেন,—দেশ এখনও তৈরী হয় নি। ভুল পথে চলেছি আমরা। আমাদের পেছনে দাঁড়াবার লোক নেই। সে অনেক কথা মা! তোকে সবই বলব, সব কথাই তোকে শুনিয়ে যাব। মহেন্দ্রদা চলে গেলেন। তার পর যিনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, যিনি আমায় নূতন আলো দেখিয়েছিলেন, এমন কি ভারতবর্ষকে যিনি আমায় চিনিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁকে ভুলতে পারব না মা। তিনি এদেশের লোক নন। তাঁর ঋণের বোঝা আমায় চেপে ধরেছে, তা শোধ না হওয়া পর্যন্ত আমার নিষ্কৃতি নেই,—শান্তি নেই। তাঁর গচ্ছিত ধন আমায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

সুজাতা প্রশ্ন করে,—কে বাবা? কে তিনি?

সর্বেশ্বর শান্ত কণ্ঠে উত্তর দেন,—তিনি এক জন ইংরেজ,—খাঁটি ইংরেজ, রবার্টসন সাহেব।

সুজাতা বলে,—তোমাকে বিপ্লবী জেনেও তিনি আশ্রয় দিলেন?

সর্বেশ্বর বললেন,—হ্যাঁ, বিপ্লবী জেনেও আশ্রয় দিয়েছিলেন তিনি। ইচ্ছা করলেই তিনি আমাকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়ে দিতে পারতেন, আধমরা হয়ে পড়েছিলাম, আমাকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে বাঁচিয়েছিলেন সেই মহান ইংরেজ।

সুজাতা বিমুগ্ধ হয়ে সর্বেশ্বরের কথা শোনে। জানালা দিয়ে প্রভাতী সূর্যের রশ্মি পড়ে তার চোখে-মুখে। সর্বেশ্বর বলতে থাকেন,—নিজের দেশের দিকে কোন দিন তাকাই নি সুজাতা! নিজের দেশকে, নিজের ধর্ম ও ঐতিহ্যকে জানতাম না। তিনিই চিনিয়ে দিলেন আমার দেশকে। অগস্ত্যের মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন তিনি। যীশু আর

বশিষ্ঠের আদর্শ তুলে ধরলেন আমার মানসপটে। সেই মহান ব্রত উদযাপন করছি সুজাতা। সেই ব্রতের উত্তরাধিকারী হয়ে তোকেই মা এই মহান আদর্শ ছড়িয়ে দিতে হবে। ইউরোপের কর্মশক্তির সঙ্গে আমাদের এই ভাবশক্তির মিলন ঘটাতে পারবি মা?

শিশুর মত আবদারের সুরে সর্বেশ্বর বলতে থাকেন,—পারবি সুজাতা? পারবি মা! তা হলে এ হানাহানি কাটাকাটি থেমে যায়; মানুষের মনুষ্যত্ব জয়ী হয়।

সুজাতা উত্তর দেয়,—নিশ্চয়ই পারব বাবা! কিন্তু এ তো এক জনের কাজ নয়।

সর্বেশ্বর বলেন,—তাও জানি মা! এক এক করেই তা ছড়াবে। সেদিন আসবে সুজাতা! সেদিন আসবে, ডেভিডকে দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে। নূতন ইউরোপ নূতন দৃষ্টির ইঙ্গিত পেয়েছে। তাই তো তোকে পাঠাতে চাই মা!

সুজাতা বলে,—তুমি ভাল হয়ে ওঠো বাবা! তুমি শীগগির সেরে ওঠো।

সর্বেশ্বর বলতে থাকেন—সেই মহান ইংরেজের গচ্ছিত ধন ফিরিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত না হলে সেরে উঠতে কি পারব মা?

সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে ওঠে সর্বেশ্বরের মুখ।

ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে ডেভিডের মন।

তার মনোজগতে তোলপাড় চলেছে। বিদায়ের বাঁশি বেজে উঠেছে। ডাক পড়েছে তার নিজের দেশে। এখানকার কাজ তার ফুরিয়েছে। হয়তো আর কোন দেশে পাহাড়ে জঙ্গলে তাকে ছুটে যেতে হবে।

অফুরন্ত ক্ষুধা! তার দেশের মানুষের অফুরন্ত ক্ষুধার ইন্ধন যোগাতে হবে তাকে। কিন্তু তার মনের ক্ষুধা কে মেটাবে? সুজাতার স্বপ্নরাজ্য সে ভেঙে দিতে পারে না। এ তো তার দেশের ডালিয়া নয়, এ যে ভারতের মাটিতে বেলফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে তাকে বৃন্তচ্যুত করতে চায় না ডেভিড। পালাতে হবে ডেভিডকে।

বলি বলি করেও কথাটা বলা হয় নি সর্বেশ্বরকে। আর বলার ইচ্ছাও তার

নেই। কি অধিকারে সে সুজাতার স্বপ্নরাজ্য ভেঙ্গে দেবে? মণীশ আর সুজাতার মাঝখানে ব্যবধান সৃষ্টি করে নিজেকে অপরাধী করতে চায় না ডেভিড, কিন্তু তাদের অলক্ষ্যেই ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেছে। উপায় নেই।

সর্বেশ্বর যে কথা প্রকাশ করেন নি, সুজাতা যে কথা স্বপ্নেও ভাবে নি, সে কথা প্রকাশ করতে গেলে অপরাধী হবে সে। এদেশের ফুল হয়ে ফুটে থাক সুজাতা।

তবু মনে হয় পিতৃভূমির সঙ্গে কোন অদৃশ্য যোগসূত্র যেন সুজাতাকে টানছে। আর নয়, ডেভিডকে পালাতে হবে।

তবু,—তবু যদি ডেভিড তার সন্দেহ, তার সংশয় দূর করবার অবকাশ পেত? হ্যাঁ, তার বাবা লয়েড সাহেব সুজাতার পালকপিতার যে পরিচয় দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে সর্বেশ্বরের জীবনধারা ও কার্যকলাপ মিলে যাচ্ছে। তার বাবার দেওয়া চিঠিখানিও হারিয়ে ফেলেছে ডেভিড। সেও অনেক বছর আগেকার কথা। লয়েডও ইহজগতে আর নেই। না, না,—চিঠিপত্রের আর প্রয়োজনই বা কি আছে? সর্বেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলেই সকল সন্দেহের অবসান ঘটে যায়; কিন্তু,—না, না, সুজাতার স্বপ্ন সে ভেঙ্গে দেবে না। সুজাতা এদেশেরই থাক।

এ দেশ ছেড়ে ডেভিড চলে যাচ্ছে। কিন্তু আজ তার মনে হয় এ দেশের বেল, করবী আর শিউলির পাশে কি তার একটু স্থান হবে না? ঐ যে, ছায়া-ঘেরা গাঁয়ের প্রান্তে ছোট্ট একখানি কুঁড়ে ঘর দেখা যাচ্ছে; কিশোরী বধূ কলসী কাঁখে জল আনতে চলেছে পুকুরঘাটে; উল্লাসে চীৎকার করছে কতকগুলো পাতিহাঁস; দু-একটা রাজহাঁসও গলা বাড়াচ্ছে। অস্তোন্মুখ সূর্যের রশ্মি পড়েছে বধূর মুখে; কি প্রসন্নতায় ভরা সে মুখ। দরিদ্র গ্রাম্য বধূ। নিজের দৈন্যকে এরা অভিশাপ দেয় না; মনের ক্ষুধা এদের মিটে গেছে! স্বর্গের দেবতাকে এরা ঘরের মানুষ করে তোলে। কিশোরী বধূ ডাকে তার ব্রজের রাখাল—বিশ্বের রাখালকে। তার কোল আলো করে গোপাল এসে কবে লুটোপুটি খাবে, বধূ আছে তারই প্রতীক্ষায়।

মায়া-মমতায় ঘেরা এদেশের প্রতিটি ধূলিকণা। বন-বনানী ও প্রান্তর-মাঠের শ্যামলিমার মাঝে করুণার ছায়া দেখে ডেভিড। এদেশের মানুষ জন্ম-জন্মান্তর প্রিয়জনকে আপন করে রাখতে চায়। এমন যে দেশ, সে দেশকে, সে দেশের

মানুষকে উত্ত্যক্ত করে তুলেছে তারই দেশের মানুষ। এদেশের প্রাণশক্তি শোষণ করে নিতে চায় ইংরেজ! পারবে না, পারবে না; দিব্যচক্ষে দেখতে পায় ডেভিড,—এদেশের প্রাণশক্তি লুক্কায়িত আছে তাদের অন্তরের মণিকোঠায়; প্রেম ও সত্যকে এরা এক করে দেখে।

তাই শেকল ছেঁড়ার গান উঠেছে। আপনাআপনি ইংরেজের শেকল ছিঁড়ে পড়ছে। ইংরেজকে এদেশ ছাড়তে হবে। ক্ষেপে উঠেছে সারা দেশ। কি দুর্দম সাহস আর দৃঢ়তা এক অর্ধনগ্ন খর্বকায় পুরুষের। হাতে লাঠি, চোখে-মুখে তাঁর দৃঢ়তার সঙ্গে সরলতার দীপ্তি যেন ফুটে বের হচ্ছে। সারা ভারত তাঁর পেছনে ছুটে চলেছে। ইংরেজের আইন তারা মানবে না। নিরস্ত্র সত্যাগ্রহী দলের মাথায় পড়ছে পুলিশের লাঠি। দরদর করে রক্ত ঝরছে। এই রক্তপাতের প্রতিশোধ নিতে বাংলায় বিপ্লবের হোমাগ্নি জ্বলে উঠেছে। বাঙালীর ছেলে ইংরেজের অস্ত্রাগার লুট করেছে। এখানে সেখানে অত্যাচারী শাসকের বুকে গুলি ছুঁড়ছে।

স্বজাতীয় ইংরেজের আচরণে লজ্জায় নিজেকে অপরাধী মনে করে ডেভিড।

ভুল করছে, তার দেশের লোকেরা ভুল করছে। এ দেশ তাদের ছাড়তে হবে। এদের ভুল ভেঙে দেবার মত শক্তি নেই ডেভিডের। অফুরন্ত ক্ষুধা, অফুরন্ত লোভ তার দেশবাসীর। তাদের ক্ষুধার ইন্ধন ক্ষুদ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ যোগাতে পারে না; তাই দিকে দিকে অভিযান চালাতে হবে। পাহাড়-পর্বত, মেরু, সাগর, উপসাগর তোলপাড় করে সে ইন্ধনের সন্ধান করতে হবে। ডেভিডের সাধ্য কি তাদের ক্ষান্ত করে!

আপন মনে ভাবছে ডেভিড।

বিদায়ের বাঁশি বেজে উঠেছে। কাঞ্চনগড়ের পথে ভারাক্রান্ত মনে এগিয়ে চলেছে ডেভিড। বিদায় নিতে হবে। সুজাতার কাছে বিদায় নিতে হবে। সর্বেশ্বর আর মণীশের কাছেও বিদায় নিতে হবে। কি আশ্চর্য এ দেশের মানুষ। এরা আপন করে নিতে পারে নিঃসম্পর্কীয় বিদেশী মানুষকে। এদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়। কি যেন এক যোগসূত্রে এরা বেঁধে নিয়েছে ডেভিডকে। মায়ার বাঁধনে

বেঁধেছে ডেভিডকে। শাসক ও শোষক ইংরেজের ছেলের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য বিচলিত হয়ে উঠেছে এদের হৃদয়-মন ! ছল ছল হয়ে ওঠে তার চোখ দুটি ! এমন মায়া, এমন মমতা তো তার নিজের দেশে পায় নি ডেভিড।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রহমন দারোগা।

সর্বেশ্বরের আশ্রমের সামনে পাশাপাশি দুটি করবীর গাছ,—রক্তকরবী ও শ্বেত-করবী। দুটি গাছেই ফুল ফুটেছে। বড় সুন্দর ফুল; গন্ধ নেই, তবু আছে স্নিগ্ধ আকর্ষণ।

সুজাতাই দুটি গাছ পুঁতেছিল; নাসির আর সুরথের স্মৃতি বহন করছে এ দুটি গাছ। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন রহমন দারোগা, আবার হাসিও পায় !

কত পরিবর্তন হয়ে গেল এই কবছরে; তাঁর নিজের অতীতকে ভুলে গেছেন রহমন দারোগা। অতীতের সাক্ষী রয়ে গেছে একটি মাত্র মেয়ে। তার জন্যও কোন ভাবনা নেই।

দারোগা ছিলেন; জবরদস্ত পুলিশ ছিলেন তিনি। তাঁর দাপটে চোর-ডাকাত সব কেঁচো হয়ে থাকত। এখনও তাঁকে ভয় করে তারা। খোলসটা ছেড়ে দিলেও গন্ধটা যায় নি।

গাঁয়ের লোকের কথা ভাবেন রহমন। কত কষ্টে আছে তারা ! রোগে ওষুধ নেই, পথ্য নেই; কোলের ছেলে কোলেই মরে। খোদার দান বলে ছেলেমেয়েদের আদর করতে কার্পণ্য করে না; কিন্তু মানুষ করতে জানে না। কেউ তাদের মানুষ করার মন্ত্র শেখায় নি !

আদিম রয়ে গেছে তারা। তারাই আদিম, তারাই বন্য। শুধু ঘর-বাড়ি বেঁধে থাকলেই হয় না; তাদের স্বভাব ও আচরণ সবই আদিম রয়ে গেছে ! তাদের জন্য কারও দরদ নেই। কত রাজা এল, আর গেল; কিন্তু গাঁয়ের মানুষগুলো,—ওই যাদের সবাই নীচু বলে দূরে সরিয়ে রেখেছে, যারা গায়ের রক্ত জল করে বড়দের মুখের অন্ন যোগাচ্ছে, তারা বনের পশুর মতই দিন কাটাচ্ছে।

তারাই হচ্ছে চোর, তারাই হচ্ছে ডাকাত। তাদেরই উপর অত্যাচার

করেছেন রহমন দারোগা। ছেলেমেয়ের মুখে একমুঠো অন্ন দেবার জন্তে দুঃসাহসের কাজ করে তারা; লুটে নেয়, ডাকাতি করে, চুরি করে ওই পশুস্বভাব মানুষগুলো। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে?

জমিদার বড়লোক। বড়জাতের লোকেরা আরামে আছেন। বড়লোকের ছেলের অন্নপ্রাশনে ভোজ হচ্ছে; বড়লোকের আঁস্তাকুড়ে যে এঁটোকাঁটা পড়ছে, তাতে দু-চার শ লোকের ভোজ হতে পারে। এ এঁটো-কাটার স্বাদও যে ওই বস্ত' লোকেরা স্বপ্নেও পায় নি।

জমিদার কিংবা বড়লোকের বাড়িতে কত অপচয় ঘটে; অথচ সে অপচয়ের সুযোগ দিচ্ছে এই অজ্ঞ, মূর্খ লোকেরা। তাদেরই উপর শাসন ও শোষণ চলেছে। কিন্তু তারাও আজ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে!

সর্বেশ্বর তাদের মুখেই ভাষা দেবার ব্রত নিয়েছেন। আশ্চর্য মানুষ এই সর্বেশ্বর। তাঁর সংস্পর্শে এসে রহমন নূতন জীবন পেয়েছেন; তাঁর নাসির মিশে গেছে—গাঁয়ের ওই অজস্র মূঢ় মূকদের মধ্যে। তাদের মুখে ভাষা দিতে হবে।

বিস্মিত হন রহমন দারোগা।

আশ্চর্য মেয়ে এই সুজাতা। সর্বেশ্বরের কর্মধারা অব্যাহত রেখেছে সে। সর্বেশ্বর শুধু পাহাড়ীদের মাঝেই নিজের কর্মক্ষেত্রের পরিধি টেনে রেখেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে সেই পরিধির মধ্যে আশে-পাশের উৎসাহী যুবকরাও এসে প্রবেশ করেছিল। রহমনও এসেছিলেন সেদিন; রক্তকরবী আর শ্বেতকরবীর গাছ দুটি যেন মূর্তিমন্ত হয়ে উঠল তাঁর চোখের সামনে—সুরথ আর নাসির প্রাণ দিল সেদিন।

আজ সুজাতা সে কর্মক্ষেত্রের পরিধি আরও ছড়িয়ে দিয়েছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করেছে। তাদের পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপনে উৎসাহী করে তুলেছে সুজাতা; তারা যেন নূতন আলোক পেয়েছে। তাদের মুখে ভাষা ফুটে উঠেছে!

অদম্য উৎসাহ সুজাতার। সুলেমান রাজার অন্দর মহলেও সুজাতা পরিবর্তন এনে দিয়েছে। লেখাপড়া শিখছে অন্দরের মেয়েরা। অন্দরেই সপ্তাহে দু দিন করে

মহিলা-মজলিস বসছে। জানবার বা শেখবার যে অনেক কিছুই আছে, তার স্বাদ পাচ্ছেন আজ অসূর্যম্পশ্যা সেই মহিলামহল। শম্ভুনাথ মাঝে মাঝে শহর থেকে ম্যাজিক লণ্ঠন নিয়ে আসে। সুজাতার কাজেরও সুবিধা হয়। শহর থেকে সমাজসেবী মহিলারাও মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিতে আসেন।

রহমন দারোগাও গাঁয়ের লোকদের ম্যাজিক লণ্ঠন নিয়ে গিয়ে জানবার বা শেখবার অনেক কথা জানিয়ে দেন। তাঁতীপাড়া ও যুগীপাড়ায়ও এসেছে নূতন জীবন; তারাও খদ্দর বুনছে। কলের কাপড় তাদের কোণঠাসা করেছিল, আজ অনেকের বাড়িতেই তাঁত চালানোর খটাখট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

কৃষ্ণপ্রসাদের মত দুর্ধর্ষ জমিদারকেও মন্ত্রমুগ্ধ করেছে সুজাতা। এ স্রোত সত্যই দেশের চেহারা পাল্টে দেবে। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে রহমন সাহেবের মুখ। উল্লাসভরে বলে উঠেন রহমন,—পারবে, সুজাতা পারবে।

সুজাতা হঠাৎ এসে রহমন সাহেবকে হকচকিয়ে দেয়।

সুজাতা হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে,—কি পারব চাচাসাহেব? কি পারব আমি?

রহমন সাহেব ঈষৎ লজ্জিত ভাবেই উত্তর দেন,—না, না, আমি ভাবছিলাম মা তোরই কথা। তুই পারবি মা! যে কাজে আমরা হাত দিয়েছি, সে কাজ তুই পারবি। আমরা তো বুড়ো হয়ে পড়েছি।

সুজাতা বললেন,—ওঃ, এই কথা!

রহমন বললেন,—হ্যাঁ মা! মাষ্টারমশাই তো বুড়োই হয়ে গেছেন। তার উপর এখন তো বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারেন না। তাই বেশ একটু চিন্তায়ই পড়ে গেছি; এসব কাজকর্মের কথা ভেবে কোন কূলকিনারাই পাচ্ছি না।

সুজাতা হেসে উত্তর দেয়,—কি যে বলেন চাচাসাহেব? আপনি আবার বুড়ো হয়েছেন? এখনও এ তল্লাটে চার-পাঁচ মাইলের ভেতর কে কি করছে, তার খবর রাখেন আপনি।

রহমন সাহেবও হেসে হেসে উত্তর দেন,—অভ্যাস রে বেটি অভ্যাস। কিন্তু আর কত দিন বল? তোর বিয়ে-শাদি হয়ে গেলে তো আরও মুশকিল।

হো হো করে হাসেন রহমন সাহেব। সুজাতা আরক্তিম মুখে উত্তর দেয়,—

বেশ! আমাকে বিসর্জন দিলেই আপনারা সুখী, তা বেশ বুঝতে পারি।

রহমন বললেন,—না মা! তা নয়। বাপ-মা কি মেয়েকে ছেড়ে দিতে চায়? তবু দিতে হয়; কাউকে বেঁধে রাখা যায় না। মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে যায় রে, ছিঁড়ে যায়।

আবেগভরে রহমন সাহেব কথা কয়টি বলে চোখ মুছতে লাগলেন। সুজাতা বুঝতে পারলে রহমন সাহেবের মর্মবেদনা জেগে উঠেছে। নাসিরের স্মৃতি তাঁকে পীড়া দিচ্ছে।

সুজাতা শান্ত স্বরে ডাকলে,—চাচাসাহেব! কেন মন খারাপ করছেন আপনি? আমি আপনাদের ছেড়ে যাব না চাচাসাহেব! আমরা সবাই মিলে কাজ করব। দেশের কাজে নিজেকে ভুলে যাব।

রহমন বললেন,—সারাজীবন এই নিয়ে কাটাতে পারবি মা? তাই বলছিলাম, —ডেভিডের সঙ্গে তাদের দেশে গিয়ে নিজেকে বড় করবার পথ বেছে নে মা!

সুজাতা উত্তর দেয়,—না চাচাসাহেব! সে স্বপ্ন আমি দেখি না, আমার বাবার স্বপ্ন আমি সফল করতে চাই। তাঁর কাজই আমার পক্ষে সব চেয়ে বড় কাজ।

রহমন বললেন,—হ্যাঁ মা! তুই পারবি। তাই তো তোকে বিদায় দিতে মন কেঁদে ওঠে। ঐ গাঁয়ের মানুষগুলো কত অসহায়; কত নির্বোধ ওরা। ওদের সেবা করব আমরা। ওদের গড়ে তোলার কাজ আর কেউ পারবে না রে আর, কেউ পারবে না। তোর মত মেয়েকে সামনে পেলে শত শত মেয়ে গড়ে উঠবে সুজাতা!

সুজাতা বললে,—জানি নে আমার কতটুকু শক্তি আছে, তবু আমি একাজ করব চাচাসাহেব; আমাদের দেশের এই চাষাভুষোরা কত অসহায়। আমি যাব না চাচাসাহেব! বিলেতে গিয়ে আমার কাজ নেই।

রহমন বললেন,—তাই তো মা! চল মাষ্টার মশাইকে দেখে আসি।

সুজাতা বললে,—বাবা এখন ঘুমোচ্ছে। জানেন চাচাসাহেব: সেদিন ডেভিড বলছিল, এদেশেই এ জেলায় তার বাবা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন! তার মাও এদেশে ছিলেন কিছুদিন। ডেভিডের জন্মের কয়েক মাস আগে তার মা বিলেতে চলে যান।

রহমন বললেন,—হ্যাঁ শুনেছি। ডেভিডের বাবার কথাও শুনেছি।

সুজাতা বললে,—তার বাবা লয়েড সাহেব এখানে থাকতে লুসাইরা নাকি বিদ্রোহী হয়ে হঠাৎ অনেক সাহেবসুবোকে হত্যা করে।

সুজাতার কথা শুনে চমকে ওঠেন রহমন সাহেব। তিনি এসব বৃত্তান্ত সবই সর্বেশ্বরের কাছে শুনেছেন। তবুও নিজে যে জানেন এ কথা গোপন করে প্রশ্ন করেন,—আর কি বলেছে ডেভিড?

সুজাতা বলে,—তার বাবার এক বন্ধু আর বন্ধুপত্নী একটি শিশুকন্যাকে রেখে সেই বিদ্রোহের সময় মারা যান।

রহমন বললেন,—তার পর?

সুজাতা বললে,—ডেভিডের বাবাও কিছুদিন পর অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরে যান। আর কিছুই জানে না ডেভিড।

রহমন বললেন,—ডেভিডই তা হলে লয়েড সাহেবের ছেলে?

সুজাতা বললে,—আপনি কি তার বাবাকে চিনতেন চাচাসাহেব?

রহমন হেসে উত্তর দেন,—আরে বেটি! আমি যে দারোগা ছিলাম। আমি জানব না?

সুজাতা বললে,—তা হলে কথাটা সত্যি?

রহমন উত্তর দেন,—হ্যাঁ সত্যি। এখন যেমন কোন কোন জায়গায় সাহেব-সুবোকে খুন করছে। এরকমই একটা ঘটনা ঘটেছিল।

সুজাতা বললে,—পাহাড়ীরা কেন ক্ষেপে গিয়েছিল চাচাসাহেব?

রহমন বললেন,—কি করে জানব বল? তোমার বাবা তখন লুসাইপাহাড়েই ছিলেন। তিনি হয়তো বলতে পারবেন।

সুজাতা বললে,—কই বাবার মুখে তো এসব কথা কোনদিন শুনি নি।

রহমন বললেন,—এসব কথা কি গল্প করার মত কথা মা?

সুজাতা বললে,—ডেভিড বলে তার বাবা নাকি সেই মেয়ের সন্ধান করবার কথা তাকে বলে গেছেন। কিছু কাগজপত্র দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ডেভিড তা হারিয়ে ফেলেছে।

রহমন জিজ্ঞাসা করলেন,—কোন সন্ধান পেয়েছে ডেভিড ?

সুজাতা উত্তর দেয়,—সে বলে সন্ধান করে কোন লাভ নেই। সে মেয়ে যদি বেঁচেও থাকে, তা হলে এতদিনে এদেশেরই হয়ে গেছে। বাঙালীর হাতেই তাকে সঁপে দেওয়া হয়েছিল। মিছামিছি সেই মেয়েটির স্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে সে পারবে না।

রহমন বলেন,—ঠিকই বলেছে ডেভিড।

সুজাতা বলে,—কি যে বলেন চাচাসাহেব! নিজের দেশ, নিজের জাতি—সবই ভুলে গিয়ে এদেশে অজ্ঞাত বাসে কাটাবে সেই হতভাগিনী মেয়ে? নিজের পরিচয় সে জানবে না? নিজের মানুষকে চিনবে না সে?

রহমন হেসে উত্তর দেন,—আর যে দেশের জলে রসে সে পুষ্ট হয়ে উঠেছে, সে দেশের কি কোন দাবি নেই তার উপর?

সুজাতা বলে,—আছে চাচাসাহেব! নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তার নিজের দেশকে জানবে না, এ হতে পারে না।

রহমন বললেন,—এ দেশের মেয়েই হয়ে গেছে সে। তাকে খুঁজে কোন লাভ নেই—ডেভিড সত্য কথাই বলেছে।

সুজাতা বলে,—তবু চাচাসাহেব! ডেভিডের জানা দরকার সে মেয়ে কেমন আছে, কোথায় আছে।

পরিহাসের ছলে রহমন বললেন,—এক, দুই, তিন, চার, বারো, চৌদ্দ, কুড়ি, একুশ—সে যে অনেক দিনের কথা। নিশ্চয়ই সে এখন কোন ঘরের বউ হয়ে কিংবা মা সেজে বসে আছে।

হো হো করে হেসে ওঠেন রহমন দারোগা। সুজাতাও সে হাসিতে যোগ দেয়।

তার পর সুজাতা বলে,—বাবাকে আজই সেই লুসাইদের বিদ্রোহের কথা জিজ্ঞাসা করব। তিনি হয়তো এ মেয়ের কথা জানতে পারেন।

রহমন বললে,—তাই করিস মা! এখন আমায় ফুলছড়ি যেতে হবে। মণীশের পিসীমা ডেকে পাঠিয়েছেন। মণীশ নাকি তিন দিন হয় কোথায় চলে গেছে।

রহমন সাহেবের কথা শুনে চমকে ওঠে সুজাতা। সে বলে,—তিন দিন হয় কোথায় চলে গেছে মণীশদা? কই, আমাদের কিছু বলে যায় নি!

রহমন বললেন,—কি জানি মা! আজকালকার ছেলেদের কথা বোঝাই ভার। দেখি গিয়ে কোথায় গেল! ছিঃ ছিঃ, বুড়ী পিসীমা কষ্ট করে মানুষ করলে। শেষে কি না উধাও হয়ে গেল। না, না, মণীশ তো সেরকম ছেলে নয়। নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে।

সুজাতা বললে,—আপনি শীগগির সব জেনে আসুন চাচাসাহেব। আমি বাবার কাছে যাই।

তারা দু জনে দু দিকে চলে গেল।

উতলা হয়ে উঠেছে সুজাতার মন।

ভারাক্রান্ত মনে সুজাতা নিজের ঘরে ঢুকল। টেবিলের উপর খামের চিঠি। এ যে তারই চিঠি। কেউ তো কোন দিন তাকে এমন করে চিঠি লেখে না। ডাকের ছাপ রয়েছে।

খাম খুলে পড়তে থাকে সুজাতা।

"সুজাতা!

আমাকে ভুল বুঝো না। তোমার সত্যিকারের পরিচয়ের আভাস হয়তো তুমি এখনও পাও নি। সে আভাস ডেভিড দিতে সংকোচ বোধ করছে; সে হৃদয়বান, সে মহান। তুমিই ডেভিডের বাবার বন্ধুর সেই হারানো মেয়ে; তুমি ইংরেজ-দুহিতা।

তোমার সত্যিকারের পরিচয় পেয়ে যে আমি দূরে সরে যাচ্ছি, তা নয়। আমি বুঝতে পারছি, তোমার পিতৃভূমির অদৃশ্য যোগসূত্র তোমায় টানছে। সে সূত্র ছিন্ন করবার অধিকার আমার নেই।

শুধু যে আমার সে অধিকার নেই তা নয়, আমার দেশও সে অধিকার,—সে শক্তি হারিয়েছে। এমন একদিন ছিল, যেদিন ভারত বহিরাগতকে আপন করে নিত। আজ শুধু বহিরাগতকে সে স্থান দিতে পারে, কিন্তু তাকে মন্ত্র পড়ে আপন করে নেবার মত সামর্থ্য তার নেই। আজ সে শক্তি ভারত হারিয়েছে সুজাতা! একথা তুমিও জান, তোমার ও আমার মধ্যে এ আলোচনাও অনেকবার হয়েছে।

কিন্তু তার কোন মীমাংসা হয় নি ; তার কোন উত্তরও আমরা পাই নি। আজ তোমাকে বিদায় দেবার সময়, সেই উত্তরও আজ আমি পেয়েছি ; আমার মনে হয়, তার জন্য শুধু ভাররতবাসীই দোষী নয়, বহিরাগতেরাও দোষী। হাজার বছরের ইতিহাসের পাতা ওলটালেই তা বুঝতে পারবে। যারা শুধু নিজেকে জাহির করতে এদেশে এসেছে, গঙ্গা-যমুনা সিন্ধুব জলে অবগাহন করে নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন করতে পারে নি, তাদেরই গ্রহণ করতে পারে নি এই ভারতবর্ষ। তারা এদেশে কোল পেলেও সনাতন ভাবতবর্ষের সঙ্গে তাদের একাত্মবোধ জন্মে নি। সুদূর অতীতের আলেখ্য দেখ,—দেখতে পাবে ইরান, তুরান, গান্ধার, গ্রীসের দুহিতারাও ভারতীয় বধূ সেজে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়েছেন তুলসীমঞ্চে। শক, হুন, মোগল, তাতার কত জাতি মিশে গেছে ভারত-জাতিতে। আর আজ যাঁরা আসছেন, তাঁরা নিজের স্বাতন্ত্র্যে পৃথক্ হয়ে রয়ে গেছেন। এমন কি যাঁরা প্রায় হাজার বছর ধরে ভারতীয় রসে পুষ্ট হয়েছেন, তাঁরাও নিজেদের পিতৃপুরুষের সেই স্বাতন্ত্র্য ভুলতে না পেরে এদেশে থেকেও নিজেদের পৃথক সত্তা দাবি করছেন। আর যারা নূতন তাদের তো কথাই নেই। ভারতীয়েরাও তাদের আপন বলে গ্রহণ করতে পারছে না। আমরা,—ভারতীয়েরা আমাদের অন্তরের সে স্পর্শমণি হারিয়ে ফেলেছি, যে স্পর্শমণির স্পর্শে এক দিন বিদেশী কিংবা বিধর্মীর ধর্ম ও স্বাতন্ত্র্য নিজের রূপে রূপায়িত করতে পারতাম। একক ভাবে সে শক্তি কারও থাকতে পারে, কিন্তু যতদিন না সে শক্তি ব্যাপক হয় ততদিন জাতিগত মঙ্গল হতে পারে না। ভারত আত্মিক ধর্মে বলীয়ান ছিল ; সেই আত্মিক শক্তি আজ নিষ্প্রভ। এখন ইউরোপীয় ন্যাশনেলিজম্ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে! এই ন্যাশনেলিজম মানুষের মাঝে রাষ্ট্রিক ব্যবধান ও স্বাতন্ত্র্য এমন ভাবে সৃষ্টি করছে যে তার পরিণামে হানাহানি বেড়েই চলেছে। পরকে আপনার করে নেবার শক্তি যাদের ছিল, তারাও সে শক্তি হারিয়ে ফেলছে।

এই ভারতবর্ষেই দেখ,—ইঙ্গ-ভারতীয় নূতন সমাজ গড়ে উঠছে ; তারা ভারতীয় হয়েও আত্মিক দিক থেকে ভারতীয় হতে পারছে না। আমি জানি, হৃদয়ের দিক থেকে তোমার বা আমার যে মিলন তাতে বিভেদ নেই। সেই জন্যই

সেই মিলনকে শাশ্বত মর্যাদায় সার্থক করে তোলার জন্যই আমি বিদায় নিচ্ছি; তুমি আমাকে ভুল বুঝো না।

ডেভিড হৃদয়বান। ভারতের অন্তরের পরিচয় সে পেয়েছে। তাই ভারতীয় রসে পুষ্ট আমার বোন সুজাতার মর্যাদা সে দিতে পারবে,—এ বিশ্বাস আমার আছে। তোমার মধ্য দিয়ে ভারতের ভাবশক্তি ইউরোপের কর্মশক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে নূতন ধারার জন্ম দেবে।

আমি আশীর্বাদ করছি সুজাতা! তোমরা সুখী হও।

নিজেকে আজ নূতন রূপে আমি দেখছি; নূতন পথ আমি বেছে নিয়েছি; আমার জীবন একক ও নিঃসঙ্গ। আমি জানি,—আমাকে যারা জড়িয়ে থাকতে চায়, আমাকে যারা আপন করে নিতে চায়,—আমার অভিশপ্ত সংস্পর্শ তাদের শান্তি দিতে পারে না। তাই,—নূতন পথে যাত্রা করছি; যাদের ভালবাসি,—তাদের মঙ্গলের জন্য দূরে চলে যাচ্ছি।

সুজাতা! ভগিনী আমার! তুমি সুখী হও।

আজ আমার অগস্ত্যযাত্রা,—আমার চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে অগস্ত্যের সেই ছবি,—বিন্ধ্য লঙ্ঘন করছেন অগস্ত্য। ইতি

মণীশ”

চিঠিখানি শেষ করে সুজাতা থর থর করে কেঁপে ওঠে,—আমি ইংরেজ-দুহিতা? আমি বিদেশী,—এ ভারতবর্ষের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই?—মণীশদা আর আমার মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান!

অশ্রুধারা নামে সুজাতার চোখে। তার অশ্রুধারার মধ্যে ফুটে ওঠে—এক ইংরেজ-দম্পতির মূর্তি,—তার বাবা আর মা! সর্বেশ্বরের কোলে সুজাতাকে সঁপে দিচ্ছেন তার মা।

আবেগে, উচ্ছ্বাসে উত্তেজিত হয়ে ওঠে সুজাতা। মনে মনে প্রশ্ন জাগে,—কেন?—কেন এমন হল? কেন সর্বেশ্বরের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন তাঁরা? আর সর্বেশ্বরই বা কেন নিজের মেয়ে বলে এতদিন তার পরিচয় গোপন রেখেছেন?

আবার সর্বেশ্বরের প্রশান্ত মূর্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, অস্ফুট স্বরে সুজাতা ডাকে—বাবা!

মনে পড়ে যায় তার বাঙালী মাকে, আর সুরথকে। সে মা তার পাগল হয়ে গিয়েছিল।—হ্যাঁ, এমন মা আর এমন বাবা—তাঁরাই তো সার্থক করে তুলেছেন সুজাতার জীবন।

মণীশের চিঠির প্রত্যেকটি অক্ষর জ্বল জ্বল করছে; মণীশ চলে গেছে। পিতৃ-ভূমির অদৃশ্য যোগসূত্র টানছে সুজাতাকে। সে যোগসূত্র ছিন্ন করতে পারবে না মণীশ—মণীশদা!

ঘুম ভেঙেছে সর্বেশ্বরের।

দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে রোদ এসে ভরে দিয়েছে ঘরখানা! সামনের টিলায় নাগকেশর আর চাঁপা গাছে অজস্র ফুল। সর্বেশ্বর উঠে বসলেন, এ কয়দিনে তাঁকে কাহিল করে ফেলেছে।

এ সময়ে ঘুমোনোর অভ্যাস তাঁর নেই। কিন্তু রোগকাতর সর্বেশ্বরের জীবনে এসেছে ক্লান্তি। তিনি ভাবেন,—হয়তো এখানেই ছেদ পড়বে।

বালিশে হেলান দিয়ে তিনি মুগ্ধদৃষ্টিতে ফুলের শোভা দেখতে থাকেন। এক ঝাঁক বলাকা উড়ে যাচ্ছে আকাশপথে। ঐ যে দিগন্তের কোলে মিশে গেল!

সর্বেশ্বরের মন উতলা হয়ে ওঠে,—মাটির মায়া ছেড়ে ওরা কোথায় উড়ে যায়? কার মায়া ওদের টানে? শূন্য আকাশে কী মায়া লুকোনো আছে? না, না, কিছুই নেই! তবু ওরা ছুটে যায়, মানুষের মনও এমনি ছোটে অজানা অনন্তের পথে।

উড়ে চলে যায় হংসবলাকা!

সর্বেশ্বর ভাবেন,—তবু ফিরতে হবে। ফিরতে হবে তাদের। নেই, শূন্য আকাশে কোন কিছুই নেই।

সর্বেশ্বরের মনে হয়,—হংসবলাকার মধ্যে সুজাতাকে দেখছেন। ঐ, ঐ উড়ে চলে যাচ্ছে—পশ্চিমের আকাশে মিলিয়ে গেল। ফিরে আসছে মণীশ। মণীশও উড়েছিল; ফিরে এসে কোথায় মিলিয়ে গেল সে?

ঘেমে ওঠেন্ সর্বেশ্বর। এ কি ভাবছেন তিনি? সুজাতা নিশ্চয়ই এতক্ষণে তার পরিচয় পেয়ে গেছে। মণীশের মুখখানা মনে পড়ে সর্বেশ্বরের; সত্যি অতুলনীয় মণীশ। চলে গেল, চলে গেল মণীশ! সুজাতার পথ সহজ ও সরল করে চলে গেল মণীশ!

পাগলের মত বিচলিত হয়ে ওঠেন সর্বেশ্বর। কানে ভেসে আসে গুর গুর আওয়াজ। ওপারে কর্মচঞ্চল তৈলখনির যন্ত্রদানব চীৎকার করছে।

সর্বেশ্বরের মনে হচ্ছে,—শিলাস্তর ভেদ করে যন্ত্রদানবের পৈশাচিক মুষল যেন পৃথিবীকে নাড়া দিচ্ছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে পাহাড়। যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠছে পৃথিবী। তার অন্তরতম প্রদেশে লুক্কায়িত প্রাণশক্তিকে হরণ করছে যন্ত্র-দানব। ধরণীর গর্ভ বিদীর্ণ করে তাকে তিলে তিলে বন্ধ্যা করে দিচ্ছে মানুষের বৈজ্ঞানিক ক্ষুধা।

সর্বেশ্বর আপন মনে বলতে থাকেন,—অফুরন্ত এই ক্ষুধা। এর পরিসমাপ্তি নেই। আদম আর ইভের কাহিনী মনে পড়ে যায়। নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার অপরাধে শাস্তি পেয়েছিল তারা। স্বর্গের উদ্যান থেকে নির্বাসিত হয়েছিল আদম আর ইভ।

নেমে এল তারা এই মাটির পৃথিবীতে। প্রকৃতির লীলানিকেতন এই মর্ত্য-লোক,—এই পৃথিবী। নূতন অতিথিদ্বয়কে পৃথিবী স্বাগত জানাল। রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের ডালি নিয়ে পৃথিবী বরণ করল আদি-পিতা আদম আর আদি-মাতা ইভকে।

ষড় ঋতুর সঙ্গে ষড় রিপু জেগে উঠল। অতনুর অদৃশ্য পুষ্পবাণে বিহ্বল আদম আর ইভের তনুর সংঘর্ষে তনুর পর তনু সৃষ্টি হতে লাগল। জন্ম নিল মানবজাতি।

সে ক্ষুধা এখনও মেটে নি। পৃথিবীকে নিঙড়ে নিচ্ছে আদম আর ইভের বংশধরেরা। তারা অজানাকে জানতে চায়; লুক্কায়িত যা, নিষিদ্ধ যা, তা দেখবার, জানবার, ভোগ করবার দুর্বার আকর্ষণ তাদের রক্তধারায়। আর যে কিছুই থাকবে না। রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের আর যে কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না পৃথিবীতে।

বন্ধ্যা হয়ে যাবে এ সুন্দর পৃথিবী; মরুবালি ধূ ধূ করবে তার বুকে। ধ্বংসই

ডেকে আনছে মানবজাতি। মর্ত্যভূমির আশ্রয়ও বুঝি তাদের যায়।

না, না, এদের বুঝিয়ে দিতে হবে। এর পরিণাম বুঝিয়ে দিতে হবে। ধ্বংস আসছে। ফুল আর ফুটবে না, পাখি আর ডাকবে না। এমন সুন্দর মানবশিশুও এমন সুন্দর থাকবে না।

তপোশান্ত ধ্যানের ভারত তাই নগরীর আশেপাশে গড়ে তুলেছিল তপোবন; ক্ষাত্রশক্তির ক্ষুধাকে বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের ভারত মহীয়ান্ জটামুকুট পরে অঙ্গুলি-হেলনে সংযত করেছিল। সে প্রাণদীপ্ত শক্তি আজ নেই; সেদিন আর ফিরেও আসবে না।

আকাশ-পাতাল চিন্তা করেন সর্বেশ্বর। মনে পড়ে যায়, সুজাতাকে বিদায় দিতে হবে; বিদায় দিতে হবে ইংরেজ-দুহিতা সুজাতাকে। না, না,—ইংরেজ-রক্ত কি এতদিনে এদেশের রসে-জলে ভারতীয়ে রূপান্তরিত হয় নি? ভারতীয় মাতার স্নেহপুষ্টা সুজাতা সত্যই কি ভারতীয় নয়?

সুজাতাকে বিদায় দিতে হবে।—দরদর অশ্রু ঝরে সর্বেশ্বরের চোখে। তিনি ডাকলেন,—সুজাতা! সুজাতা!

সুজাতা সর্বেশ্বরের ঘরে সাড়া দিয়ে প্রবেশ করল; তার হাতে সেই চিঠি, সুজাতার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে; ব্যাকুলকণ্ঠে সে বললে,—বাবা! এই দেখ।

সর্বেশ্বরের হাতে মণীশের চিঠি ছিল সুজাতা। সর্বেশ্বর চিঠিখানি পড়তে লাগলেন। তার পর প্রশান্ত স্বরে ডাকলেন,—সুজাতা!

সুজাতা বললে,—আমার যে সব স্বপ্ন ভেঙে গেল বাবা!

সর্বেশ্বর বললেন,—মণীশ ঠিকই বলেছে, অদৃশ্য যোগসূত্র তোকে টানছে মা! টানছে।

সুজাতা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দেয়,—সত্যি কি এমন করে আমায় বিদায় দেবে বাবা!

সর্বেশ্বর বললেন,—বিদায় নয় মা, বিদায় নয়! এ যে নিজেকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ছড়িয়ে দেওয়া।

সর্বেশ্বরের গলা আবেগে প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। অসুস্থ সর্বেশ্বর চোখের জল মুছতে মুছতে বলতে থাকেন,—আমার মন্ত্রগুরু রবার্টসনের কাছে আমি ঋণমুক্ত হব মা। আমি ঋণমুক্ত হয়ে রেহাই পাব।

সুজাতা বললে,—তুমি ঋণমুক্ত হতে যাচ্ছ, আর আমি যে আজ সব হারাতে বসেছি। যে মাটিতে ভর করে দাঁড়িয়েছি, সে মাটিও আমার পায়ের নীচে থেকে সরে যাচ্ছে বাবা!

সর্বেশ্বর বললেন—না মা! যার হাতে তোকে সঁপে দিচ্ছি সে মহান্। আমি জানি ডেভিড তোর মর্যাদা দিতে পারবে। আর এও জানি তোব মধ্যে দিয়ে ভারতীয় ভাবধারা নূতন প্রাণশক্তি পাবে ডেভিডের মধ্যে। তোমবা দু জনে নূতন ভাবধারার জন্ম দেবে ইউরোপে। এদেশ আর ওদেশের রূপেব মিলনে অপরূপা হয়ে সফল করবে আমাদের ব্রত।

সুজাতা ও সর্বেশ্বরের মধ্যে এই কথাবার্তা চলছে, এমন সময় ডেভিড এসে ঘরে প্রবেশ করল। সর্বেশ্বর ডেভিডকে দেখতে পেয়ে বললেন,—এই যে ডেভিড! আমায় ঋণ মুক্ত কর ডেভিড। এতদিন তোমার সত্যিকাব পবিচয় পাই নি। সুজাতার ভার তোমায় নিতে হবে।

ডেভিড শান্তভাবে উত্তর দেয়,—আমি এই উদ্দেশ্য নিয়েই এদেশে এসেছিলাম মাষ্টার মশাই! কিন্তু এদেশেব রসে জলে পুষ্ট এ বেলফুলকে বোঁটা ছিঁড়ে নেবার মত নিষ্ঠুর আমি হতে পারি নি। তাই এতদিন আমায় পরিচয়ও দিই নি।

সর্বেশ্বর বললেন,—তুমি হৃদয়বান্ ডেভিড! আমি আশীর্বাদ কবছি তোমরা সুখী হবে।

সর্বেশ্বর সুজাতার হাত ডেভিডের হাতে তুলে দিলেন। এমন সময় রহমন দারোগা, কৃষ্ণপ্রসাদ, সুলেমান রাজা ও সন্ধ্যা সেই ঘরে প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণপ্রসাদ এগিয়ে এসে বললেন,—আমিও আশীর্বাদ করছি তোমরা সুখী হবে।

সর্বেশ্বর ঘেমে উঠেছেন; তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগলেন,—আমি আজ মাকে হারালাম ডেভিড। মেয়েকে পরের ঘরে পাঠানোব আনন্দ আছে। পর আপন হবে। দুই দেশের মধ্যে যোগসূত্র রচনা হবে। সেই আনন্দের

মাঝেও বুঝতে পারছি, আমি মা-হারা হলাম।

সন্ধ্যা এগিয়ে এসে বলে,—না মাষ্টার মশাই! আমি থাকব আপনার কাছে।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—মাষ্টার! আমার এ মেয়েটিকে তোমার আশ্রমের কাজে লাগাতে হবে। তোমাকে এর ভার নিতে হবে মাষ্টার।

সর্বেশ্বরের মুখে হাসি ফুটে উঠল; তিনি আস্তে আস্তে বললেন,—হ্যাঁ, এদেশের ছেলে মাকে হারায় না।

ক্লান্ত সর্বেশ্বরের মাথা বালিশের উপর এলিয়ে পড়ল। সুজাতা ও সন্ধ্যা তাঁকে শুশ্রূষা করতে লাগল। ডেভিড সর্বেশ্বরের নাড়ী পরীক্ষা করে বললে—রহমন সাহেব, শীগ্‌গির ডাক্তার ডাকুন।

ত্রিশ বছর পর। কাঞ্চনগড়ের সম্মানিত অতিথি হয়ে ফিরেছে মণীশ। সবই অচেনা মুখ। রূপ পালটেছে কাঞ্চনগড়। কাঞ্চনগড় আর কদমপুরের পাহাড় ছেয়ে গেছে উদ্বাস্তু বস্তিতে। বুড়ো হয়ে গেছে অজয়। অজয় বললে,—ঐ যে রহমন দারোগা। এখনও সর্বেশ্বর মাষ্টারের আশ্রম আগলে রয়েছেন। আর কেউ নেই রে, কেউ নেই। সন্ধ্যাদি সুজাতার অভাব মিটিয়েছিল। সেও বছর তিনেক হল মারা গেছে। দারোগা চোখে দেখতে পান না; তবু তোকে দেখতে আসছেন।

রহমন দারোগাকে সেলাম করে পায়ের ধূলো নিয়ে দাঁড়াল মণীশ,—চাচা-সাহেব! আমি মণীশ।

রহমন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—বেঁচে থাক বাবা। কি দেখতে এসেছ কেউ নেই বাবা, কেউ নেই। তোমরা যারা বড় হয়ে গেলে, তারাই এই দেশের নির্বোধ অসহায় লোকেদের ভুলে গেলে বাবা! আমি তো এদের ছেড়ে যেতে পারি না।

তার পর বললেন,—শুনছি বাবা, স্বদেশীর ইতিহাস লেখা হয়েছে! নিশ্চয়ই তাতে এখানকার কথাও আছে। আমার সুরথ আর নাসিরের কথা নিশ্চয়ই আছে

সে ইতিহাসে ? এক খণ্ড ইতিহাস আমায় পাঠিয়ে দিয়ো বাবা !

মণীশের পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি সরে যায় ; বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের ছবি দেখে মণীশ। রক্তাক্ত সুরথ আর নাসিরের দেহ পড়ে রয়েছে। কানে ভেসে আসছে বন্দে মাতরম্। আর ঐ যে—ঐ যে সুজাতা ছুটে আসছে।

হ্যাঁ, ইতিহাস ! কিন্তু এ ইতিহাস কোথায় পাবে মণীশ ! এ ইতিহাস স্মৃতির পটেই লেখা থাকে। যখন লেখা হয় তখন হয়তো রক্ত দিয়েই লেখে মানুষ—কিন্তু রক্তের দাগও তো একদিন ধূসর বিবর্ণ হয়ে ওঠে। ক্রমশ মুছেও যায়। এ ইতিহাসও একদিন মুছে যাবে তা মণীশ জানে। আজও হয়তো তার মনে জ্বল জ্বল করছে সে লেখাগুলো—হয়তো বা রক্তও ঝরাচ্ছে। তবু বাইরে তার কতটুকুই বা মূল্য !

—সমাপ্ত—

